তিব্বে নববী

বিশ্বনবীর চিকিৎসা বিধান

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

মূল

প্রিন্সিপ্যাল হাফেজ নযর আহমদ
লাহোর

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্ যমান
সাবেক উস্তায, মাদরাসা দারুল উলূম
তালতলা, ঢাকা

সম্পাদনায়

মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ
মুহাদ্দিস, জামেয়া আরাবিয়া, ফরিদাবাদ, ঢাকা।
খতীব, সিদ্দিকবাজার মসজিদ, ঢাকা।

হক লাইব্রেরী
১৮, আদর্শ পুস্তক বিপণী বিতান
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

ইসলামী সাহিত্যের গৌরব, বিশিষ্ট জ্ঞানতাপস, মাসিক মদীনা সম্পাদক

মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের প্রসঙ্গ কথা

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতিটি বাণীই ছিল অসাধারণ প্রজ্ঞায় পূর্ণ।

প্রথমতঃ তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরণাপ্রাপ্ত না হয়ে কথা বলতেন না; দ্বিতীয়তঃ মানব সৃষ্টির প্রথম থেকে শুরু করে একেবারে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত সকল জ্ঞানই তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কিত বাক্য এবং পরামর্শগুলিও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের একটা অতুলনীয় রত্নভাণ্ডার রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে।

তিব্ব বা চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত হাদীসগুলি সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। হিজরীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে মুসলিম জ্ঞান-তাপসগণ পদার্থ বিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা ও গ্রীক বিজ্ঞানের অনুবাদ করার কালেও তিব্ব সম্পর্কিত হাদীসগুলি তুলানামূলকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। স্পেনে মুসলিম বিজ্ঞানচর্চার চরম উন্নতির যুগেও অন্যান্য বিষয়াদির পাশাপাশি তিব্বুন নববী বা চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত হাদীসগুলি ব্যাপকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। অতি আধুনিক কালেও মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা অনুষদের পক্ষ থেকে তিব্ব সম্পর্কিত হাদীসগুলি আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। সেই মূল্যবান অভিসন্ধর্ভটি আরবী ভাষায় দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়ে ইদানিং কালে সারা বিশ্বে বিশেষতঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপক আলোড়না সৃষ্টি করেছে। আমার জানা মতে এদেশের একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক মরহুম ডাক্তার এস, জি, এম চৌধুরী উক্ত আরবী বইটির বাংলা অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

তিব্বে নববী সম্পর্কে প্রাচীন কাল থেকেই আরবী ফার্সী উর্দূ ভাষায় অসংখ্য বই-পুস্তক সংকলিত হয়েছে। এসব প্রামাণ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রখ্যাত হাদীস তত্ত্ববিদ ইবনে কাইয়্যেমের তিব্বুন নববী পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সে গ্রন্থ অবলম্বন করেই করাচীস্থ মদীনাতু-তিব্ব-এ একটি উচ্চতর গবেষণা কর্ম পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমান গ্রন্থটি লাহোরস্থ শিবলী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল জনাব হাফেজ নযর আহমদ কর্তৃক সংকলিত। এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিব্ব বা স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কিত প্রতিটি বর্ণনার মূল উদ্ধৃতি, অনুবাদ, ব্যাখ্যা এবং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে তুলনামূলক আলে-াচনা। এর ফলে বর্ণনাগুলি সাধারণ পাঠকের পক্ষে সহজবোধ্য হয়েছে। তিব্বে নববী সম্পর্কিত বর্ণনাগুলিও পবিত্র হাদীস ও সীরাতের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

বাংলা ভাষায় সীরাত ও সুন্নাহ চর্চার দৈন্য সর্বজনবিদিত। আমার দৃষ্টিতে ইতিপূর্বে তিব্বে নববী সম্পর্কিত কোন পুস্তক পুস্তিকা সংকলন বা তরজমার উদ্যোগ ধরা পড়েনি।

বর্তমান বইটি এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমি প্রয়াস। দোয়া করি আল্লাহ পাক বিজ্ঞ অনুবাদক এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রম কবূল করুন।

বিনীত

মোহররম ২৬-১৪১৮ হিঃ

মুহিউদ্দীন

আরজ

আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্ব মানবতার সার্বিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। রূহানী চিকিৎসার পাশাপাশি রাহমাতুল্লিল আলামীন হিসাবে তিনি উম্মতের দৈহিক চিকিৎসার ক্ষেত্রেও যেসব তথ্য দিয়ে গেছেন, আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতির অধুনা এ যুগেও তাঁর পরিবেশিত অন্যান্য সকল তথ্যের ন্যায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্যাবলীও এমন এক চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত যে, সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ আজও তা থেকে কেবল উপকৃতই হচ্ছেন না; বরং এসব তথ্যাবলীকে তারা চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাপকাঠি রূপে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। সময় যতই অতিবাহিত হচ্ছে, এর বাস্তবতা ততই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

প্রিন্সিপ্যাল জনাব হাফেজ নযর আহমদ কর্তৃক উর্দূ ভাষায় সংকলিত তিব্বে নববী (সঃ) গ্রন্থটিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কিছুটা সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হয়েছে।

বাংলা অনুবাদক মূলানুগ অনুবাদের জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই। এ জন্য তিব্ব শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞগণের সাথে যোগাযোগ করে তাদের নির্দেশনাও গ্রহণ করা হয়েছে।

তারপরও বাংলা ভাষায় যেহেতু এটি প্রথম প্রয়াস, তাই অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠকের খেদমতে এ সম্পর্কিত সুপরামর্শ প্রদানের আশা রইল। যাতে সামনে বইটি সর্বাঙ্গ সুন্দর করা যায়।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে তাঁর মর্জি মোতাবেক চলার এবং তাঁর হাবীবের (সঃ) আদর্শ অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

বিনীত

মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

জামেয়া আরাবিয়া

ফরিদাবাদ, ঢাকা

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ ১

অধ্যায় ঃ ২

অধ্যায় ঃ ৩

অধ্যায় ঃ ৪

অধ্যায় ঃ ৫

অধ্যায়ঃ ৬

অধ্যায় ঃ ৭

অধ্যায় ঃ ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

ভূমিকা

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল ও নবী ছিলেন। তিনি আল্লাহর বান্দাগণকে আল্লাহর আখেরী পয়গাম পৌঁছিয়েছেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যেই মানুষের হেদায়াত, কল্যাণ ও সফলতার একমাত্র মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলার এই পয়গাম ও কালাম দুনিয়াবাসীর নিকট 'কুরআন মজীদ' ও 'ফুরকানে হামীদ' নামে পরিচিত।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজ সমগ্র মানবজাতির জন্য একমাত্র অনুসরণীয় জীবনাদর্শ। আল্লাহর কিতাবের পরই আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতেঃ মর্যাদা। হাদীস গ্রন্থ সমূহে হযরত রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ, পছন্দ-অপছন্দ সব কিছুর বর্ণনা সংরক্ষিত রয়েছে। ইসলামী তালীম ও শিক্ষার এই দ্বিতীয় উৎসধারাই 'তিব্বে নববী'র মূলভিত্তি।

আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'মানসাব' তথা তাঁর প্রতি অর্পিত আসল দায়িত্ব ছিল নবুওয়াত ও রেসালাত। তিনি সমগ্র বিশ্বমানবতার হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি পথহারা মানুষের মনে, চোখে আলো দিতে, তাদের চারিত্রিক ও আত্মিক উন্নতি বিধানে, তাদের ব্যক্তি ও পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক, ইহলোকিক ও পারলৌকিক মোটকথা সামগ্রিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে সার্বিক দিক-নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তিনি দৈহিক রোগ-ব্যাধির চিকিৎসক ছিলেন না। যাকে আমরা সাধারণ প্রচলিত ভাষায় পেশাদার চিকিৎসক বলে থাকি।

উম্মী ও নিরক্ষর নবী (সাঃ)-এর পদতলে পৃথিবীর সকল হিকমত ও প্রজ্ঞা উৎসর্গিত হোক। তিনি সকল রোগের চিকিৎসক এবং সকল দুঃখ দরদের দরদী ও সহানুভূতিশীল হয়ে এসেছিলেন। তাঁর কোন কথাই হিকমত থেকে খালি ছিল

না। অথচ চিকিৎসা তাঁর মানসাব ছিল না। রুগ্নদের চিকিৎসা করা তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যও ছিল না। তবে বিশ্ব মানবতার প্রতি তাঁর অসংখ্য অনুগ্রহরাশির মধ্যে এ ক্ষেত্রেও তাঁর অনুগ্রহ অবশ্যই ছিল।

'তিব্বে নববী'র সংকলন ও বিন্যাস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রিয় নবী (আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য উৎসর্গ হোক) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণী এবং ওসওয়ায়ে হাসানার অলোকেই করা হয়েছে। গ্রন্থের অধ্যায় ও ক্রমবিন্যাস নিম্নরূপঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষা
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ রোগ ও রোগের দর্শন
তৃতীয় অধ্যায় ঃ চিকিৎসা ও সংযম
চতুর্থ অধ্যায় ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর চিকিৎসা
পঞ্চম অধ্যায় ঃ রোগ-ব্যাধি ও রূহানী চিকিৎসা
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ খানা ও খানার আদব
সপ্তম অধ্যায় ঃ পানি পান করার আদব
অষ্টম অধ্যায় ঃ উঠা বসার নিয়ম নীতি
নবম অধ্যায় ঃ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর খাদ্য
দশম অধ্যায় ঃ ইয়াদত বা রোগী দেখা ও খোঁজ -খবর নেওয়া

সম্মানিত পাঠকদের নিকট এই গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায় ও এগুলির অন্তর্ভুক্ত শিরোনামসমূহ প্রথম দৃষ্টিতে তিব্বে নববীর সাথে সম্পর্কহীন মনে হতে পারে। কিন্তু আপনি যদি গভীর দৃষ্টিতে দেখেন এবং চিন্তা করেন তাহলে আপনি এগুলিকে তিব্বে নববীর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গভীর সম্পর্কযুক্ত দেখতে পাবেন।

হযরত খাতামুন নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন অতি নগন্য উম্মত হিসাবে স্বীয় সাধ্যমত স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য রক্ষা, চিকিৎসা এবং এগুলির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলীর ব্যাপারে আমার প্রিয় নবীর প্রতিটি বাণী এবং তাঁর পবিত্র সীরতের প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনাও তিব্বে নববীতে সন্নিবেশিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। যাতে এই বিষয়বস্তুর উপর গ্রন্থটি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের রূপলাভ করতে পারে এবং এ বিষয়ে পাঠকদের অন্য কোন গ্রন্থের প্রয়োজন না থাকে।

তিব্বে নববীর বিষয়বস্তুর উপর এটা কোন নুতন গ্রন্থ নয়। পূর্বেও এ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পুস্তিকা লেখা হয়েছে। আর কোন না কোন দিক থেকে প্রত্যেকটি

গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা যথার্থ ও স্বীকৃত। এতদসত্ত্বেও আমাদের এই গ্রন্থের আপনি কিছু বৈশিষ্ট্য অবশ্যই পাবেন। যেমন, এই গ্রন্থের উল্লেখিত প্রতিটি হাদীসের হাওয়ালা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উদ্ধৃত করা হয়েছে। উৎসের উদ্ধৃতি ছাড়া কোন কথাই লেখা হয় নাই। বিশেষতঃ 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা' অধ্যায়ে প্রতিটি ঔষধের বৈশিষ্ট্য এবং এ বিষয়ে আধুনিক গবেষণার ফলাফল একত্রিত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। এমনিভাবে স্বাস্থ্য ও রোগ-ব্যাধির সাথে সম্পর্কিত হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবগুলি বাণীও এক সাথে জমা করে দেওয়া হয়েছে।

অধম প্রাণান্তকর নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচেষ্টার পরও কখনো এই দাবী করে না যে, এ বিষয়ের সবগুলি হাদীসই জমা করে দেওয়ার যোগ্যতা আমার মধ্যে রয়েছে।

আলোচ্য বিষয়ের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সামান্য সম্পর্কযুক্ত প্রতিটি হাদীসও এই লোভে উল্লেখ করে দিয়েছি যে, জানাতো নাই যে, কার অন্তরে কোন কথাটি বসে যাবে এবং এটিই তার হেদায়াতের সামান হবে! আর এ বিষয়টিই আমার নাজাত ও মুক্তির উসিলা হিসাবে গন্য হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।"
—সূরা আহযাব ঃ আয়াত ঃ ৩৩

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

"যে রাসূল আকরাম (সাঃ)-এর অনুসরণ করল, নিঃসন্দেহে সে আল্লাহর অনুসরন করল।" —সূরা নিসা ঃ আয়াত ঃ

এমনিভাবে আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

"আল্লাহর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যে বিষয়ে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" —সূরা হাশরঃ আয়াতঃ ৫৭

স্বয়ং খাতামুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণের মধ্যেই উম্মতের কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত রয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর এক জাঁ নেসার সাহাবী হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ)-এর পবিত্র মুখে প্রিয় নবীর বাণী শুনুন ঃ

كُلُّ اُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ اَبىٰ - قِيْلَ وَمَنْ اَبىٰ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبىٰ -

"আমার সকল উম্মত জান্নাতে যাবে, তবে তারা ব্যতীত যারা অস্বীকার করেছে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অস্বীকারকারী কারা? ইরশাদ করলেন, যে আমার আনুগত্য ও অনুসরণ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার নাফরমানী ও অবাধ্যতা করল, নিঃসন্দেহে সেই হল অস্বীকারকারী।"
–বুখারী শরীফ

এর চেয়েও মিষ্ট ভাষায় হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ)-এর মুখেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকখানি ইরশাদ প্রত্যক্ষ করুন।

তিনি ইরশাদ করেছেনঃ

فَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ فَاْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"আমি যখন তোমাদেরকে কোন কাজে নিষেধ করি তখন তা থেকে তোমরা নিবৃত্ত থাক। আর যখন তোমাদেরকে কোন কাজের হুকুম করি তখন তোমাদের সাধ্যানুযায়ী এর উপর আমল কর।" –বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

অধ্যায় ঃ ১

স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষা

স্বাস্থ্য দয়াময় আল্লাহ তা'আলার দেওয়া একটি বিশেষ ও অনেক বড় নিয়ামত। আল্লাহর দেওয়া এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রতিটি মানুষের জন্য অপরিহার্য্য কর্তব্য। কুদরতের বিধান হল এই যে, কোন নিয়ামতের প্রতি অমর্যাদা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন শুধু এই নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়ারই কারণ হয় না; বরং নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা ও অস্বীকার আল্লাহর গজব ডেকে আনারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং স্বীয় স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার মৌলিক নীতিমালাসমূহ মেনে চলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বিশেষ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

একদা আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুইজন সাহাবী পরস্পরে বাক বিতন্ডায় লিপ্ত ছিলেন। তাদের একজন বলছিলেন যে, তিনি ঘর-বাড়ী ছেড়ে দিয়ে এসে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগী ও তাঁর স্মরণে সর্বদা মসজিদে অবস্থান করবেন। অপরজন জোর দিয়ে বলছিলেন যে, তিনি ঘর-বাড়ীতে থাকবেন বটে কিন্তু ক্রমাগত রোযা রাখবেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথা-বার্তা শ্রবণ করার পর তাদের কারও কথার সাথে ঐক্যমত পোষণ না করে বললেন, "দেখ! তোমাদের উপর তোমাদের দেহেরও হক রয়েছে।"

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাস্থ্য, সুস্থতা এবং স্বাস্থ্যের হিফাযত ও সুরক্ষার মৌল বিধি-বিধান সম্পর্কেও অত্যন্ত সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি স্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক ও উপকারী বস্তুনিচয় এবং সে সকল বিষয়াবলীও চিহ্নিত করে দিয়েছেন যা স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরী।

স্বাস্থ্য আল্লাহর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত

হাদীসের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّ النَّاسَ لَمْ يُعْطُوا شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ

"নিশ্চয় মানুষকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন নিয়ামত দান করা হয় নাই।"

মহান আল্লাহ তা'আলার এই সুমহান অনুগ্রহের কিছুটা অনুমান হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর এক সাহাবীর মধ্যে অনুষ্ঠিত নিম্নোক্ত কথোপকথনের দ্বারা করা যেতে পারে।

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি আরয করলাম "ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমার স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং আমি সুস্থ থাকি তবে আমি শোকর আদায় করি। এই অবস্থাটি আমার নিকট সেই অবস্থার চেয়ে অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় যে আমি অসুস্থতার দ্বারা পরীক্ষায় পতিত হই এবং ধৈর্য ধারণ করি।" (আমার এই কথা শ্রবণ করে) রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেনঃ

وَرَسُوْلُ اللهِ يُحِبُّ مَعَكَ الْعَافِيَةَ

"আল্লাহর রাসূলও তোমার সাথে স্বাস্থ্য ও সুস্থতাকে পছন্দ করেন।"

–তিববুন নববী ঃ আলাউদ্দীন আল কাহ্হাল

চিন্তা করে দেখুন! স্বাস্থ্য আল্লাহর তাআলার কত বড় নিয়ামত যে, দয়াময় আল্লাহর প্রিয় হাবীব স্বয়ং এটাকে পছন্দ করেন ও ভালবাসেন। এজন্যেই আল্লাহর সেই সকল প্রিয়বান্দা যারা সর্বাবস্থাতেই সবর, ধৈর্য ও শোকর আদায় করাকে নিজেদের জন্য পরম সৌভাগ্যের ধন মনে করেন এবং অসুখ বিসুখকে দর্জা বুলন্দী ও উন্নতির মাধ্যম গণ্য করেন। তাদেরকেও অসুস্থতা থেকে সুস্থতার জন্য সাধারণত এরূপ বিনীত ভাষায় দুআ করতে দেখা যায় যে, " হে করুণাময় প্রভু! আপনি অসুস্থতার নিয়ামতকে সুস্থতার সুমহান নিয়ামত দ্বারা বদল করে দিন।" এরূপ দুআ তারা এ জন্যেই করে থাকেন যে, অসুখ-বিসুখে পতিত হয়ে সবর ও ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব। আর সুস্থতার সময় শোকর করা ওয়াজিব। বস্তুতঃ শোকর আদায় করা সর্বাবস্থাতেই আফযল ও শ্রেষ্ঠ।

স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ نِعْمَتَانِ مِنْ نِعَمِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ

"হযরত রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য মহান রাব্বুল আলামীনের নিয়ামত সমূহের মধ্যে দুটি (বিশেষ) নিয়ামত। অধিকাংশ লোক এই দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে ক্ষতি ও ধোঁকায় পতিত রয়েছে।"–যাদুল মাআদ

বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে কিছু শব্দ অগ্রপশ্চাত হয়ে হাদীসটি বুখারী শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

"সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুটি নিয়ামত রয়েছে যেগুলি সম্পর্কে অধিকাংশ লোক ধোকাগ্রস্ত হয়ে আছে। একটি স্বাস্থ্য এবং অপরটি স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতা।"–সহীহ্ বুখারী শরীফ

এ ব্যাপারে সামান্যতম শোবা-সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নাই যে, পার্থিব ভোগ-বিলাসের লালসার কারণে অধিকাংশ লোক এই দুইটি নিয়ামতের ব্যাপারে চরম গাফলত ও উদাসিনতার শিকার হয়ে যায় এবং এই ধোঁকায় পতিত হয়ে যায় যে, স্বাস্থ্য সর্বদাই অটুট থাকবে এবং স্বাচ্ছন্দ ও স্বচ্ছলতা কখনও নিঃশেষ হবে না। অথচ এগুলি তো হল নিতান্তই সাময়িক জিনিস। যা আজ আছে তো কাল থাকবে না। বরং পরম সত্য তো হল এই যে, এক মুহূর্তেরও ভরসা-বিশ্বাস নাই।

সুতরাং মানুষের উপর একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য হল এই যে, যদি স্বাস্থ্যের ন্যায় মহান নিয়ামত অর্জিত হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করবে এবং এর যথাযথ যত্ন নিবে, মর্যাদা দিবে ও কদর করবে। যদি স্বচ্ছলতার দৌলত নসীব হয় তাহলে অস্বচ্ছলতার ও দারিদ্রাবস্থার চিন্তা করবে এবং এই স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যকে আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ নিয়ামত মনে করবে। কোনভাবেই গর্ব ও অহংকারের শিকার হবে না।

স্বাস্থ্যের জন্য দু'আ

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, এক বদরী সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাযের পর কিসের দুআ করব? রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

سَلِ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ

"আল্লাহ্ তা'আলার নিকট স্বাস্থ্য ও সুস্থতার দুআ করবে।" অতঃপর সাহাবী আবারও এই একই প্রশ্ন করলে হুযূর (সাঃ) পুনরায় তাকে বললেনঃ

سَلِ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

"তুমি আল্লাহ তা'আলার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য দুআ করবে।"–তিরমিযী শরীফ

এটা তো হলে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী একজন সাহাবীকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশ ও শিক্ষা। এবার হযরত আব্বাস (রাযিঃ)-এর প্রতি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশবাণী লক্ষ্য করুন, তিনি ইরশাদ করেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ سَلِ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

"হে আব্বাস! হে আল্লাহর রাসূলের চাচা! আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা প্রার্থনা করুন।"

আল্লাহ! আল্লাহ! স্বাস্থ্য কত বড় নিয়ামত যে, আখিরী নবীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার এই স্বাস্থের জন্য দুআ করার উপদেশ ও তালীম দিয়েছেন। যদি সাহাবী অন্য দুআর কথাও জিজ্ঞাসা করেছেন, তবুও তিনি সেই স্বাস্থের জন্য দুআ করার বিষয়টিই পুনরুল্লেখ করেছেন। এতদসত্ত্বেও যদি আমরা স্বাস্থের কদর ও মর্যাদা না বুঝি এবং নিজের ও অন্যান্যদের স্বাস্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখি, স্বাস্থের জন্য আল্লাহর শোকর আদায় না করি তাহলে এটা নিয়ামত অস্বীকার করার চেয়ে কোন অংশেই কম হবে না। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত অস্বীকার করার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে। নিয়ামতের অমর্যাদাকারী ও অকৃতজ্ঞদের প্রতি কখনও সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয় না।

হুযূর সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত সমূহের মধ্যে কিয়ামতের দিন বান্দাকে সর্বপ্রথম যে নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে তা হল–

اَلَمْ نُصَحِّحْ لَكَ جِسْمَكَ

"আমি কি তোমাকে দৈহিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দান করেছিলাম না?"

–তিরযিমী শরীফ

স্বাস্থ্যের জন্য হুযূর (সাঃ)-এর দুআ

সরওয়ারে কায়েনাত হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মাওলা পাকের দরবারে স্বাস্থ্য, সুস্থ্যতা, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য যে সকল দুআ করেছেন সেগুলির মধ্যে চিন্তা করে দেখুন। আমরা এখানে তাঁর বহু দু'আর মধ্যে কেবল দুইটি দুআ অর্থসহ উপস্থাপন করছি।

নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

"ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের সুস্থতা ও কল্যাণ প্রার্থনা করি।"

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবানে প্রায় সর্বদাই এই দুআ উচ্চারিত হত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ صِحَّةً فِىْ اِيْمَانٍ وَاِيْمَانًا فِىْ حُسْنِ خُلُقٍ وَنَجَاحًا يَّتْبَعُهٗ فَلَاحًا وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً وَّمَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا -

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ঈমানের সাথে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা প্রার্থনা করি এবং উত্তম চরিত্রের সাথে ঈমান প্রার্থনা করি। এবং মুক্তি প্রার্থনা করি যারপর কামিয়াবী ও সফলতা নসীব হবে। আপনার রহমত প্রার্থনা করি এবং আপনার নিকট স্বাস্থ্য, সুস্থতা, শান্তি, নিরাপত্তা, ক্ষমা ও সন্তুষ্টি প্রার্থনা করি।"

উপরোক্ত দুআ সমূহের দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট রূপে অনুমিত হয় যে, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা আল্লাহ তা'আলার একটি মহান নিয়ামত। এটা এমন এক নিয়ামত যা আখিরী নবী (সাঃ) ও আল্লাহর নিকট বেশী বেশী চাইতেন। তাঁর বিশেষ দুআ সমূহের মধ্যে সর্বদাই তিনি এই দুআগুলিকেও শামিল রাখতেন। অতএব কতইনা উত্তম হয় যদি আপনিও এই দুআগুলি মুখস্থ করে নেন এবং নিজের দুআগুলির মধ্যে এগুলিকেও শামিল করে নেন! কেননা, দুআর দ্বারা একদিকে যেমন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা হয় অপরদিকে এতে বান্দার নিজের ইচ্ছা ও দৃঢ়তারও প্রকাশ ঘটে।

স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পাঁচটি মৌল বিধান

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত ঃ

قَالَ اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَوْ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ اَلْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْاِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ

"রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, স্বভাবজাত বিষয় পাঁচটি অথবা বলেছেন পাঁচটি বিষয় স্বভাবের অন্তর্গত –

১. খাতনা করা, ২. নাভীর নীচের পশম পরিষ্কার করা, ৩. নখ কাটা, ৪. বগলের পশম উপড়ে ফেলা এবং ৫. গোঁফ ছাঁটা।"

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত বাণীতে পাঁচটি বিষয়কে মানব স্বভাবের সার বলা হয়েছে। এই বিষয় গুলি সুন্নাতে নববীর অন্তর্ভুক্ত। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলির উপর আমল করার জন্য কঠোর ভাবে তাকীদ করেছেন। এগুলির উপর আমল না করাকে মাকরূহ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। সর্বোপরি তাঁর অপছন্দের কারণ বলেছেন।

চিন্তা করুন! এ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিচ্ছন্নতা ও পাক-পবিত্রতার কত উপকারিতা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর থাকবেই না বা কেন? বস্তুতঃ ইসলাম তো হল স্বভাবগতধর্ম। ইসলামের প্রতি আহবানকারী ও এর প্রবর্তক হলেন স্বভাবের সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান ও সুবিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁর প্রতিটি কথা স্বভাবেরই প্রতিধ্বনি। তাঁর প্রতিটি কথা ও দিক নির্দেশনাই মানবীয় কল্যাণে ভরপুর।

এক. খাতনা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সুন্নত। চিকিৎসকগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, খাতনা করার দ্বারা মানুষ প্রস্রাব ও হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন রোগ থেকে আপনা থেকেই নিরাপদ হয়ে যায়।

দুই. নাভীর নিম্নাংশের লোম যদিও বাহ্যত দৃষ্টিগোচর হয় না কিন্তু এগুলি পরিষ্কার না করার কারণে শুধু যে স্বভাবের মধ্যে বিষণ্নতা পয়দা হয় তাই নয় বরং এর দ্বারা মনের মধ্যে মালিন্য ও অপবিত্রতা বৃদ্ধি পায়।

তিন. নখ কাটা শুধু হাতের পরিচ্ছন্নতা এবং বাহ্যিক সৌন্দর্যের জন্যই জরুরী নয়; বরং স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও তা অতিশয় জরুরী। যদি নখ কাটা না হয় তাহলে তা ময়লা ও আবর্জনার ভান্ডার হয়ে যায়।

চার. বগলের লোমগুলি যদি নিয়মিত ভাবে পরিষ্কার করা না হয় তাহলে এতে চরম দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। যা পাশে বসা লোকেরাও অনুভব করে।

পাঁচ. হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোঁফ ছেটে ফেলার জন্যও খুবই তাকীদ করেছেন। কেননা যদি গোঁফ ছেটে রাখা না হয় তাহলে যে কোন পানীয় বস্তু নাপাক হয়েই কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে।

স্বাস্থ্য রক্ষার চার নীতি

হযরত জাবের (রাযিঃ) হতে বর্ণিত ঃ

غَطُّوا الْإِنَاءَ وَ اَوكُوْا السِّقَاءَ وَاَغْلِقُوا الْاَبْوَابَ وَ اَطْفِئُوْا السِّرَاجَ

"হযরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা বরতন ঢেকে রাখবে, পানির কলসের মুখ বন্ধ করে রাখবে, দরজার অর্গল বন্ধ করে রাখবে এবং (ঘুমানোর পূর্বে) চেরাগ নিভিয়ে দেবে।" – মুসলিম শরীফ

এটা একটা সুদীর্ঘ হাদীস। আমরা এখানে কেবল হাদীসের প্রথম কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম। এতে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক চারটি নীতি বর্ণনা করেছেন। হাদীসের পরবর্তী অংশে তিনি এ চারটি নীতির বিভিন্ন কারণ ও দর্শন বর্ণনা করেছেন। যেমনঃ

প্রথম নীতিঃ غَطُّوا الْإِنَاءَ বাসন-পত্র ঢেকে রাখা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যদি বাসনপত্র ঢেকে রাখ তাহলে শয়তানের পক্ষে সেগুলি খোলার সুযোগ হবে না। তিনি বলেছেন, যদি বাসন পত্র ঢেকে রাখার জন্য আর কিছু না পাও তাহলে বাসনপত্রের মুখে অন্তত কোন লাকড়ি বা খড়ির টুকরাই রেখে দিও। কেননা খোলা পাত্রে যে কোন পোকামাকড় ইত্যাদি ক্ষতিকর জিনিস পতিত হওয়ার আশংকা থাকে।

দ্বিতীয় নীতিঃ اَوكُوْا السِّقَاءَ কলস বা পানীয় পাত্রের মুখ বন্ধ রাখা। হুযুর (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, তোমার যদি কলসের মুখ বন্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর তাহলে শয়তান কলসের মুখ খোলার (এবং পানি নষ্ট করার) সুযোগ পাবে না।

তৃতীয় নীতি ঃ اَغْلِقُوا الْاَبْوَابَ ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখা। এভাবে তোমরা শয়তানের ঘরের ভেতর প্রবেশ করার সুযোগ নষ্ট করতে পারবে। নতুবা শয়তান তোমাদের গাফলতির সুযোগে ঘরে প্রবেশ করে তোমাদের অনেক অনিষ্ট করে ফেলতে পারে।

চতুর্থ নীতিঃ وَاَطْفِئُوْا السِّرَاجَ এবং বাতি নিভিয়ে দেওয়া। এ ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, তোমরা যদি বাতি জ্বালিয়ে রেখেই ঘুমিয়ে পড়, তাহলে তোমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় ইঁদুর বাতির আগুন থেকে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে। চিন্তা করে দেখুন, এই চারটি নীতি মানব জীবনের জন্য কত জরুরী!

সুস্থতা ও পবিত্রতার দশ নীতি

হযরত রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশটি বিষয়কে স্বভাব অর্থাৎ দ্বীনে হানিফের অংশ বলেছেন। এই দশটি নীতির মধ্যে একটি নীতি হাদীসের বর্ণনাকারীর মনে ছিল না। অন্যান্য নয়টি নীতি তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন (১) গোঁফ ছাটা (২) দাঁড়ি লম্বা করা। (৩) মেসওয়াক করা (৪) নাকে পানি দেওয়া (৫) নখ কাটা (৬) আঙ্গুলের জোড়াগুলি ধৌত করা। (৭) বগলের পশম উঠিয়ে ফেলা (৮) নাভীর নীচের পশম পরিষ্কার করা (৯) এস্তেনজা করা। –মুসলিম শরীফ

উপরোক্ত নীতিগুলি আরও একবার পড়ুন এবং এগুলির গুরুত্ব ও উপকারিতার বিষয়ে চিন্তা করুন।

গোঁফ লম্বা হয়ে গেলে পানাহার মাকরূহ হয়ে যায়। যে সকল খাদ্য-বস্তু মোঁচ ছুঁয়ে মুখের ভেতর প্রবেশ করবে সেগুলির পবিত্রতা সংশয় যুক্ত হয়ে পড়বে।

দাঁড়ি পুরুষের জন্য সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারক। ইসলামের প্রতীক-চিহ্ন ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত।

মেসওয়াকের উপকারিতা কে অস্বীকার করতে পারে? মেসওয়াক সম্পর্কে উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নের হাদীসখানি লক্ষ্য করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلسِّوَاكُ مِطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

"মেসওয়াক মুখের পবিত্রতা এবং মহান রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির মাধ্যম।"– নাসায়ী শরীফ

নাকে পানি দেওয়া এবং তা পরিষ্কার রাখা স্বাস্থ্য ও পবিত্রতা উভয় দিক থেকেই অতিশয় জরুরী। নখ কাটা, আঙ্গুলের জোড়া ইত্যাদি ধৌত করা এবং এগুলির খেলাল করা পাক পবিত্রতার জন্য কোন অংশেই কম জরুরী নয়।

বগলের লোম এবং নাভীর নিম্নাংশের লোম পরিষ্কার করা এতো জরুরী যে, যে ব্যক্তি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এগুলি পরিষ্কার না করবে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে পানাহার করাকে মকরূহ বলেছেন।

এস্তেঞ্জা অর্থাৎ উত্তমরূপে শৌচকার্য করা পবিত্রতা লাভের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এতদ্ব্যতীত না শরীর পবিত্র থাকে, না পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র থাকে।

পবিত্রতা অর্জন বা উত্তমরূপে শৌচকার্য করা

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَهْلِ قُبَاءَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْكُمْ فِى الطُّهُوْرِ فَمَا ذٰلِكَ؟ قَالُوْا نَجْمَعُ بَيْنَ الْاَحْجَارِ وَالْمَاءِ-

"হযরত আনাস (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবার লোকদেরকে বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের পবিত্রতার খুবই প্রসংশা করেছেন; এর রহস্য কি? তারা আরয করলেন, আমরা ঢিলা এবং পানি উভয়টির দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করি। –রাযীন

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতও এটাই যে, প্রস্রাব ও পায়খানার পর প্রথমে ঢিলা ব্যবহার করবে অতঃপর পানির দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। এ ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর দিক-নির্দেশনার সার কথাগুলি আপনিও নোট করে নিন।

(১) এস্তেনজা করার সময় ডান হাত ব্যবহার করবে না এবং কোন বরতন বা পাত্রেও এস্তেনজা করবে না। –আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও তিরমিযী

(২) এস্তেনজার পর পবিত্রতা লাভের জন্য বাম হাত ব্যবহার করবে। –আবূ দাঊদ শরীফ

(৩) পানির দ্বারা পবিত্রতা হাসিলের আগে ঢিলা ব্যবহার করবে। –আবূ দাঊদ ও নাসায়ী শরীফ

(৪) হাড্ডি ও গোবর দ্বারা ঢিলা ব্যবহার করবে না। –তিরমিযী শরীফ ও নাসায়ী শরীফ

এ সম্পর্কিত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণী প্রত্যেক হাদীস গ্রন্থের কিতাবুত তাহারাত অধ্যায়ের এস্তেনজা পরিচ্ছেদে বিশদভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

যে সকল লোক মলত্যাগের পর পানির দ্বারা শৌচকার্য করেনা বা এ জন্য কাগজ ব্যবহার করে তারা প্রায়শঃ দুইটি রোগের শিকার হয়ে থাকে। (১) একটি বিশেষ ধরনের লোমলুক্ত ফোঁড়া যা মলদ্বারের আশেপাশে হয়ে থাকে। একমাত্র অপারেশন করা ব্যতীত এই রোগ থেকে নিষ্কৃতি লাভের আর কোন উপায় ও চিকিৎসা থাকে না। (২) গোর্দার মধ্যে পুঁজ জমা হয় যা প্রস্রাবের পথে বের হয়ে

আসে। বিশেষতঃ মহিলাদের পায়খানার জীবাণু প্রসাবের রাস্তা দিয়ে অতি সহজেই প্রবেশ করে মারাত্মক ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

–ইসলাম আওর তিব্বে নববী

নখ ও চুল

আপনারা নখ ও চুল কাটার হুকুম পড়েছেন। এবার স্বয়ং রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলের বাস্তব নমুনা লক্ষ্য করুন ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُ بِتَغْيِيْرِ الشَّعْرِ مُخَالَفَةً لِّا عَاجِمَ وَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَوَّرُ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَقْلِمُ اَظْفَارَهُ فِىْ كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ـ

"হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুল আঁছড়িয়ে পরিপাটি করে রাখার হুকুম দিতেন। যাতে আজমী লোকদের মুখালিফাত করা হয়। তিনি মাসে একবার বগলের এবং নাভীর নিম্নাংশের চুল পরিষ্কার করতেন এবং প্রত্যেক পনের দিন পর পর নখ কাটতেন।"

অপর এক বর্ণনাকারী বলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণতঃ শুক্রবার জুমুআর নামাযে যাওয়ার পূর্বে মোঁছ এবং নখ কাটতেন। তিনি কর্তিত নখ এবং চুল মাটিতে দাফন করে রাখার হুকুম দিতেন।

হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কিরামগণের কি পরিমাণ মহব্বত ও ভালবাসা ছিল এর কিছুটা অনুমান হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর বর্ণনা থেকে করতে পারেন। হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি দেখেছি ঃ

اَلْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ وَاَطَافَ بِهِ اَصْحَابُهُ يُرِيْدُوْنَ اَنْ لَّا تَقَعَ شَعْرَةٌ اِلَّا فِىْ يَدِ رَجُلٍ

"একজন লোক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা মুবারকের চুল মুণ্ডাচ্ছিল আর সাহাবাগণ তাঁর চতুর্দিকে বসা ছিলেন। তাদের প্রত্যেকেই চাইতেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি চুলও যেন মাটিতে পড়তে না পারে। তাই চুলগুলি মাটিতে পড়ার আগেই তাঁরা নিজেদের হাতে নিয়ে নিতেন। কারণ তাদের নিকট সত্যের পথ প্রদর্শক প্রিয় হাবীবের একেকটি চুল জীবনের সর্বস্বের চেয়েও অধিক প্রিয় ছিল।

ঘুমানোর আগে আগুন নিভিয়ে দাও

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ ـ

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখে ঘুমিও না। –বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুস সালেহীন

ভেবে দেখুন, রাসূলে উম্মী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীটি কত হিকমত ও প্রজ্ঞাপুর্ণ যে, ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখে তোমরা ঘুমিও না। কেননা এই আগুন চুলার মধ্যে না থেকে হয়তো বাইরে ছড়িয়ে যেতে পারে। অথবা তুমি হয়তো আগুন ধীমা করে রেখেছো, কিন্তু তা ধীমা অবস্থায় না থেকে বড় হয়ে জ্বলে উঠতে পারে। অথবা নিভু নিভু আগুনের চুলার উপর তুমি কোন পাতিল বা অন্য কোন পাত্র দিয়ে রাখলে আর চুলার আগুন ক্রমে ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে তা জ্বালিয়ে দিল। তোমার কি জানা আছে যে, ক্ষতিকর হবে না মনে করে যে আগুন তুমি ঘুমানোর পূর্বে না নিভিয়ে এমনিতেই রেখে দিয়েছিলে তুমি ঘুমানোর পর প্রচন্ড বাতাসের ছোঁয়া লেগে তা তীব্র হয়ে উঠবে না এবং তোমার বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে না? হয়তো এই তুচ্ছ আগুনই তোমার সহায় সম্পদ সব পুড়ে ভষ্ম করে দেবে এবং জীবন সংহারক হয়ে যাবে।

এ সম্পর্কিত অপর একটি হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন। এই হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ)। তিনি বলেন, এক রাতে মদীনা শরীফের কোন এক ব্যক্তির বাড়ীতে আগুন লেগে যায়। ঘটনাটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি ইরশাদ করলেনঃ

إِنَّ هٰذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَّكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَاطْفِئُوْهَا

"নিশ্চয় এই আগুন তোমাদের দুশমন। সুতরাং তোমারা ঘুমানোর পূর্বে আগুন নিভিয়ে দিও।"–বুখারী, মুসলিম শরীফ

এই আগুন চুলার অঙ্গার, কেরোসিন তৈল, যে কোন প্রকার গ্যাস, বৈদ্যুতিক হিটার বা অন্য যে কোন ধরনেরই হোক না কেন সর্বাবস্থাতেই একই কথা প্রযোজ্য হবে। বড় ধরনের আগুন তো দূরের কথা বরং অনেক ক্ষেত্রে সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোও জীবন ও সম্পদ ধ্বংস হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

চোখ ও দাঁতের হিফাযত

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ

"হযরত আবূ সায়ীদ আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাযিঃ) হতে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙ্গুল দিয়ে কংকর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। (শিশুদেরকে এরূপ খেলা থেকে নিষেধ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে,) এরূপ কংকর নিক্ষেপের ফলে না শিকার মারা যায় আর না দুশমন আহত হয়। তবে এর দ্বারা অবশ্যই চোখ ফুটু হয় এবং দাঁত ভেঙ্গে থাকে।"—বুখারী ও মুসলিম

অপর এক রেওয়ায়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হাদীসের বর্ণনাকারীর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আঙ্গুলের মাথায় পাথর রেখে কাউকে নিক্ষেপ করছিল। এটা দেখে তিনি তাকে এরূপ করতে নিষেধ করে বললেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে পাথর মারতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু সে ব্যক্তি তাঁর নিষেধ গ্রাহ্য না করে আবারো পাথর নিক্ষেপ করল। তখন হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাযিঃ) বললেন, আমি তোকে হাদীস শুনাচ্ছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। আর তুই তারপরও এমনিভাবে পাথর নিক্ষেপ করছিস? আমি ভবিষ্যতে তোর সঙ্গে আর কখনো কথা বলব না।

ভেবে দেখুন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগনের মধ্যে ঈমানের গায়রত কি পরিমাণ ছিল? যদি কেউ প্রিয় নবীর কোন একটি পেয়ারা কথাও না মানত তাহলে তার সাথে সালাম-কালাম পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন। সে ব্যক্তি যত ঘনিষ্ঠ আর নিকট আত্মীয়ই হোক না কেন। প্রকৃতপক্ষে আঙ্গুলের মাথায় পাথর রেখে নিক্ষেপ করা শিশুদের একটি খেলা। যা করতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

মেসওয়াক

١- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ

হাদীস-১ হযরত আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, হযরত রাসূলু মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে বেশী বেশী মেসওয়াক করার নির্দেশ দিচ্ছি।"—বুখারী শরীফ

٢- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

হাদীস-২ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হতে বর্ণিতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন মেসওয়াক মুখের পবিত্রতাকারী এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম।"-নাসায়ী

٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ (اَوْعَلَى النَّاسِ) لاَ مَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلٰوةٍ

হাদীস-৩ হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি আমার এরূপ ধারনা না হত যে, এই বিষয়টি আমার উম্মতের উপর (অথবা বলেছেন যে লোকদের উপর) কঠিন হয়ে যাবে তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রত্যেক নামাযের জন্য (অযুর সাথে) মেসওয়াক করার হুকুম দিতাম। -বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ

এখানে আপনারা মেসওয়াক সম্পর্কে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনটি বাণী পাঠ করেছেন। এগুলি হল এতদ্বসম্পর্কিত হুযূরের বহু হাদীসের মধ্যে কয়েকটি নমুনামাত্র। এ ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার এবং অনেক বেশী বেশী তাকীদ করেছেন। যেমন আপনারা একটু আগেই তাঁর ইরশাদ পড়েছেন যে, তোমরা বেশী বেশী মেসওয়াক কর। মেসওয়াক মুখকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে। আর এ কথা কারো অজানা নয় যে, মেসওয়াক দাঁত পরিষ্কার রাখার একটি সর্বোত্তম মাধ্যম। মেসওয়াক না করলে মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসে। দাঁত অপরিষ্কার হয়ে যায়। আর এর প্রভাব সরাসরি পাকস্থলীতে গিয়ে পতিত হয়। এই কারণে শুধুমাত্র পরিপাক শক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বরং বিভিন্ন প্রকারের ব্যথা ও রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। অতএব, মেসওয়াক মূলতঃ আমাদের নিজেদেরই কল্যাণ বয়ে আনে। আর এর মাধ্যমে মুফতে আমাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জিত হয়ে যায়।

মেসওয়াক ও নববী আদর্শ

মেসওয়াক সম্পর্কে আপনারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি বাণী পাঠ করেছেন। এবার আপনারা তাঁর ব্যক্তিগত আমল দেখুন। যা আমাদের সকলের জন্য নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম আদর্শ ও একমাত্র নমুনা।

(এক) হযরত সুরাইহ ইবনে হানী (রাযিঃ) বলেনঃ

قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ

"আমি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম কি কাজ করতেন? তিনি জওয়াব দিলেন, সর্বপ্রথম তিনি মেসওয়াক করতেন।"–রিয়াযুস সালেহীন

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ النَّوْمِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

(দুই) "হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুম থেকে জাগতেন তখন মেসওয়াক দিয়ে তাঁর মুখ পরিষ্কার করতেন।" – বুখারী ও মুসলিম

(তিন) তৃতীয় হাদীসটিও হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন–

كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ مَاشَاءَ اَنْ يَّبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّيْ ـ

"আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তাঁর মেসওয়াক ও অযুর পানি তৈরী করে রেখে দিতাম। রাতে আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন তখন উঠে তিনি মেসওয়াক করে অযু করতেন ও নামায পড়তেন।"– মুসলিম শরীফ

উপরোক্ত তিনটি পবিত্র হাদীসের আলোকে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেসওয়াকের প্রতি কিরূপ গুরুত্ব দিতেন!

মুখের পরিচ্ছন্নতা

طَهِّرُوْا اَفْوَاهَكُمْ

"তোমারা মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ।"–বায্যার

মুখ পরিষ্কার রাখার বড় মাধ্যম ও পন্থা হল দাঁত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। যদি দাঁত পরিষ্কার না থাকে বা দাঁতে কোন প্রকার রোগ-ব্যাধি থাকে তবে তা দেখতেই শুধু অপরিষ্কার ও বিশ্রী দেখায় না। বরং এ থেকে দুর্বিষহ দুর্গন্ধও বের হয়। যদ্বারা পাশের লোকেরা ক্ষুব্ধ হয় এবং তিরস্কার করে। তাই এ বিষয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম হেদায়েত তো এই দিয়েছেন যে– مَنْ اَكَلَ فَلْيَتَخَلَّلْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি খানা খাবে সে যেন খেলাল করে। (দারামী) খেলাল করার দ্বারা দাঁতের গোড়ায় আটকে যাওয়া খাদ্যাংশ বের হয়ে যাবে, যা মুখ দুর্গন্ধযুক্ত ও দাঁত খারাপ করে।

এ প্রসঙ্গে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি ইরশাদ হল এই যে,

بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ

অর্থাৎ "আহারের আগে এবং আহারের পর অযূ করার দ্বারা খানায় বরকত হয়।" –আবূ দাউদ, তিরমিযী

খানার আগে পরে অযূ করার অর্থ হল হাত ধোয়া ও কুল্লি করা। যা মুখ ও দাঁত পরিষ্কার রাখার অপর একটি বিশেষ পন্থা।

দাঁত ও মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে হুযূর (সাঃ)-এর তৃতীয় ইরশাদ এবং তাঁর সমগ্র জীবনের অন্যতম একটি আমল হল মেসওয়াক। মেসওয়াক সম্পর্কে আমরা পূর্বে বিভিন্ন হাদীস উদ্ধৃত করেছি। এখানে এই বিষয়ে আরো একটি হাদীস সংযোজন করা হল। হাদীসটি বুখারী, মুসলিম এবং নাসায়ী শরীফে সংরক্ষিত রয়েছে। বর্ণিত হয়েছে যে,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ عُرْضًا

অর্থাৎ "হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁতের প্রস্থে মেসওয়াক করতেন।" এভাবে মেসওয়াক করার দ্বারা দাঁতের মাড়ি ক্ষয় হয় না এবং দাঁত সম্পূর্ণ পরিষ্কার সুন্দর ও ঝকঝকে থাকে।

খাৎনা বহু রোগের প্রতিরোধক

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَّا حَسَنٍ وَ حُسَيْنٍ وَمُحْسِنٍ فَاِنَّمَا سَمَّاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَّ عَنْهُمْ وَحَلَقَ رُؤُسَهُمْ وَتَصَدَّقَ وَأَمَرَ بِاَنْ يُّخْتَتِنُوْا ٠

"হযরত আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে হাসান, হোসাইন ও মুহাসসিনের নামে রেখেছেন, তাদের আকীকা করেছেন। তাদের মাথা মুন্ডিয়েছেন। তাদের সদকা দিয়েছেন এবং তাদের খাৎনা করিয়েছেন।–তাবরানী

খাৎনা একটি গুরুত্বপুর্ণ সুন্নত। এটা এমন এক সুন্নত যার মর্যাদা ওয়াজিবের সন্নিকটবর্তী। ইসলামে এর একটি বিশেষ ও মৌলিক স্থান নির্ধারিত রয়েছে। এ জন্যই সাধারণ মানুষের পরিভাষায় খাৎনাকে মুসলমানী নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে এবং এটাকে মুসলমান হওয়ার নিদর্শন হিসাবে কল্পনা করা হয়। খাৎনা কেবলমাত্র একটি রুসম বা প্রথা নয়। বরং এটা বহু কল্যাণ সম্বলিত একটি সুন্নত। অপরদিকে যারা খাৎনা করেনা তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত রোগ-ব্যাধিগুলি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে।

(১) গুপ্তাঙ্গের বাড়তি চামড়া না কাটার কারণে এই অতিরিক্ত চামড়ায় এক প্রকার বিষাক্ত পুঁজ জমা হয়ে যায়। যা বেশ কয়েকটি রোগের কারণ হয়। (২) বাড়তি চামড়ার পুঁজের দ্বারা এক প্রকার ক্ষতরোগের সৃষ্টি হয়। স্বামীর মাধ্যমে স্ত্রীর মধ্যেও এই ক্ষতরোগ সংক্রমিত হওয়ার আশংকা থাকে। (৩) সাধারণতঃ গুপ্তাঙ্গে ব্যথা ও জ্বালা পোড়া সৃষ্টি হয়ে থাকে। (৪) প্রায়শই এমন হয় যে, খাৎনা না করার দরুন বাড়তি চামড়া গুপ্তাংগের আগার নরম অংশের সাথে মিলিত হয়ে যায়। এতে প্রস্রাবে বাধার সৃষ্টি হয়। এই প্রতিবন্ধকতা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয় এবং বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধির উপসর্গ সৃষ্টির কারণ হয়। (ইসলাম ও তিব্বে জাদীদ থেকে সংগৃহীত)। ভেবে দেখুন! ইসলামী শিক্ষার এমন কোন্ দিক রয়েছে যা সর্বোতোভাবে কল্যাণকর নয়। এবং এমন কোন্ খারাবী, অকল্যাণ ও কষ্ট নাই যাতে ইসলামের হুকুম আহকাম ও বিধি বিধান মেনে না চলার কারণে পতিত হতে হয় না?

গরুর দুধ স্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক

গরুর দুধের উপকারিতা সকল জাতির মধ্যেই স্বীকৃত। কোন কোন কল্পনা পুজারী জাতিতো গরুকে উপাস্যের মর্যাদা দিয়ে রেখেছে। তারা গো পূজা করে থাকে। প্রাচীন মিসরীয় সম্প্রদায় এবং ভারতীয় হিন্দু সমাজ এদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)এর মাধ্যমে মিসরীয়দের হাতে গরু জবাই করিয়েছিলেন। আর এ ভাবেই বনী ইসরাঈলদের অন্তর থেকে গরুর পবিত্রতা ও এর উপাসনা করার ভ্রান্তি বিদূরীত হয়েছিল। ভারতীয় হিন্দুরা আজো গরুকে গোমাতা বলে এবং এর পূজা অর্চনায় লিপ্ত রয়েছে।

রাসূলে উম্মী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সবকিছু উৎসর্গিত হোক! তিনি গরুর বিভিন্ন উপকারিতার কথা বলেছেন। কিন্তু গরুকে পবিত্র মনে করে এটাকে পূজা করার কল্পিত ভূঁত ভেঙ্গে মিসমার করে দিছেন। তিনি বুঝিয়েছেন যে, আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের মস্তক একমাত্র চরম সত্য ও পরম উপাস্য আল্লাহ তা'আলার সম্মুখেই নত হতে পারে। এই সমগ্র বিশ্বজগত, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-লতা, পশু-পাখি ও জীব-জন্তু মানুষের খেদমতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলি মানুষের উপাস্য ও প্রভু হতে পারে না।

এবার গরুর উপকারীতা সম্পর্কিত হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী প্রত্যক্ষ করুন। হযরত সুহাইব (রাযিঃ) বলেন, পেয়ারা নবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِلَبَنِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا شِفَاءٌ وَسَمْنُهَا دَوَاءٌ وَلُحُومُهَا دَاءٌ

'গাভীর দুধ তোমাদের জন্য অপরিহার্য করে নাও। কেননা গরুর দুধ আরোগ্যদানকারী। এর ঘি হল ঔষধ স্বরূপ এবং এর গোশতের মধ্যে রোগ রয়েছে।' চিন্তা করে দেখুন, এই তিনটি বিষয় আজো পর্যন্ত যথাস্থানে সঠিক ও স্বীকৃত সত্য হয়ে আছে। প্রাচ্য পশ্চাত্য সর্বত্রই আজো শিশুদেরকে মায়ের দুধের পর গরুর দুধই পান করানো হয়। কেননা এই দুধ তুলনামূলক হালকা ও দ্রুত পরিপাক হয়ে থাকে। তাছাড়া গরুর দুধ শক্তি বর্ধক এবং আরোগ্যদানকারীও বটে।

মধু স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী

মধুর কল্যাণ ও উপকারিতা সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে। যেগুলিতে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে মধুকে ঔষুধ হিসাবে ব্যবহার করার কথা বলেছেন। এখানে আমরা তাঁর এমন কয়টি বাণী পেশ করছি। যেগুলিতে তিনি মধুকে স্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তাকীদ করেছেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘনিষ্ঠ ও সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلٰثَ غَدَوَاتٍ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيْمُ الْبَلَاءِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে তিন দিন সকালে মধু চাটিয়া খাবে, তার কোন বড় রোগ হবে না।" –মিশকাত শরীফ

এই বিষয়ে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আরেকজন সম্মানিত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَائَيْنِ الْعَسَلِ وَالْقُرْاٰنِ

"রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা দুটি শেফাদানকারী বস্তুকে নিজেদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় করে নাও। একটি মধু, (আহার্যের মধ্যে) অপরটি কুরআন (কিতাব সমূহের মধ্যে)" –মিশকাত শরীফ

কারণ এর মধ্যে প্রথমটি (মধু) মানুষের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা এবং দৈহিক রোগ-ব্যাধি শেফাদানে এক অব্যর্থ মহৌষধ। আর দ্বিতীয়টি দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার গ্যারান্টি। বহু শতাব্দী ধরে মানুষ এই দুটি নুসখার দ্বারা উপকৃত হয়ে আসছে এবং আজো হচ্ছে।

রাস্তার প্রশস্ততা ও পরিচ্ছন্নতা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِتَّقُوا اللَّاعِنَيْنَ قَالُوْا وَمَا اللَّاعِنَانِ؟ قَالَ الَّذِىْ يَتَخَلّٰى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ ظِلِّهِمْ ـ

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) হতে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা অভিশম্পাতের দুটি কাজ থেকে বেঁচে থাক। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, সেই দুটি কাজ কি? তিনি ইরশাদ করলেন, মানুষের চলার পথে (সড়কে) বা ছায়াযুক্ত স্থানে পায়খানা করা।"

–মুসলিম শরীফ, রিয়াযুস সালেহীন

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহর অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে খুবই ভালবাসতেন। পাক-পবিত্রতার প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। কারণ এই দু'টি বিষয় শুধু স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই জরুরী নয় বরং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা ও বাতেনী স্বচ্ছতার জন্যও তেমনি অপরিহার্য।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেনঃ

اِجْعَلُوْا الطَّرِيْقَ سَبْعَةَ اَذْرُعٍ

"রাস্তা ও গলি সাত হাত প্রশস্ত রেখো।"–আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্মাণ বিদ্যা শিখানোর জন্য আগমন করেন নাই। তিনি শহরের পরিকল্পনাবিদ বা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞও ছিলেন না। তিনি ছিলেন নবুওয়াতের মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত। তাঁর আগমন ঘটেছিল মানবতার মহান শিক্ষকরূপে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও জীবনের কোন একটি দিকও তাঁর দৃষ্টি থেকে আড়ালে ছিল না। তিনি রাস্তা ও গলি পথকে প্রশস্ত রাখতে বলে নগর প্রকৌশলী ও পরিকল্পনাবিদদেরকেও তাঁর দিক নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত রাখেন নাই।

বদ্ধ পানিতে প্রস্রাবের নিষিদ্ধতা

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهٰى اَنْ يُّبَالَ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ

হযরত জাবের (রাযিঃ) হতে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ্ধ পানিতে প্রশ্রাব করতে নিষেধ করেছেন।"

–রিয়াযুস সালেহীন, মুসলিম শরীফ

এ কথা তো সকলেরই জানা আছে যে, প্রবাহিত পানি পাক। তা নদী, সমুদ্র, নহর বা ঝর্ণা যাই হোক– এ গুলোর পানি পাক। এমনিভাবে পুকুর বা বড় হাউজের বদ্ধ পানিও পাক হয়ে থাকে। এই বড়র পরিমাপ, দৈর্ঘ প্রস্ত ও গভীরতায় ন্যূনতম কতটুকু হতে হবে, ফিকাহবিদগণ তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। প্রচলিত ভাষায় যাকে 'দাহ দার্দাহ' বলা হয়।

বদ্ধ পানি পাক হওয়ার জন্য শর্ত হল এই যে, পানির রঙ গন্ধ ও স্বাদ পরিবর্তন না হতে হবে। অন্যভাবে কথাটাকে এভাবেও বলা যায় যে, পানির পরিমাণ বেশী হবে এবং মাটি বা অন্য কিছুর সংমিশ্রণের দ্বারা পানির আসল অবস্থায় পরিবর্তন না আসতে হবে।

একথা স্পষ্ট যে, হাউজ বা পুকুরের অধিক পানিতে পেশাব করার দ্বারা না পানির রঙ বদলাবে, না স্বাদ নষ্ট হবে। আর না দুগর্ন্ধ সৃষ্টি হবে। এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এই পানি নাপাকও হবে না। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাবগত রুচিবোধ ও পরিচ্ছন্নতা এটাকে পছন্দ করে নাই যে, কেউ বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব-পায়খানা করুক আর তা অন্য লোকদের জন্য কষ্ট ও বিরক্তির উদ্রেক হোক। কেননা শুধু আইনের ধারা রক্ষা করে চললেই জীবন সুখময় হয়ে উঠে না এবং হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জিত হয় না।

পেশাব আটকিয়ে রাখা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ اَعْرَابِىٌّ فِى الْمَسْجِد فَبَالَ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوْهُ وَاَهْرِيْقُوْا عَلٰى بَوْلِه سَجْلاً مِّنْ مَّاءٍ اَوْ ذَنُوْبًا مِّنْ مَّاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একজন গ্রাম্য লোক মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে আরম্ভ করে। অন্যান্য লোকেরা তাকে বাধা দিতে যায়। এ সময় হযরত রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, লোকটিকে ছেড়ে দাও এবং পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা, তোমাদেরকে সহজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে কঠোরতা করার জন্য বানানো হয় নাই।"–বুখারী শরীফ

সেই দৃশ্যটি একবার কল্পনা করে দেখুন। আল্লাহর নবীর মসজিদ (মসজিদে নববী)। যেখানে এক রাকাআত নামায অন্য স্থানে পঞ্চাশ হাজার রাকাআত নামাযের মর্যাদা রাখে। সেই পবিত্র মসজিদে একজন অপরিচিত লোক প্রস্রাব করছে। সংগত কারণেই সাহাবায়ে কেরাম উত্তেজিত হয়ে গিয়ে থাকবেন। তাই

তাদের চিৎকার করা, তাকে ধরার জন্য দৌড়ানো এবং তাকে পেশাব করতে বাধা দেওয়া একটি কুদরতী ও অতি স্বভাবিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু কুরবান হোন সেই রহমতের নবীর জন্য যিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় ভক্ত সাহাবাগণকে বাধা দিলেন এবং বললেন যে, লোকটিকে পেশাব করতে দাও। পরে জায়গাটি পানি দিয়ে ধুয়ে দেবে। তিনি আরো বললেন, তোমাদেরকে মানুষের সাথে সহজ ও সুন্দর আচরণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। মানুষের সাথে কঠোর ও রূঢ় ব্যবহার এবং তাদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করার জন্য তোমাদের পাঠানো হয় নাই। কেননা, পেশাব আটকিয়ে রাখায় অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং এতে কষ্টদায়ক বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়।

কুষ্ঠ কাঠিন্যের প্রতিকার

عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَمَرَنَا اَنْ نَتَوَكَّاء عَلَى الْيُسْرٰى وَنَنْصِبَ الْيُمْنٰى

"হযরত সুরাকা ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল মকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন যে, আমরা যেন পায়খনার সময় বাম পায়ের উপর চাপ দেই এবং ডান পা খাড়া রাখি।" –তাবরানী

এবার আপনি একটু নিজের দৈহিক মেশিনারী অবস্থার চিত্রটি লক্ষ্য করুন। মানুষ আহার করার পর তার নির্যাস নিংড়িয়ে রক্ত মাংসের সাথে মিশে যায় এবং অবশিষ্ট অতিরিক্ত অংশ সমস্ত নাড়িভুঁড়ি হয়ে বাম দিকের নাড়িতে একত্রিত হয়ে থাকে। আর পায়খানার সময় এখান থেকেই মলের আকৃতিতে তা বের হয়।

চিকিৎসকগণ বলেন যে, যদি বাম পায়ের মাধ্যমে এই অতিরিক্ত খাদ্যাংশ ধারণকৃত নাড়ির উপর চাপ দেওয়া হয় তাহলে মল বের হওয়ার ব্যাপারে খুবই সহায়ক হয়। সমস্ত মল অতি সহজে বের হয়ে আসে। পাকস্থলী পরিষ্কার হয়। কুষ্ঠ-কাঠিন্য থাকে না। মন প্রফুল্ল হয়। মনের অস্থিরতা ও অশান্তি দূর হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে নতুন করে কর্মচাঞ্চল্য ও উদ্যম সৃষ্টি হয়।

এখানে চিন্তার বিষয় হল এই যে, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী ও রসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। ডাক্তার ও চিকিৎসক হিসাবে তিনি আবির্ভূত হন নাই। তিনি কোন দিন এরূপ দাবীও করেন নাই। কিন্তু তাঁর প্রতিটি কথা হিকমত প্রজ্ঞা ও স্বভাবগত মৌল নীতিমালার সাথে শতকরা একশত ভাগই সামঞ্জস্যশীল। হবেই বা না কেন? একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, "প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কোন কথাই প্রজ্ঞাশূন্য হয় না।" সর্বোপরি তিনি তো

ছিলেন অহী প্রাপ্ত। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলেন না।" –সূরা নাজমঃ আয়াত ঃ ৩

প্রস্রাব ও পায়খানার আদব

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জীবনের প্রতিটি শাখাতেই দিক-নির্দেশনা রেখে গেছেন। জীবনের এমন কোন দিক শাখা ও বিভাগ নাই যা হুযূর পাক (সঃ)-এর হেদায়াত থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। প্রস্রাব পায়খানার কথাই ধরুন। এ বিষয়ে ডজন ডজন আহকাম বিদ্যমান রয়েছেন। এখানে আমরা জরুরী আহকাম সমূহের শুধুমাত্র সারাংশ পেশ করছি।

(১) হুযূর পাক (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ পায়খানার সময় বসে বাম পায়ের উপর অধিক জোর দেওয়া চাই। যেমন হযরত সুরাকা ইবনে মালেক (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে আছে যে, হুযূর (সাঃ)-আমাদেরকে হুকুম করেছেন যে, পায়খানায় বসার সময় আমরা যেন বাম পায়ের উপর জোর দেই এবং ডান পা খাড়া রাখি। –তাবরানী

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে ও এই পদ্ধতি কুষ্ঠ কাঠিন্যের একটি উত্তম প্রতিকার। কেননা, খাদ্যের নির্যাস শোধিত হয়ে যাওয়ার পর অবশিষ্ট অংশ অন্য সকল নাড়িভুঁড়ি দিয়ে অগ্রসর হয়ে বাম পাশের নাড়িতে জমা হতে থাকে। পায়খানার চাপ সৃষ্টি হলে এখান থেকে তা বের হয়। যদি বাম পায়ের দ্বারা এই নাড়ির উপর জোর দেওয়া হয় তাহলে বর্জাংশ সহজে বের হতে তা সহায়ক হয় এবং কুষ্ঠ কাঠিন্য থেকে মুক্ত থাকা যায়।

(২) পায়খানা করার পর ঢিলা ব্যবহার করার হুকুম রয়েছে। আগে ঢিলার দ্বারা পরিষ্কার করে পরে পানি ব্যবহার করতে হবে।

যারা পায়খানার পর পানি ব্যবহার না করে শুধুমাত্র টয়লেট পেপার দিয়ে পরিচ্ছন্ন হয় তাদের মধ্যে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষতঃ এই সকল লোকদের মলদ্বারে এক প্রকার ফোঁড়া বের হয়ে থাকে। চিকিৎসা শাস্ত্রে এটাকে (PILONIDAL SINUS) বলা হয়। অপারেশন ছাড়া এই রোগের কোন চিকিৎসা নাই।

এতদ্ব্যতীত এই সকল লোকদের পেশাবের রাস্তায় পুঁজ হয়ে যায়। বিশেষ করে মহিলাদের পায়খানার ক্ষতিকর জীবাণু প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে মূত্রাশয় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এতে মুত্রাশয়ে মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয়। কোন কোন সময় এই রোগ এমন অবস্থায় ধরা পড়ে যখন আর এর কোন চিকিৎসার সুযোগ থাকে না।

(৩) পেশাবের পরও মাটির ঢিলার ব্যবহার করা সুন্নতে নববী। অতঃপর পানির দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করা অত্যাবশ্যক। এতদ্ব্যতীত নামায পড়া যায় না। এ কথার অর্থ হল এই যে, পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত নামাযের ন্যায় ইবাদতও কবুল হয় না। এজন্যেই বলা হয়েছে যে, পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ।

বর্তমান যুগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর খুবই জোর দেওয়া হয়। বস্তুত এটা একটা জরুরী বিষয়। কিন্তু ইসলাম বাহ্যিক পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতার সাথে অভ্যন্তরীণ পাক পবিত্রতার প্রতিও তেমনি গুরুত্বারোপ করেছে। যদি মন পবিত্র না হয়ে শুধু তন উজালা হয় তাহলে এটা কি মানুষের কোন বৈশিষ্ট্য হবে? সুতরাং আত্মার পরিশুদ্ধতার জন্য দেহের পবিত্রতাও একান্ত জরুরী।

(৪) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বৃক্ষের ছায়ায় প্রস্রাব পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। হুযূরের এই নির্দেশর মধ্যে অসংখ্য হিকমত রয়েছে। বিশেষতঃ ছায়াযুক্ত গাছের নীচে মুসাফির ও পথচারীরা বিশ্রাম করে থাকে। এরূপ স্থানে প্রস্রাব পায়খানা করে নোংরা করা কোন ভাবেই শোভনীয় নয়।

(৫) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ

অর্থাৎ "তোমাদের কেউ যেন বন্ধ পানিতে পেশাব না করে।"

–বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী

লূ হাওয়া বা গরম বাতাস থেকে আত্মরক্ষা

এক সাহাবী বর্ণনা করেন–

رَاَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ اَرْخٰى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ

"আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরের উপর কাল পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। তখন পাগড়ীর দুই প্রান্ত তাঁর কাঁধের উপর ঝুলছিল।–মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী

গ্রীষ্মকালে সব জায়গাতেই অন্যান্য সময়ের তুলনায় অধিক গরম পড়ে থাকে। বিশেষতঃ গ্রীষ্ম প্রধান দেশগুলিতে তো এই তাপমাত্রা অনেক বেশী বেড়ে যায়। তখন প্রচন্ড তাপের মৌসুমে রোদ্রে বের হলে শরীরে লূ হাওয়া লেগে যায়। এটাকে HEAT STROKE বলে।

লূ হাওয়া লাগার কারণে দেহের তাপমাত্রা ১০৬ ডিগ্রি পর্যন্ত বেড়ে যায়। কোথাও কোথাও এই তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে ১১০ ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ফলে নির্ঘাত মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার কেন্দ্র মানুষের মাথার পেছনের অংশ মস্তিষ্কে বিদ্যমান রয়েছে। তাই মাথা ও ঘাড়ের পেছনের অংশ ঢেকে রাখার দ্বারা এই দুর্বিপাক থেকে আত্মরক্ষা করা যেতে পারে। সুতরাং, হুযূর পাক (সাঃ) এমনভাবে পাগড়ী পরিধান করেছিলেন যেন মাথা ও ঘাড়ের পেছনের অংশ ঢেকে থাকে। আরব এলাকার লোকদের বর্তমান প্রচলিত পোষাকও স্বাস্থ্য রক্ষার একটি উত্তম পদ্ধতি। অর্থাৎ মাথায় রুমাল ও শরীরে ঢিলা-ঢালা জামা ব্যবহার। যা মাথা ও শরীরকে লূ হাওয়ার আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ রাখে।

ছায়া ও রোদ্র

মৌসুমের পরিবর্তনে স্বভাবের উপর প্রভাব পড়ে। সুতরাং প্রত্যেক মৌসুমের পরিবর্তনকালে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি প্রভাবিত হয়। তাই প্রকৃতিগত ভাবেই বসন্তের আগমনে আনন্দ উচ্ছ্বাস এবং বর্ষাকালে অলসতা ও মন্দাভাব দেখা দেয়। ঠিক এমনিভাবে হঠাৎ করে আবহাওয়া ও তাপমাত্রার পরিবর্তন মানুষের মন-মেজাজ ও স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। গ্রীষ্মকাল থেকে শীতকালে পদার্পণের সময় সর্দি লাগা এবং শীতকাল থেকে গ্রীষ্মকালে যাওয়ার সময় গরম লেগে যাওয়া একটি সাধারণ ব্যাপার।

মানুষের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে জনাব রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুভূতি অত্যন্ত তীব্র ছিল। তাই তিনি অতি সাধারণ বিষয়গুলির প্রতিও তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন এবং তাদের যথাযথ হেদায়াত দিয়েছেন।

হুযূরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও সম্মানিত সাহাবী হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেনঃ

قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِى الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ فَصَارَ بَعْضُهُ فِى الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِى الظِّلِّ فَلْيَقُمْ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, যদি তোমাদের কেউ ছায়ার নীচে (বসা বা শুয়া অবস্থায়) থাকে। আর ছায়া তার থেকে দুরে সরে যায় এবং তার দেহের কিছু অংশ ছায়ায় আর কিছু অংশ রোদ্রে থাকে, এমতবস্থায় তার (সেখান থেকে) উঠে যাওয়া উচিৎ। অর্থাৎ অর্ধেক ছায়া ও অর্ধেক রোদে থাকবে না। হয়তো ছায়ায়ই বসবে অথবা রোদ্রেই বসবে।

এ বিষয়ে হযরত ইবনে বুরাইদা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতটিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেনঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَّقْعُدَ الرَّجُلُ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোদ ও ছায়ায় (অর্ধেক ছায়ায় ও অর্ধেক রোদে) বসতে নিষেধ করেছেন।"—জামে সগীর

সফরে রাত্রি যাপন

হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে ঘুমাতেন? এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামদের থেকে বহু সংখ্যক রেওয়ায়াত বিদ্যমান রয়েছে। যেমন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান কাতে শয়ন করতেন। ডান হাত গালের নীচে তাকিয়া হিসাবে রেখে দিতেন। এবং কেবলামুখী হয়ে আরাম করতেন। এটা হল হযরতের ঘরে শুয়ার অবস্থা।

এবার সফরের সময় তিনি কিভাবে আরাম করতেন ও শয়ন করতেন তার বিবরণ শুনুন ঃ

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ فِىْ سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اِضْطَجَعَ عَلٰى يَمِيْنِهٖ وَاِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهٗ وَوَضَعَ رَأْسَهٗ عَلٰى كَفِّهٖ

"হযরত আবূ ক্বাতাদা (রাযিঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেনঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের অবস্থায় কোথাও রাত্রি যাপন করতেন তখন তিনি ডান কাতে শুতেন। আর রাত্রির শেষ দিকে নিজের হাত দাঁড় করিয়ে তাতে মাথা মুবারক রেখে আরাম করতেন।" —মুসলিম শরীফ

উলামাগণ এই রেওয়ায়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, রাত্রের শেষ ভাগে এসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত উঁচু করে তাতে মাথা রেখে এ জন্য শুইতেন যাতে নিদ্রা গভীর হয়ে ফজরের নামায আওয়াল ওয়াক্তে আদায় করতে অসুবিধা না হয়। সফরে ক্লান্তি আসা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। বিশেষতঃ যখন রাত্রের বেলা সফর করা হয়। সফরের শেষ পর্যায়ে এসে মুসাফির ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ে। অপর দিকে তখন নিদ্রা তার উপর প্রচন্ডভাবে হামলা করে বসে। এমতাবস্থায় গা এলিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে সে গভীর নিদ্রায় অবচেতন হয়ে পড়ে। তখন মানুষের আর দুনিয়ার কোন খবর থাকে না।

এক হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষায় সফর-এর আদব বর্ণনা করেন। এখানে উক্ত হাদীসের শেষ অংশ বর্ণনা করা হল।

وَاِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيْقَ فَاِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ ـ

"সফররত অবস্থায় (কোথাও) রাত্রি যাপনের প্রয়োজন হলে সচরাচর চলাচলের স্থান (রাস্তা) থেকে সরে যেয়ে আরাম করবে। যেহেতু রাস্তা চতুষ্পদ জন্তু ও বিষাক্ত কীট (অর্থাৎ কেন্নো, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী ইত্যাদির চলাচলের স্থান।" –মিশকাত শরীফ

চিন্তা করে দেখুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের কোন কোন দিকে এবং জিন্দেগীর কি কি ক্ষুদাতিক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে ভেবেছেন। সত্য কথা বলতে কি জীবনের এমন কোন দিক নাই যার সম্পর্কে আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্ম পদ্ধতি ও সুস্পষ্ট উপদেশ উপস্থিত নাই। ইসলামী শিক্ষার এ ব্যাপকতা দেখে কোন কোন ইসলাম বিরোধী বা বিধর্মী পর্যন্তও এ কথা মানতে বাধ্য যে, ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এটা শুধু মাত্র চারিত্রিক রীতিনীতি অথবা সঠিক ইবাদত বন্দেগীই শিক্ষা দেয় না।

ইরশাদ হচ্ছে, সফরে রাত্রি যাপনের প্রয়োজন হলে রাস্তা ছেড়ে প্রধান সড়ক থেকে দূরে সরে তাঁবু ফেলবে। কেননা এটা পোকামাকড়, গবাদি পশু এবং সাপ বিচ্ছুরও বিচরণের স্থান। যাতে এমন না হয় যে, গভীর ঘুমের মধ্যে এগুলির কোনটি দ্বারা কেউ আক্রান্ত হয় গেল। বস্তুতঃ এটাই হল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য যে, একে অপরের কাজে সাহায্যকারী ও সহানুভূতিশীল হবে এবং কেউ কারো চলার পথে বিঘ্ন ঘটাবে না।

অধ্যায় ঃ ২

রোগ এবং রোগ দর্শন

রোগ সম্পর্কে দুনিয়ার মানুষের মধ্যে অদ্ভূত ধরনের চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। অধিকাংশ লোক রোগকে একটা মুসীবত এবং খোদার গযব মনে করে থাকে। কখনও বা রোগকে জ্বিন ভূত এবং প্রেতাত্মার আছর বলে থাকে। যাহোক এ ধরনের আক্বীদার লোকেরা চিকিৎসার নামে রোগীর সঙ্গে খুবই বেদনাদায়ক আচরণ করে। এমনকি এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক যুগেও মূর্খ লোকদের মধ্যে এ অবস্থাটা বিদ্যমান রয়েছে।

রোগ এবং রোগী সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি? এটাই এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। এখানে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করতঃ ঐ সকল হাদীস একত্রিত করেছি যা রোগ সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গি কি তা সুস্পষ্ট করে দেয়। তাছাড়া ছুত লাগা (সংক্রমণ, স্পর্শ) ইত্যাদির হাকীকত কি? ছোঁয়াছে রোগ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমত কি তাও স্পষ্ট করে।

আমি আশা করি এ অধ্যায়ের হাদীসগুলি আমাদের আধুনিক জ্ঞানী সম্প্রদায়ের অনেক প্রশ্নের যথাযথ জবাব হবে।

রোগ একটা কষ্টি পাথর

এটা কারো অজানা নয় যে, সর্বপ্রকার উন্নতির জন্যই মানুষকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়; কোন সফলতাই পরীক্ষা ও যাচাই বাছাই ব্যতীত অর্জিত হয় না। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াত রয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছেঃ তোমরা কি এ চিন্তা করছ যে, পরীক্ষা ও যাচাই, বাছাই ছাড়াই তোমাদের অমুক অমুক নিয়ামত ও রহমত হাসিল হয়ে যাবে? এ সম্পর্কে সূরা বাকারার ২৪৬ নম্বর, সূরা নেসার ১১৭ ও ১৮৫ নম্বর এবং সূরা ফাতিরের ৬, ও ২৬ নং আয়াত বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

তবে প্রশ্ন হতে পারে পরীক্ষা ও যাচাই কি ভাবে হবে? এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ

"আর আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিঞ্চিৎ ভয় দ্বারা, আর উপবাস দ্বারা এবং ধনের, প্রাণের ও ফসলের স্বল্পতা দ্বারা" (সূরা বাকারাঃ আয়াতঃ ১৫৬)

এভাবে পরীক্ষার বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে প্রাণের ক্ষতিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চাই সেটা মৃত্যুর আকারে হোক কি রোগের সুরতে হোক।

এ কারণে আমাদের বুযুর্গ ও সুফীয়ায়ে কেরামগণ রোগকে আল্লাহর রহমতের অছিলা এবং পদোন্নতির একটা সোপান হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আর যে ব্যক্তির রোগ হয় না তাকে দুর্ভাগা মনে করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ তাসাউফ বা সুফীবাদের কিতাবে এমন অনেক ঘটনা দেখা যায় যে, কোন মুরীদ কখনও যদি রোগাগ্রস্ত না হয়েছে, তবে মুর্শিদ তার বুযুর্গীর মধ্যে সন্দেহ পোষণ করেছেন। স্বামী রোগে না পড়লে নেককার স্ত্রী তার নেক কর্মের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হয়েছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ)-এর এই রেওয়ায়াত নকল করেছেন যে, তিনি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ "আমি দুনিয়ায় যখন আমার কোন বান্দাকে দুটি প্রিয় জিনিস দ্বারা কষ্ট দেই এবং সে ধৈর্য্যের আঁচল হাত থেকে না ছাড়ে, তবে এর বদলায় আমি তাকে জান্নাত দিয়ে থাকি। আর উত্তম ও প্রিয় জিনিস দ্বারা উদ্দেশ্য হল তার দু'চোখ। –বুখারী, মুসলিম

রোগ মঙ্গল ও সফলতার মাধ্যম

ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তিক ধর্ম। ইসলামের সমস্ত নিয়ম কানুন ও মৌলিক বিষয়াবলী সম্পূর্ণ স্বভাবগত। তাই ইসলামী শিক্ষানুযায়ী অসুস্থতা কোন আযাব নয় বরং আল্লাহর রহমতের অছিলা মাত্র। এ রোগ আমাদের জন্য খায়ের-বরকত ও সফলতার অছিলা হয়ে যায়। যেমন হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّصِبْ مِنْهُ

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা যাকে কল্যাণ দান করতে চান তাকে কষ্টে ফেলেন।"–মুয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবুল জামেয়

প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা যায়, রোগ কঠোর প্রকৃতির অবাধ্যদেরকেও শিথিল ও স্বাভাবিক করে ফেলে, কঠিন থেকে কঠিন লোকের মধ্যেও অন্তরজ্বালা ও কোমলতা সৃষ্টি করে। এই রোগের সময় অনেক উঁচু তলার লোকের মুখেও আল্লাহর নাম শোনা যায় এবং তাঁদের দিলে আল্লাহর স্মরণ জাগে। হ্যাঁ, তবে যার পরিণাম একান্তই খারাপ তার জন্যে কোন চিকিৎসা নাই। তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ তা'আলা তার

নিকট দু'জন ফিরিশতা পাঠিয়ে বলেন, দেখ হে ফিরিস্তা, সে তার শুশ্রূষাকারীর সঙ্গে কি কথাবার্তা বলছে। যদি সে অসুস্থ হওয়ার কারণে মহান আল্লাহ তা'আলার গুনকীর্তন করতে থাকে তবে সে খবর ফিরিস্তাগণ আল্লাহর নিকট নিয়ে যায়। যদিও আল্লাহ স্বয়ং সব কিছু জানেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেনঃ

إِنْ تَوَفَّيْتُهُ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ أَنَا شَفَيْتُهُ أَنْ أُبْدِلَ لَهُ لَحْمًا وَ دَمًا خَيْرًا مِّنْ دَمِهِ وَأَنْ أُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّاٰتِهِ

"আমি যদি তাকে মৃত্যুর সঙ্গে আলিঙ্গন করাই তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যদি তাকে রোগ থেকে মুক্তি দেই তবে তার খারাপ গোশতকে উত্তম গোশত দ্বারা এবং দুষিত রক্তকে উত্তম রক্ত দ্বারা পরিবর্তন করে দিব এবং তার পাপরাশিকেও দূর করে দিব। এ হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন আতা ইবনে ইয়াসার (রাযিঃ) –মুয়াত্তা ইবনে মালেক

রোগে ধৈর্য্য ধারণ জান্নাত লাভের অছিলা

কিছু মানুষ রোগকে এক ধরনের আযাব ও অভিশাপ মনে করে থাকে। এ সকল লোকের নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র হাদীস নিয়ে চিন্তা করতঃ স্বীয় ভ্রান্ত ধারণা পরিবর্তন করে ফেলা উচিত। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রোগকে জান্নাত লাভের অছিলা বলেছেন।

হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আতা ইবনে আবী রোবাহ্ (রাযিঃ) বলেন, একবার আমাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বললেন, আমি কি আপনাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখিয়ে দেব না?

আমি বললাম, কেন দেখাবেন না? অবশ্যই দেখান।

তিনি বললেন, "ঐ কালো মহিলাকে দেখুন।" এই মহিলা একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন আমার মৃগী রোগের চাপ শুরু হয় তখন কখনও কখনও আমার ছতর খুলে যায়, তাই আল্লাহর দরবারের আমার সুস্থতার জন্য দুআ করুন।"

নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ

إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللّٰهَ لَكَ أَنْ يُّعَافِيَكِ

"তুমি পারলে ধৈর্য্য ধারণ কর, তুমি জান্নাত পাবে। আর যদি তুমি চাও তবে আমি আল্লাহর নিকট তোমার রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করি। উক্ত মহিলা বলল,

হুযূর, (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি সবর করব। অতঃপর মহিলা বললঃ

فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ لَا اَتَكَشَّفَ فَدَعَالَهَا

"তবে আপনি আল্লাহর নিকট এই দুআ করুন যেন আমার ছতর খুলে না যায়। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য ঐ দুআ করলেন।" –বুখারী, মুসলিম

রোগ এবং গোনাহ

দেখা যায় কোন কোন সম্মানিত ব্যক্তি ও রোগকে খারাপ কাজ ও গোনাহের কারণ মনে করে এরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, রোগ হল পূর্বের কোন পাপের প্রায়শ্চিত্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, রোগ গোনাহের কারণ নয় বরং গোনাহের ক্ষতিপূরণ ও কাফ্‌ফারা স্বরূপ। এ সম্পর্কে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহামূল্যবান বাণী থেকে দুটি বাণী পেশ করছি।

اِنَّ اللّٰهَ لَيُكَفِّرُ عَنِ الْمُؤْمِنِ خَطَايَاهُ كُلَّهَا بِحُمَّى لَيْلَةٍ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ "নিশ্চয়ই মুমিনের একরাত্রির জ্বর তার সকল গোনাহ দূর করে দেয়।" –তারগীব তারহীব

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে "জ্বর" সম্পর্কে আলোচনা করা হলে এক ব্যক্তি জ্বরকে গাল-মন্দ দিল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

لَا تَسُبَّهَا فَاِنَّهَا تَنْقِى الذُّنُوْبَ كَمَا تُنْقِى النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ

"জ্বরকে গালি দিও না, কেননা এটা গোনাহকে এমন ভাবে মিটিয়ে দেয় যেমন ভাবে আগুন লোহার মরিচা (জং) এবং ময়লা পরিষ্কার করে দেয়।" –ইবনে মাজাহ

"হযরত উম্মুল আ'লা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি অসুস্থ ছিলাম, এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এসে বললেন, উম্মুল আলা! তোমার জন্য সুসংবাদ। মুসলমানের রোগ তাঁর গুনাহকে দূর করে দেয়। যেমন ভাবে আগুন স্বর্ণ রূপার ময়লা দূর করে দেয়।" –সুনানে আবূ দাউদ

রোগ পাপের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ

কোন কোন লোক রোগ-ব্যাধিকে এক ধরনের আযাব মনে করে থাকে। অথচ সকল প্রকার কষ্ট সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষের জন্য রোগ-ব্যাধি রহমতের অছিলা

বলে প্রমাণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, রোগ-ব্যাধি অধিকাংশ মানুষের জন্য গোনাহের কাফফারা বা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ।"

لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنُ مِنْ مُصِيبَةٍ حَتَّى الشَّوْكَةِ إِلَّا قُصَّ بِهَا أَوْ كُفِّرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

"হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুমিন এমন কোন কষ্ট পায় না, এমন কি তার কোন কাঁটা বিঁধে না যার অছিলায় তার গোনাহ মাফ করা না হয়।"

–মুয়াত্তা, কিতাবুল জামে

তাই আমাদের কোন কাঁটাও যদি বিঁধে তবে তা আমাদের গোনাহের কাফফারা এবং আমাদের পাপ মোচন হওয়ার একটা উত্তম বাহানা হয়ে যায়।

অন্য একটি হাদীস লক্ষ্য করুন। এই হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন হযরত ইয়াহিয়া ইবনে সায়ীদ (রাযিঃ)। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হলে কোন একজন লোক উক্ত মাইয়্যেতকে উদ্দেশ্য করে বলল, "কতইনা সুন্দর মৃত্যু হয়েছে। কোন রোগে ভুগল না আর মৃত্যু হয়ে গেল।"তার এই কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ

وَيْحَكَ وَمَا يُدْرِيكَ لَوْ أَنَّ اللّٰهَ ابْتَلَاهُ بِمَرَضٍ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ

"তোমার উপর আফসোস, তুমি কি জান না, আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে কোন রোগে ফেললে-এর কারণে তার পাপরাশি মাফ করে দেন।"

–মুয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবুল জামে

এ সম্পর্কে আরও কয়েকটি রেওয়ায়তে আছে, যাতে বলা হয়েছে যে, রোগের কারণে গোনাহ মাফ হয়ে যায়। রোগ বালা মানুষের মধ্যে অনুতাপ, কোমলতা, বিনয়, বশ্যতা, নম্রতা, খোদা ভীতি এবং পরকালের স্মরণ সৃষ্টি করে। ধৈর্য্য ও শুকরিয়ার মানসিকতা পয়দা করে। সৌভাগ্য সেই ব্যক্তির, যে রোগের মাধ্যমে লাভবান হয়ে স্বীয় যিন্দেগীকে নেকী দ্বারা সুসজ্জিত করেছে এবং আখের গুছিয়ে নিয়েছে।

দুঃখ-কষ্ট এবং রোগ-ব্যাধি গোনাহের কাফফারা

রোগ-ব্যাধি নিঃসন্দেহে কষ্টদায়ক, তবে সর্বদা এটা আযাব হিসাবে আসে না। যা আমি এখনই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের

আলোকে বর্ণনা করেছি। রোগ-ব্যাধি যে গোনাহের কাফফারা এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস দেখে নিন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ وَّصَبٍ وَّلاَ نَصَبٍ وَّلاَ سَقَمٍ وَّلاَ حُزْنٍ حَتّٰى الْهَمِّ يَهُمُّهُ اِلاَّ كُفِّرَ بِهٖ عَنْ سَيِّاٰتِهٖ

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুসলমানের এমন কোন ব্যথা, কষ্ট, ক্লান্তি, রোগ, পেরেশানি বা কোন ছোট থেকে ছোট কষ্ট নাই যার দ্বারা তার পাপ দূর না হয়।"–বুখারী, মুসলিম

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছেঃ

مَامِنْ اِمْرِئٍ مُّؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ يَمْرَضُ اِلاَّ جَعَلَهُ اللّٰهُ كَفَّارَةً لِّمَا مَضٰى مِنْ ذُنُوْبِهٖ

"মুমিন পুরুষ অথবা মহিলা মাত্রই কোন রোগগ্রস্থ হলে আল্লাহ উক্ত রোগীকে তার পূর্বের গোনাহ মাফের একটা অছিলা করে দেন।"

হযরত আবূ নাঈম (রাযিঃ) ও এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন– اَلاَمْرَاضُ كَفَّارَةٌ لِّمَا مَضٰى "যা কিছু ভুল–ভ্রান্তি হয়ে যায় রোগ তার কাফফারা স্বরূপ।" কারও মাথায় যদি এ চিন্তা ও সন্দেহ আসে যে, রোগ কি করে গোনাহের কাফফারা হয়? তবে তার স্মরণ রাখা উচিত, যেমনভাবে আগুনের ভাট্টি লোহার মরিচা দূর করে, স্বর্ণকারের কাঠালা স্বর্ণের ময়লা পরিষ্কার করে ফেলে তেমনি রোগ শয্যায় মানুষ অনিচ্ছাকৃত আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে। তার মুখে অকৃত্রিমভাবে আল্লাহ আল্লাহ শব্দ এসে পড়ে। সে তার স্বীয় অপরাধের জন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতের জন্যে সে গোনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে রোগ শয্যা ত্যাগ করে। দয়াময় আল্লাহর নিকট বান্দার এ ভঙ্গিটা খুবই পছন্দনীয়।

মৃত্যুর প্রার্থনা করো না

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ

"হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন মৃত্যুর প্রার্থনা না করে।" – আবূ দাউদ

উক্ত সাহাবী নিম্নের শব্দ সমূহের মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ এভাবে বর্ণনা করেনঃ

لَا يَدْعُونَّ أَحَدُكُمْ بِالْمَوْتِ بِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ وَلٰكِنْ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِى مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّى وَتَوَفَّنِى إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّى

"তোমাদের কেউ কষ্টের কারণে মৃত্যুর দুআ করো না বরং এ কথা বল, হে আল্লাহ! যতদিন আমার জীবিত থাকা উত্তম ততদিন আমাকে জীবিত রাখুন এবং যখন আমার জন্যে মৃত্যু উত্তম তখন আমাকে মৃত্যু দিন। –সুনানে আবূ দাউদ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খুবই পরিষ্কার ভাষায় মৃত্যুর আকাংখা ও দুআ করতে নিষেধ করেছেন এবং আত্মহত্যাকে হারাম মৃত্যু বলে ঘোষণা করেছেন। ঐ সকল লোকেরাই মুত্যুর আকাংখা করে থাকে এবং হাতছানি দিয়ে মৃত্যুকে ডাকতে থাকে যারা দীর্ঘ মেয়াদী বিমার অথবা কষ্টে হতবুদ্ধি বা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে বা অভাব ও ব্যর্থতায় মন অধৈর্য হয়ে যায়। পক্ষান্তরে দয়া আধার সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর যারা দৃঢ় ঈমান রাখে তাদের নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। কেবল মাত্র কাফেরগণই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

لَا تَايْئَسُوا مِنْ رَّوحِ اللّٰهِ اِنَّهُ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ

"তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, কেবল কাফের সম্প্রদায়ই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়।" – সূরাহ ইউসুফ ঃ আয়াত ঃ ৮৭, ১২

যে কখনও অসুস্থ হয় নাই

রোগ-ব্যাধি মানুষের গোনাহের কাফফারা স্বরূপ হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় বাণী লক্ষ্য করেছেন। এখন যে কখনও রোগে পড়ে নাই তার বিষয় লক্ষ্য করুন।

হযরত আমের ইবনে রাম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরামদের মজলিসে বললেন, নিশ্চয়ই কোন মুমিনের যদি রোগ হয় অতঃপর আল্লাহ আরোগ্য দান করেন তবে এটা তার পিছনের গোনাহর কাফফারা হয়ে যায়। (এ কথা শুনে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশে পাশে যে সকল সাহাবাগণ বসা ছিলেন তাদের একজন বলে উঠলেন–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا الْاَسْقَامُ؟ مَا مَرِضْتُ قَطُّ

"হে আল্লাহর রাসূল! বিমারের অর্থ কি? আল্লাহর ফযলে আমারতো কখনও অসুখ-বিসুখ হয় নাই।" قَالَ قُمْ فَلَسْتَ مِنَّا "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, উঠে দাঁড়াও, তুমি আমার (উম্মতের) অন্তর্ভুক্ত নও।"

–আবু দাউদ

দেখা গেল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগকে ঈমানের একটা আলামত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। যে ব্যক্তি কখনও রোগে পতিত হয় না তার ঈমান এবং পবিত্রতার মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র ইরশাদ করেনঃ

عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ جَزْعَةٌ مِّنَ السَّقَمِ وَلَوْ يَعْلَمُ مَالَهُ فِى السَّقَمِ وَجَبَ اَنْ يَّكُوْنَ سَقِيْماً حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى

"ঐ মুমিনের প্রতি আমি আশ্চর্য হই, যে মুমিন হয়েও রোগের কারণে অধৈর্য্য হয়। যদি সে জানত যে রোগের মধ্যে তার কি উপকার রয়েছে তাহলে সে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত রোগাক্রান্ত থাকতে চাইত।" –বায্যার

রোগকে গাল মন্দ করো না

রোগ সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি তা জেনেছেন, আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রোগকে গোনাহের কাফফারা, সওয়াবের অগ্রদূত এবং নেকীর কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে আমাদের বুযুর্গগণ সুস্থ থাকার জন্যও এভাবে দুআ করতেন, "মাওলা করীম! রোগের মত নিয়ামতকে সুস্থতার নিয়ামত দ্বারা বদলিয়ে দিন।" এ কারণে কোন সাচ্চা মুসলমানের পক্ষে রোগকে গালমন্দ করা কখনও ভাল কাজ নয়। এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশার একটা ঘটনা দেখুন।

হযরত জাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সায়েব অথবা উম্মে মুসাইয়্যেব (রাযিঃ)-এর নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হয়েছে যার কারণে তুমি কাঁপছ? তিনি বললেন اَلْحُمّٰى لاَ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْهَا জ্বরে আক্রান্ত হয়েছি। আল্লাহ এর কল্যাণ না করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেনঃ

لاَ تَسُبِّى الْحُمّٰى فَاِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِىْ اٰدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ

"জ্বরকে গালি দিও না। কারণ এটা আদম সন্তানের গোনাহ সমূহ এমনভাবে দূর করে দেয় যেমনভাবে কামারের ভাট্টি জং এবং ময়লা পরিষ্কার করে ফেলে।"

–মুসলিম শরীফ

এ সম্পর্কে আরো একটি ঘটনা লক্ষ্য করুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এক ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলে জনৈক ব্যক্তি বললেন, তার কতই না সুন্দর মৃত্যু হল, কোন রোগ না ভুগেই মৃত্যুর সঙ্গে আলিঙ্গন করল।" লোকটির একথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার উপর আফসোস, তুমি জান না, যদি আল্লাহ তাকে কোন রোগে আক্রান্ত করতেন, তাহলে ঐ রোগের কারণে তার গোনাহ সমূহ দূর হয়ে যেত।"

—মুয়াত্তা ইমাম মালেক

রোগীর ইবাদত

রোগের আর কোন বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া দেখা যাক বা না যাক কিন্তু সাধারণভাবে রোগের কারণে মানুষের অভ্যাসের মধ্যে অবশ্যই কিছু পরিবর্তন এসে যায়। নিদ্রা ও জাগরণে হোক অথবা ফরজ, সুন্নত ও নফল আদায়ের ব্যাপারে হোক অথবা যিন্দিগির গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য ক্ষেত্রে হোক অনেক সময় রোগ একগুলির মধ্যে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ স্বরূপ জখমী ব্যক্তি অযূ করতে পারে না, দুর্বল ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায়ে অক্ষম হয়। চোখের ব্যথার কারণে আল্লাহর পবিত্র কালাম তেলাওয়াত করতে না পারা এবং সৃষ্টির বা মানবজাতির অগণিত খেদমত থেকে মাহরূম হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

এভাবে রোগের কারণে কিছু নেকী থেকে বঞ্চিত হওয়ায় কুদরতীভাবেই অন্তরে এক ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবানে বলে দিয়েছেনঃ

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا أَوْ صَحِيحًا

"আল্লাহর কোন বান্দা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা সফর (ভ্রমণ)রত অবস্থায় থাকে তখন তার আমল নামায় সেই পরিমাণ নেকীই লেখা হয় যে পরিমাণ আমল সে মুকীমাবস্থায় অথবা সুস্থ থাকা কালে করত।" —বুখারী শরীফ

উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হল এই যে, যদি অসুস্থতার মজবুরী অথবা মাজুর হওয়ার কারণে কিছু নেক আমল বাদ যায় তবে তার সওয়াব সে যথারীতি পেয়েই যাবে। আর রোগের সওয়াব ও অন্যান্য প্রতিদান তো আলাদা থাকবেই।

রোগীর দুআ

অনেক লোক রোগ ব্যাধিকে একটা আযাব মনে করে থাকে। তারা রোগকে আল্লাহ জাল্লা-শানুহুর নারাযী ও অসন্তুষের কারণ মনে করে একটা ভুল ধারণার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। অথচ অনেক সময়েই বান্দার পরীক্ষার জন্যে রোগ হয়ে

থাকে। আর পরীক্ষায় সফলকাম হওয়ার পর তার নেকী বেড়ে যায় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তাই কোন রোগীর জন্যেই আল্লাহর প্রতি রাগান্বিত হয়ে আল্লাহর ক্রোধে গ্রেফতার হওয়া উচিত নয়। রোগের পরিণতি তো মঙ্গলজনকও হতে পারে। কারণ একজন ধৈর্য্যশীল, শোকরগুজার এবং খোদানির্ভর রোগীর প্রতি আল্লাহর রহমত বাড়তে থাকে, রোগ তার জন্য রহমত স্বরূপ হয়। রোগের কারণে সে আল্লাহর প্রতি আরও অধিক নিবিষ্ট হয়। এভাবে সে দুআ কবুল হওয়ার দর্জা হাসিল করে নেয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِذَا دَخَلْتَ عَلَى الْمَرِيْضِ فَمُرْهُ يَدْعُوْلَكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلٰئِكَةِ

"তুমি যখন রোগীর নিকট যাবে তখন তাকে তোমার জন্য দুআ করতে বলবে। নিশ্চয়ই তার (রোগীর) দুআ ফিরিশতাদের দুআর মত। -ইবনে মাজাহ

দুআ সম্পর্কিত এ বিষয়টা কতইনা ব্যাপক যে, মানুষ যদিও নিজের জন্য নিজ প্রয়োজনে দুআ করে তথাপি সে প্রত্যেক নেক দুআর একটা করে সওয়াব পায়। এমনকি কারো নিকট দুআর দরখাস্ত করলেও তা নেকীর মধ্যে শামিল হয়। কারণ এটাও তাকে নেকের প্রতি দাওয়াত দেয়।

কোন রোগীর নিকট বিশেষভাবে কোন দুআ চাওয়া এ কারণেও বরকতের বিষয় হয়ে থাকে যে, সে সর্বদা কষ্টভোগ করতে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি তার মনোযোগ অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। সে সদা সর্বদা আল্লাহর করুণার প্রার্থী হয়ে থাকে।

ছুত-ছাত অর্থাৎ সংক্রমণ, স্পর্শ ইত্যাদি

ছুত-ছাত সম্পর্কে আমাদের দেশে দুই বিপরীত মত দেখা যায়। এক দল কোন প্রকার ছুত-ছাত বা সংক্রামক ব্যাধিতে বিশ্বাসী নয়। তাদের মতে এমন কোন রোগ নাই যা একজন থেকে অন্যের মধ্যে ছড়াতে পারে। তারা ছুত-ছাতকে মনগড়া খেয়াল মনে করে এবং ঈমানের দুর্বলতা অথবা কমপক্ষে খোদা প্রদত্ত তাকদীর থেকে দূরে চলে গেছে বলে অহেতুক মন্তব্য করে থাকে। বাস্তবে কতিপয় সংক্রামক ব্যাধি রয়েছে। যেমন কফ, ইনফ্লুয়েনজা, বসন্তরোগ, কলেরা, তাউন, ইত্যাদি। এগুলি একজন রুগ্ন ব্যক্তি থেকে অপর সুস্থ্য ব্যক্তির উপর এমন প্রভাব ফেলে যেমন আগুন, পানি, ঠান্ডা ও গরম শরীরের উপর স্বীয় বৈশিষ্ট্যগত প্রভাব বিস্তার করে। তবে এগুলি সবই আল্লাহর হুকুমে হয়ে থাকে।

অন্য একদল ছুত-ছাত সম্পর্কে কল্পিতভাবে ভয়ের এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা সুন্নত তরীকায়ও রোগীর সাথে মিশে না। এক বর্তনে একত্রে খানা খায় না। শরিকানা গ্লাস ব্যবহার করে না। রুমাল এবং তোয়ালে একে অপরেরটি ব্যবহার করে না। ছুত লাগার চিন্তা তাদের উপর এ পরিমাণ চেপে বসেছে যে প্রতিটি শরীকানা বিষয় তাদের নিকট স্বাস্থ্য রক্ষানীতির পরিপন্থী। এ সকল ব্যক্তি এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বনকে ঈমান ও একীনের উপর প্রধান্য দেয়। এ সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কি, নিম্নোক্ত হাদীসের আলোকে লক্ষ্য করুন।

হযরত ইবনে আতিয়া (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا عَدْوٰى وَلَاهَامَ، وَلَا صَفَرَ، وَلَا يَحِلُّ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ وَلْيَحْلِلِ الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنَّهٗ اَذًى

"ছুত-ছাত, পেঁচা ও মৃত আত্মার শুগন (ভবিষ্যতে ভাল মন্দের লক্ষণ) কোন বিষয় নয়। আর সফর মাসেও অশুভ কোন কিছু নাই। অবশ্য রুগ্ন পশু সুস্থ পশুর কাছে নিয়ে যাবে না। সুস্থ জানোয়ারকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাও। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসুল। এর কারণ কি? ইরশাদ করলেন, এটা ঘৃণা অথবা কষ্টের বিষয়।" –মুয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবুল জামে

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁচি দেওয়ার পদ্ধতি

শায়েখ আবূ হাইয়্যান ইসপাহানী (রহঃ) রচিত আখলাকুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমি তিনটি হাদীস বর্ণনা করছি। তিনটি হাদীসেরই রাবী হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ)। তিনি বর্ণনা করেনঃ

١– كَانَ اِذَا عَطَسَ غَضَّ بِهَا صَوْتَهٗ وَاَمْسَكَ عَلٰى وَجْهِهٖ۔

٢– كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهٗ اَوْ ثَوْبَهٗ عَلٰى فَمِهٖ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهٗ۔

٣– كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا عَطَسَ غَطّٰى وَجْهَهٗ بِثَوْبِهٖ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى حَاجِبَيْهِ۔

(১) "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁচি দেওয়ার সময় নিজ আওয়াজকে নীচু করে নিতেন এবং মুখমন্ডলকে ঢেকে রাখতেন।"

(২) "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাঁচি দিতেন তখন তার হাত অথবা কাপড় মুখের উপর রাখতেন এবং আওয়াজ ছোট করে নিতেন।"

(৩) "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাঁচি এলে স্বীয় চেহারা মোবারককে তাঁর কাপড় দ্বারা ঢেকে নিতেন এবং তাঁর দুই হাত কপাল মোবারকের উপর রাখতেন।" –আল বাইয়্যেনাতঃ করাচী, জিলহজ্ব ১৩৯০ হিঃ

আল্লাহ! আল্লাহ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব কতই না পবিত্রতা ও সূক্ষ্মদর্শীতায় ভরপুর ছিল এবং অপরের অসুবিধা ও কষ্টের ব্যাপারে তিনি কতইনা সতর্ক ছিলেন।

হাঁচি এবং অশুভ লক্ষণ

সাধারণভাবে হাঁচি দেওয়াকে মজলিসের আদবের খেলাপ মনে করা হয়। কল্পনা ও সন্দেহ পুঁজক হিন্দু সম্প্রদায় ও অন্যান্য কল্পনা পুঁজারী জাতিও হাঁচিকে একটা বড় অশুভ লক্ষণ মনে করে থাকে। সম্ভবতঃ এ ধরনের বিজাতীয় সংশ্রবের ফলেই কিছু কিছু মুসলমানও এমন ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছে। আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের ভেতরেও এ ধরনের কিছু ভ্রান্ত পরিভাষা অনুপ্রবেশ করেছে।

স্মরণ রাখবেন! হাঁচির মধ্যে কোন প্রকার অশুভ লক্ষণ নাই। বেশীর থেকে বেশী এটা একটা রোগ বা রোগের লক্ষণ। আমাদের নবী এবং খোদার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁচির জন্য আল্লাহর হামদ, প্রশংসা, শুকরিয়া ও অভিনন্দনকে ওয়াজিব বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, "কোন ব্যক্তির হাঁচি এলে সে আলহামদুলিল্লাহ বলবে। আর হাঁচি শ্রবণকারী يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলবে অর্থাৎ তোমার উপর আল্লাহ রহমত বর্ষন করুন। অতঃপর দোয়ার জবাবে হাঁচি দাতা বলবে- يَهْدِيكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের সঠিক পথ দেখানে এবং তোমাদের শান (অবস্থা) ঠিক রাখুন।" –বুখারী, মুসলিম

একটু চিন্তা করে দেখুন, হাঁচি কোন অভিশাপ নয় এবং কোন কুলক্ষণও নয় বরং আল্লাহর রহমত অথবা তাঁর রহমতের অছিলা। এ কারণে হাঁচিদাতার উপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। আর হাঁচিদাতার সঙ্গে একত্রে উপবেশনকারী এবং শ্রবণকারীদের উপর হাঁচিদাতার জন্য দুআ করা সুন্নত। যার শুকরিয়া হিসাবে হাঁচিদাতা পুনরায় তাদের জন্য হেদায়াত, সুস্থতা ও নিরাপত্তার দুআ করে। এভাবে সমস্ত মজলিসটি সওয়াব, মঙ্গল ও বকরতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তবে শর্ত হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নত মুতাবিক আমল হতে হবে।

হাই তোলা শয়তানের কাজ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ۔

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, হাই তোলা শয়তান থেকে উৎপত্তি হয়। সুতরাং তোমাদের কারো হাই এলে যথা সম্ভব এটাকে ফিরিয়ে রাখবে। কেননা তোমাদের কেউ যখন (হাই তোলার সময়) "হা" করে তখন শয়তান হেসে দেয়।"–বুখারী শরীফ

হাই সাধারনত ঃ ক্লান্তি এবং খারাপ কল্পনা জল্পনার কারণে এসে থাকে বা যখন ঘুমের প্রভাব বৃদ্ধি পায় তখন বার বার হাই আসতে থাকে। অনুরূপভাবে অনিচ্ছা ও অনাগ্রহও হাই আসার কারণ হয়। উদাহরণ স্বরূপ কোথাও কোন বক্তৃতা ও ওয়াজ চলছে আর কোন শ্রবণকারী ওয়াজ শুনতে শুনতে বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তখন তার হাই আসা শুরু হয়ে যাবে। হাই তোলার দ্বারা মানুষের চেহারার অবস্থা খুবই বিকৃত হয়ে পড়ে, সুশ্রী মানুষেরও আকৃতি বিগড়ে যায়। দেখনে ওয়ালাদের নিকট এ অবস্থাটি খুবই বিশ্রী মনে হয়। ক্লাশ চলাকালীন অবস্থায় ছাত্রদের হাই এবং বক্তৃতা ও ওয়াজ শ্রবণ অবস্থায় শ্রোতাদের হাই শিক্ষক ও ওয়াজকারীর জন্য অত্যন্ত মনো বেদনার কারণ হয়। মেহমান হাই ছাড়তে লাগলে মেজবানের নিকট এটা অসহ্য মনে হয়।

স্বভাবগত মনোচিকিৎসক হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হাই শয়তানের কাজ, যথাসম্ভব এটাকে ফিরিয়ে রাখ। যদি অনিচ্ছাকৃত হাই এসে যায় তবে অন্ততপক্ষে মুখ অতিরিক্ত ফাঁক করা থেকে বিরত থাক এবং হা শব্দটির আওয়ায বের করো না।

যাদু মন্ত্র ও দুআ

ঝাড়-ফুঁক, দরূদ, অযীফাহ এবং দুআ সম্পর্কে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় হাদীস বর্ণনা করছি। তবে (নাউজুবিল্লাহ) এগুলির মধ্যে কোন শিরক বেহুদা বা নিরর্থক কিছু নাই। পক্ষান্তরে যাদু, মন্ত্র ইত্যাদির মধ্যে সব ধরনের খারাবী রয়েছে যা কখনও ইসলাম স্বীকৃতি দেয় নাই। নিম্নে আমি আবূ দাউদ শরীফ থেকে একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাকৃত হাদীসের তরজমা নকল করছি যা মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবেও রয়েছে।

এই দীর্ঘ হাদীসখানা إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَأَى فِي عُنُقِي خَيْطًا فَقَالَ مَا هٰذَا ؟ দিয়ে শুরু এবং شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا শব্দের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। পুরো হাদীসের অর্থ নিম্নরূপঃ

"হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) এর স্ত্রী হযরত যয়নব (রাযিঃ) বলেন,

আমার স্বামী হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) আমার গলায় সামান্য একটু সুতা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? আমি উত্তরে বললাম এক ব্যক্তি ঝাড়-ফুঁক দিয়ে আমাকে এটা গলায় বাঁধার জন্যে দিয়েছে। এ কথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) ওটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন– "হে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের গৃহিনী! তোমরা শিরিকের মুখাপেক্ষী হইও না। কেননা আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– ঝাড়-ফুঁক, পৈতা এবং যাদু শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত যয়নব (রাযিঃ) বলেন, আমি আমার স্বামীকে বললাম, আমার চোখে অসুখ হলে অমুক ইহুদীর কাছে গিয়ে ঝাড়-ফুঁক করাতাম এবং তার মাধ্যমেই আমি সুস্থ হয়েছি। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? এ কথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বললেন, এটা একটা শয়তানী আমল যা ঐ ব্যক্তি তার নিজের হাতে করত। যখন মন্তরপড়া শেষ হত তখন শয়তান দূর হয়ে যেত। এ ক্ষেত্রে তোমাদের জন্যে ঐ শব্দগুলিই পাঠ করা যথেষ্ট ছিল যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তাহল–

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ ـ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ـ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ ـ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا ـ

"হে মানুষের প্রতিপালক! কষ্ট দূর করে দিন। হে রোগ আরোগ্যকারী! শেফা দান করুন। আপনি ব্যতীত আর কেউ আরোগ্যদানকারী নাই। আপনার শেফা এমন যার পর আর কোন রোগ বাকী থাকে না।"

প্লেগ আক্রান্ত এলাকা

হযরত ওসমান (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ করেছেনঃ

اَلطَّاعُونُ رِجْزٌ اَوْ عَذَابٌ اُرْسِلَ عَلٰى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اَوْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَاِذَا سَمِعْتُمْ بِهٖ بِاَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوْا مِنْهَا فِرَارًا مِّنْهُ ـ

"প্লেগ এক প্রকার নিকৃষ্ট কষ্টদায়ক রোগ বা আযাব যা বনী ইসরাইল অথবা তোমাদের পূর্ববর্তী কোন সম্প্রদায়ের উপর পাঠান হয়েছিল। যখন জানতে পারবে যে, ওমুক জায়গায় প্লেগ রোগ ছড়িয়ে গেছে তবে সেখানে যাবে না। আর তোমরা যেখানে আছ সেখানে যদি প্লেগ এসে থাকে তবে ঐ স্থান থেকে পলায়ন করে যাবে না।" –বুখারী ও মুসলিম

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্লেগকে এক প্রকার জঘন্য রোগ বা আযাব বলে ব্যাখ্যা করে সকল প্রকার সন্দেহ নিরসন করে দিয়েছেন। কতইনা জ্ঞানগর্ভ ইরশাদ যে, যেখানে এহেন কষ্টদায়ক রোগটি ছড়িয়ে আছে সেখানে নিজে গিয়ে "আ-বয়েল আমারে খা" প্রবাদ বাক্যটির মত নিজ হাতে রোগকে দাওয়াত দিও না। আর যদি তোমাদের নিজ এলাকায় এ রোগটি ছড়িয়ে পড়ে থাকে তবে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে উক্ত সংক্রামক ব্যাধিকে অন্য এলাকায় নিয়ে যেও না। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের ব্যাধি থেকে নিজে দূরে থাক এবং জেনে শুনে নিজেকে নিজে ধ্বংসের মধ্যে ফেল না। তবে যদি নিজে এ ব্যাধি থেকে বাঁচতে না পার তবে কমপক্ষে অপরকে বাঁচাতে চেষ্টা কর। কেননা যেভাবে ব্যাধি থেকে নিজেকে নিজে রক্ষা করা প্রয়োজন তদ্রূপ অন্যকে রক্ষা করাও প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। অতএব, এটা কিভাবে সম্ভব যে, কোন মুসলমান নিজের কারণে অন্যকে বিপদে ফেলবে।

প্লেগ খোদায়ী বিধান

আমি খোলাফায়ে রাশেদার স্বর্ণযুগ হতে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা সহীহ বুখারী শরীফ হতে বর্ণনা করছি। একদা হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) শাম দেশের দিকে যাওয়ার প্রাক্কালে "সুরাগ" নামক স্থানে পৌঁছে জানতে পারলেন ওখানে (শামদেশে) প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি সেখানেই যাত্রা বিরতি করে জরুরী পরামর্শ সভা আহবান করলেন।

সর্বপ্রথম নিয়মানুয়ী সর্বাগ্রে হিজরতকারীদেরকে পরামর্শের জন্যে ডাকলেন। তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেওয়ায় প্রথম সারির আনসারদেরকে ডাকলেন। তাঁরাও একমত হতে পারলেন না। অতঃপর তিনি মক্কা বিজয়কালীন সময়ের সুপ্রসিদ্ধ কোরাইশদেরকে ডাকলেন, তারা সকলেই একমত হয়ে সৈন্য বাহিনী ফিরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিলে তিনি এ রায় অনুযায়ী মুসলিম সৈন্যদেরকে ফিরে যাওয়ার ঘোষণা দিলেন। এ সময় হযরত আবূ উবাইদাহ ইবনে জাররাহ্ (রাযিঃ) বললেন, আপনারা কি আল্লাহ তা'আলার তকদীর থেকে ভেগে যেতে চান। প্রত্যুত্তুরে হযরত ওমর (রাযিঃ) বললেন–

نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدْرِ اللّٰهِ اِلٰى قَدْرِ اللّٰهِ۔

"হ্যাঁ, আমরা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত তকদীর থেকে ভেগে আল্লাহর তা'আলার (অন্য) তকদীরের দিকে যেতে চাই।" অতঃপর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিঃ) হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস (যা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি) শুনালেন। তখন হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) এ কারণে শুকরিয়া আদায় করলেন যে, তার ফায়সালা নবী করীম (সাঃ)-এর মতানুযায়ী হয়েছে। সুতরাং প্লেগ যেমন খোদায়ী বিধান তেমনি এটা থেকে দূরে থাকা এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া চিকিৎসা, তদবীর করাও খোদায়ী বিধানের অংশ বিশেষ। মুর্খরা এ রোগটিকে একটা আযাব মনে করে থাকে এবং এর চিকিৎসাকে খোদায়ী বিধানের সঙ্গে যুদ্ধের শামিল মনে করে।

প্লেগ রোগ এবং শাহাদাত

কোন কোন ধর্মের লোকেরা ব্যাধিকে আযাব এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ মনে করে। আমাদের মতে ব্যাধি একটা পরীক্ষা এবং যারা এ পরীক্ষায় সফলকাম হন ব্যাধি তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির একটা অছিলা হয়ে যায়। রোগে পতিত হলে মানুষ আল্লাহর অধিক নৈকট্য লাভ করে থাকে। কারণ মানুষ তখন আল্লাহর নিকট দুআ মাঙ্গতে থাকে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্লেগ রোগকে (যা মহামারী আকারে আসে এবং দূরারোগ্য ব্যাধি হিসাবে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়) মুসলমানদের শাহাদাত লাভের অছিলা বলে উল্লেখ করেছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

اَلطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

"প্লেগ প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে শাহাদাত লাভের একটি অছিলা।"

হাদীস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কিতাব মুয়াত্তা ইমাম মালেক এবং সুনানে আবূ দাউদে এ সম্পর্কে একটা দীর্ঘ হাদীস রয়েছে। যার মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ সম্পর্কে বলেছেন যে,

আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গকারী ছাড়াও শহীদ হওয়ার সাতটি উপায় রয়েছে তন্মধ্যে প্রথমটি হল–

اَلْمَطْعُونُ شَهِيدٌ

"প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ।"

শেষ মুহূর্তের দুআ

প্রতিটি জীবিত প্রাণীকে অবশ্যই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। যে এ পৃথিবীতে এসেছে তাকে একদিন না একদিন এ নশ্বর পৃথিবী থেকে শেষ গন্তব্যের দিকে নিশ্চিত পাড়ি জমাতে হবে। যিন্দিগীর এ শেষ মুহূর্তটি নিজের এবং অপরের সকলের জন্য বড় শক্ত পরীক্ষা। আর এ পরীক্ষার মুহূর্তটি খুবই তিক্ত। আপনারা হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন মরণ পথের যাত্রী কি অবস্থায় দীর্ঘ সফরে যাত্রা করে।

আল্লামা ইকবাল ঠিকই বলেছেন

نشان مرد مومن باتوگویم * چوٗمرگ آید تبسم برلب اوست

"আমি তোমাকে বলে দিব মর্দে মুমিনের চিহ্ন কি? "যখন তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন তার ঠোঁটে হাঁসি ফুটে উঠে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির আমলনামা কালো এবং নেকের পাল্লা খালি থাকে তাকে চরম হতাশা ও কষ্ট নিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করতে হয়। এ সময় শারীরিক কষ্ট পাওয়া একটা প্রকৃতির বিধান। তবে দুনিয়া ত্যাগ করার জন্য পূর্বে থেকেই তৈরী না হওয়ার যে অবস্থা তা আরো কঠিন।

দোজাহানের সর্দার আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরজগতের সফরের জন্য সফরের সামানা কিভাবে বাঁধতেন? তা হযরতের পবিত্রা স্ত্রী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর মুখে শুনুন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর অন্তিম মুহূর্তে এ কথা বলতে শুনেছি, (এ সময় তিনি আমার গায়ে টেক লাগিয়ে ছিলেন)।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى ـ

"হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহমত দান করুন, আর আমাকে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে মিলিয়ে দিন।" –বুখারী, মুসলিম

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরো বলেন, আমার নিকট পানি ভর্তি একটা পাত্র ছিল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মোবারক হাত পেয়ালার মধ্যে ডুবাচ্ছিলেন এবং স্বীয় মুখমন্ডলের উপর লাগাচ্ছিলেন। আর মুখে উচ্চারণ করছিলেনঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ

"হে আল্লাহ! আমাকে মৃত্যুর কঠোরতা থেকে সাহায্য করুন।"

–তিরমিযী শরীফ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমবেদনা প্রকাশক লিপি

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযিঃ) একজন সুপ্রসিদ্ধ আনসারী সাহাবী। তিনি মাদীনার সেই সত্তরজন সৌভাগ্যশালী সাহাবাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা হতে হিজরত করে মদীনায় আগমন করার দাওয়াত দেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়ায (রাযিঃ)কে ইয়ামন প্রদেশের কাজী নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্রের ইন্তিকালের পর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট সমবেদনামূলক যে পত্র পাঠিয়েছিলেন তা আমি নিম্নে উদ্ধৃত করছি। একটু লক্ষ্য করে দেখুন, তা কত অলংকারপুর্ণ, সমবেদনা প্রকাশক ও সান্ত্বনামূলক পত্র। সমবেদনা প্রকাশ ও সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এর চেয়ে উত্তম কোন শব্দ ও বাক্য সম্বলিত পত্র হতেই পারে না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু করছি। যিনি অত্যন্ত দয়াশীল এবং বড়ই মেহেরবান

سَلَامٌ عَلَيْكَ فَاِنِّىْ اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعْظَمَ اللّٰهُ لَكَ الْاَجْرَ وَاَلْهَمَكَ الصَّبْرَ وَرَزَقَنَا وَاِيَّاكَ الشُّكْرَ ـ فَاِنَّ اَنْفُسَنَا وَاَمْوَالَنَا وَاَهْلِيْنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَنِيْئَةً ـ وَعَوَارِيَةُ الْمُسْتَوْدَعَةِ نُمَتِّعُ بِهَا اِلٰى اَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ يَقْبِضُهَا لِوَقْتٍ مَّعْلُوْمٍ ـ ثُمَّ افْتَرَضَ عَلَيْنَا الشُّكْرَ اِذَا اَعْطٰى ـ وَالصَّبْرُ اِذَا ابْتَلٰى فَكَانَ ابْنُكَ مِنْ مَّوَاهِبِ الْاِلٰهِيَّةِ وَعَوَارِيَةِ الْمُسْتَوْدَعَةِ مَتَّعَكَ غِبْطَةً وَّسُرُوْرًا يَّقْبِضُهُ بِاَجْرٍ كَثِيْرٍ ـ اَلصَّلٰوةُ وَالرَّحْمَةُ وَالْهُدٰى اِنْ صَبَرْتَ فَاصْبِرْ ـ وَلَا يُحْبِطُ جَزَعُكَ اَجْرَكَ فَتَنْدَمَ ـ وَاعْلَمْ اِنَّ الْجَزَعَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَلَا يَدْفَعُ حُزْنًا مَا هُوَ نَازِلٌ ـ وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

"আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হতে মুয়ায ইবনে জাবল (রাঃ)-এর প্রতি। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। আম্মা বাদ, আল্লাহ্ তোমাকে বড় প্রতিদান (পুরস্কার) দান করুন এবং ধৈর্য্য ধরার তাওফীক দান করুন। আমাদেরকে এবং তোমাকে শুকরিয়া আদায়করনেওয়ালা করুন।

নিশ্চয়ই আমাদের জীবন, আমাদের সম্পদ এবং আমাদের সন্তান-সন্তুতি মহান আল্লাহর উত্তম দান এবং ধার গ্রহণ করা আমানত স্বরূপ। যার থেকে আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফায়াদা লুটছি এবং তিনি নির্ধারিত সময় আবার তা কব্জা করে নিচ্ছেন। তাই আমাদের উপর তাঁর দানের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব এবং তিনি যখন আমাদের পরীক্ষায় ফেলেন তখনও ধৈর্য্য ধারণ করা ওয়াজিব। তোমার পুত্র মহান আল্লাহর দান এবং তোমার নিকট ধার দেওয়া আমানত ছিল। আল্লাহ্ তাকে তোমার জন্য লোভনীয় এবং সুখ ও উল্লাসের কারণ বানিয়েছিলেন। তিনিই তাকে তোমার থেকে এক বড় প্রতিদানের বদলে নিয়ে নিয়েছেন। এখন তুমি যদি ধৈর্য্য ধর তবে রহমত বরকত ও হেদায়েত লাভ করবে। তোমার অধৈর্য যেন তোমার প্রতিদানকে নষ্ট করে তোমাকে লজ্জিত না করে।

আর খুব স্মরণ রেখ, অধৈর্য্যের মাধ্যমে কিছুই অর্জিত হয় না এবং আগত পেরেশানীও তাতে দূর হয় না।

ধৈর্য্য ধারণ কর। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই নেককার লোকদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।" —বুখারী শরীফ ও আবূ দাউদ শরীফ

নবী করীম (সাঃ) আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর প্রাপকের জন্য ধৈর্য্য ও শুকরিয়ার দুআ করলেন। উক্ত দুআর মধ্যে নিজেকেও শামিল করলেন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাদের জান-মাল হোক অথবা পরিবার-পরিজন হোক সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার দান। এগুলির মর্যাদা ধার লওয়া আমানত বৈ কিছুই নয়। এগুলি সবই আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপকারের জন্য দান করেছেন। সুতরাং উক্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা আমাদের উপর ওয়াজিব। তবে তিনি যখন স্বীয় আমানত ফিরিয়ে নিয়ে আমাদের পরীক্ষায় ফেলেন তখন আমাদের জন্য সবর করা একান্ত আবশ্যক।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও লিখেন যে, নিঃসন্দেহে তোমার প্রাণপ্রিয় পুত্র তোমার জন্য এক বড় নিয়ামত, গর্বের ধন ও মঙ্গলজনক

ছিল। একারণে সে আল্লাহর নিকট ফিরে যাওয়ায় তুমি সে পরিমাণই সওয়াব ও প্রতিদানের অধিকারী হবে। তবে অধৈর্য্য ও হা-হুতাশ, কান্নাকাটি করায় কিছুই অর্জিত হবে না, আর পেরেশানিও দূর হবে না। সুতরাং ধৈর্য্য ধারণ কর, আল্লাহ নেককার লোকদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।"

(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্রের সম্বোধনে বহুবচন ক্রিয়া ব্যবহার করে নিজেকেও এর মধ্যে শামিল করেছেন। এতে আপনত্ব ও মহব্বতের যে আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তা অন্য কোন ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

(২) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মাত্র, প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ধৈর্য ও শুকরিয়ার শিক্ষা দেন নাই বরং সর্বপ্রথমে মরহুমকে স্মরণ করেছেন ও তাঁর মঙ্গল কামনা করেছেন, যার একটা প্রতিক্রিয়া কুদরতীভাবেই শোকার্ত পিতার উপর পড়েছে।

(৩) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি অধৈর্যের নিন্দা না করে বরং খুবই হিকমতের সাথে এর হাকীকতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন– যা চলে গেছে ধৈর্য্যহারা হলেও তা আর ফিরে আসবে না এবং মৃত্যু শোকও হালকা না হয়ে বরং বাড়তে থাকবে। অন্য দিকে ধৈর্য ধারণ করায় নেকী আছে, তাই অধৈর্য হয়ে নেকী নষ্ট করবে কেন?

অধ্যায় ঃ ৩

চিকিৎসা এবং সংযম

চিকিৎসা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বিপরীত ধর্মী খেয়াল দেখা যায়। কিছু সংখ্যক লোক রোগ নিরাময়কে শুধু মাত্র ঔষধপত্র ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করে। আর কিছু লোক আছে যারা কোন কোন সময় কিছু কিছু রোগের ক্ষেত্রে ঔষধপত্রকে অনর্থক মনে করে। বরং সেক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁক ইত্যাদিকে উপকারী ও যথেষ্ট মনে করে থাকে। কিছু লোক এমনও আছে যারা ঔষধপত্রকে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী মনে করে। তবে এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই কম।

ঔষধপত্র ও চিকিৎসা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কি? আল্লাহ তা'আলার শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্পর্কে কি শিক্ষা দিয়েছেন? ঔষধপত্র ও চিকিৎসা থেকে বিরত থাকা এবং ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা সম্পর্কে তিনি কি ইরশাদ করেছেন? এ সকল প্রশ্নের জবাবের জন্য এ অধ্যায়ের হাদীসগুলি লক্ষ্য করুন।

চিকিৎসা সম্পর্কিত দর্শন

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একদা হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রশ্ন করলেন–

فَقَالَ يَا رَبِّ مِمَّنِ الدَّاءُ

"হে আমার প্রতিপালক! রোগ কার পক্ষ হতে?" মহান রাব্বুল আলামীন বললেন, "আমার পক্ষ হতে। আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, مِمَّنِ الدَّوَاءُ অর্থাৎ ঔষধ কার পক্ষ হতে? জবাব এল, ঔষধও আমার পক্ষ হতে।

উক্ত প্রশ্ন সমূহের পর হযরত ইবরাহীম (আঃ) আবার জিজ্ঞাসা করলেন, يَا رَبِّ فَمَا بَالُ الطَّبِيْبِ চিকিৎসকের প্রয়োজন কি? আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিলেন, চিকিৎসকের মাধ্যমে ঔষধ পাঠান হয়।

আলোচিত সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের বর্ণনাকারী হলেন স্বয়ং আকায়ে নামদার হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর প্রশ্নকারী হলেন,

মহান রবের সুবিখ্যাত নবী হযরত ইবরাহীম খলীল (আঃ) এবং উত্তর দানকারী হলেন বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। উপরোক্ত তিনটি প্রশ্ন ও জবাবের মধ্যে রোগ, নিরাময়, চিকিৎসা ও ঔষধ পত্র ইত্যাদির পরিপূর্ণ দর্শন এসে গেছে।

রোগ যেমন আল্লাহর পক্ষ হতে আসে তেমনি নিরাময়ের ঔষধও সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক মহান আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন।

বাকী চিকিৎসক!! তাদেরকে তো ঔষধ আল্লাহই চিনিয়ে দেন।

আমাদের বুযুর্গগণ তাদের নিজ নিজ ব্যবস্থা পত্রের উপর هُوَ الشَّافِى (হুয়াশ শাফী) অর্থাৎ আল্লাহই আরোগ্য দানকারী এজন্যে লিখতেন, যাতে করে ডাক্তার এবং রোগী উভয়েরই স্মরণ থাকে যে আল্লাহ তা'আলাই আরোগ্য দানকারী। চিকিৎসক এবং ঔষধ আরোগ্যের অছিলা মাত্র। তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা) এবং চিকিৎসা সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) নবুওয়াতী যুগের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন। আমি তার বর্ণিত হাদীসের তরজমা নকল করছি।

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইজন চিকিৎসককে ডেকে পাঠালেন, খুব সম্ভব এরা দীর্ঘকাল মদীনায় অবস্থানরত ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক রোগীকে চিকিৎসা করার জন্য তাদের নির্দেশ দিলে চিকিৎসকদ্বয় বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জাহেলিয়াতের যুগে আমরা চিকিৎসা ও হিলা-বাহনা সবই করতাম, তবে ইসলাম ধর্মে এসে একমাত্র (আল্লাহর উপর) তাওয়াক্কুলই করে চলছি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

عَالِجَاهُ فَاِنَّ الَّذِىْ اَنْزَلَ الدَّاءَ اَنْزَلَ الدَّوَاءَ ثُمَّ جَعَلَ فِيْهِ شِفَاءً ـ فَقَالَ فَعَالَجَاهُ فَبَرَأَ

তোমরা তার চিকিৎসা কর। যে মহা প্রভু রোগ পাঠিয়েছেন তিনি ঔষধও প্রেরণ করেছেন এবং তার মধ্যে নিরাময়ও রেখেছেন। হাদীসের রাবী বর্ণনা করেন যে, চিকিৎসকদ্বয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইরশাদ অনুযায়ী চিকিৎসা করায় রোগী আরোগ্য লাভ করে। –যাদুল মাআদ

উক্ত হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় চিকিৎসা কখনও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট যখন এক সাহাবী

আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি ঔষধ পত্র (চিকিৎসা) গ্রহণ করব? চিকিৎসক কি খোদার বিধান রোগ ফিরাতে পারে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

اِنَّهٗ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ

"চিকিৎসাও খোদায়ী বিধান।" – মুসতাদরাকে হাকেম

ঔষধ এবং ভাগ্য

ঔষধপত্র ও চিকিৎসা সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্ন উঠে, ঔষধ কি খোদায়ী বিধান পরিবর্তন করতে পারে? রোগ-ব্যাধি যদি ভাগ্যের লিখন খোদায়ী বিধান হয়ে থাকে তবে চিকিৎসা করায় কি ফায়দা? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ প্রশ্নগুলি হয়েছিল। নিম্নে আমি উক্ত প্রশ্নোত্তর বর্ণনা করছি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচতোভাই, নওজোয়ান সাহাবী এবং অতুলনীয় জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাকদীরের মোকাবিলায় ঔষধ কি কোন কাজে আসতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ

اَلدَّوَاءُ مِنَ الْقَدَرِ وَهُوَ يَنْفَعُ مَنْ يَّشَاءُ بِمَا يَشَاءُ

ঔষধপত্রও খোদায়ী তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত, তিনি যাকে চান এবং যে ভাবে চান তার উপকার হয়।" –জামে সগীর

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সংক্ষিপ্ত জবাবে কত বড় সমস্যাকে এ কথা বলে মীমাংসা করে দিলেন যে, তোমরা তাকদীরের অর্থই ভুল বুঝেছ। যদি রোগ খোদার বিধান হয়ে থাকে তবে চিকিৎসাও খোদার বিধান। আর যদি কষ্টভোগ ভাগ্যের লিখন হয়ে থাকে তবে রোগ নিরাময়ও ভাগ্য লিপির অংশ হবে, সুতরাং কোন অবস্থায়ই নিরাশ হওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

আমাদের এ বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন ব্যক্তিরই তার ভাল হোক কি মন্দ হোক কোন প্রকার তাকদীরের ইলম (জ্ঞান) নাই। এ কারণে চেষ্টা এবং ইচ্ছা ভাল হওয়ারই করা চাই।

চিকিৎসা আল্লাহর হুকুম

সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَاِذَا اُصِيْبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِاِذْنِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ-

"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে সুতরাং যখন রোগ অনুযায়ী ঔষধ গ্রহণ করা হয় তখন আল্লাহর হুকুমে রোগী আরোগ্য লাভ করে।" – যাদুল মাআদঃ খন্ডঃ ২

কোন রোগই দুরারোগ্য নয়। প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ রয়েছে। তবে প্রথম শর্ত হল সঠিক রোগ নিরূপণ। অধিকাংশ চিকিৎসকগণ তো প্রথম পরীক্ষায়ই ব্যর্থ হয়ে যায়, কারণ রোগ হয় এক ধরনের আর তারা ব্যবস্থা অন্য কিছু করে বসে থাকে। অনেকে ক্ষেত্রে স্বয়ং রোগীই তার ব্যথার স্থানটি চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়। চিকিৎসা হবে কিরূপে?

সঠিক রোগ নির্ণয়ের পর দ্বিতীয় ধাপ হল রোগ অনুযায়ী সঠিক ঔষধ নির্বাচন। একই ধরনের রোগে ক্ষেত্র বিশেষে ঔষধ ভিন্ন হয়ে থাকে। মোটকথা ব্যক্তি ভেদে চিকিৎসা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। একই ঔষধ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে প্রযোজ্য নয়।

মানবীয় স্বভাব–প্রকৃতির মহা মনস্তত্ত্ববিদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, প্রত্যেক রোগের ঔষধতো রয়েছে তবে রোগ এবং রোগী অনুযায়ী ঔষধ নির্বাচন আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতেই কেবল সম্ভব; আর ঔষধ কার্যকারী হওয়াও তাঁর হুকুমের উপর নির্ভরশীল। পরিপূর্ণ আরোগ্য দানকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। এ রহস্য বুঝার জন্যে ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি লক্ষ্য করুন।

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন মাথায় ব্যথা দেখা দিত তখন তিনি মেহদী লাগাতেন এবং বলতেন ঃ এটা আল্লাহ তা'আলার হুকুমে উপকারী হবে।"

কোন রোগই দূরারোগ্য নয়

এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য আমি পূর্ববর্তী হাদীসটির পুনরাবৃত্তি করছি।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرِئَ بِإِذْنِ اللّٰهِ ـ

"প্রতিটি রোগের ঔষধ রয়েছে, যখন রোগ অনুযায়ী ঔষধ মিলে যায় তখন রোগ আল্লাহ্র ইচ্ছায় ভাল হয়ে যায়।" – মুসলিম শরীফ

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ دَاءٍ اِلاَّ اَنْزَلَ لَهٗ شِفَاءً ـ

"আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নাই যার জন্যে তিনি প্রতিষেধক পাঠান নাই।" –বুখারী মুসলিম

উক্ত হাদীসে তিনটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে–

(১) রোগ আল্লাহ্র পক্ষ হতে আসে। তাই এর নিন্দা করা উচিত নয়। রোগ আমাদের পরীক্ষা ও যাচাইয়ের জন্য অথবা উচ্চ মর্যাদাশীল করার জন্য এসে থাকে।

(২) কোন রোগই দূরারোগ্য নয়। একচ্ছত্র শেফাদানকারী মহান আল্লাহ্ প্রতিটি রোগের সঙ্গে প্রতিষেধক সৃষ্টি করেছেন। তাই কোন অবস্থায়ই চিকিৎসা বা ঔষধ পত্র বর্জন করা উচিত নয় এবং কোন ভাবেই আরোগ্য থেকে নিরাশ হওয়া জায়েয নয়।

(৩) প্রতিটি রোগের ঔষধ নির্দিষ্ট। তাই কোন ঔষধে কাজ না হতে থাকলে মনে করতে হবে রোগের সঠিক ঔষধ ব্যবহার হচ্ছে না। তখন একচ্ছত্র শেফাদানকারী আল্লাহ্র নিকট সঠিক ঔষধের জন্য তাওফীক চাবে এবং শেফার আশা করবে।

শুধু মাত্র একটি রোগই দূরারোগ্য

হযরত উসামা ইবনে শরীক (রাযি) থেকে হযরত যিয়াদ ইবনে আলাকা (রাযি) বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন কয়েকজন বেদুঈন লোক সেখানে আসে এবং প্রশ্ন করে যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা চিকিৎসা গ্রহণ না করলে কি আমাদের কোন গোনাহ্ হবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

نَعَمْ يَا عِبَادَ اللّٰهِ! تَدَاوَوْا .... (اِلٰى آخره)

"হে আল্লাহর বান্দাগণ তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তা'আলা একটা ব্যাধি ব্যতীত এমন কোন ব্যাধি সৃষ্টি করেন নাই যার প্রতিষেধক সৃষ্টি করেন নাই

এবং যা দুরারোগ্য। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেটা কোন ব্যাধি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, اَلْهَرَمُ সেটা হল বার্ধক্য। – সূনানে আবূ দাউদ,তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, হাকেম

উক্ত হাদীসে পাকের মাধ্যমে আমাদের সম্মুখে তিনটি রহস্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে –

(১) বার্ধক্য ব্যতীত প্রত্যেক রোগেরই উপযুক্ত চিকিৎসা রয়েছে। কোন রোগের ক্ষেত্রেই নিরাশ হওয়া জায়েয নাই।

(২) ঔষধ-পত্র ব্যবহার ও চিকিৎসা গ্রহণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। আর তা বর্জন করা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নতের সুস্পষ্ট লংঘন।

(৩) বৃদ্ধাবস্থায় যৌবন প্রাপ্তির স্বপ্ন দেখা নিরর্থক। এটা এমন জিনিস নয় যা চাইলেই এসে যাবে। তাই এ সময়ে প্রশান্ত চিত্তে বার্ধক্য গ্রহণ করে নেওয়া উচিত।

گفت پیغمبر که یزدان مجید * ازپئے ہر درد درمای آفرید

অর্থাৎ "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ পাক প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধক সৃষ্টি করেছেন।"

চিকিৎসা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত

হাফেয ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "যাদুল মাআদ"-এ হযরত বিলাল ইবনে সাইয়্যাফ (রাযিঃ) এর নিম্নোক্ত বানী বর্ণনা করেছেন–

قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى مَرِيْضٍ يَعُوْدُهُ فَقَالَ اَرْسِلُوْا اِلٰى طَبِيْبٍ فَقَالَ قَائِلٌ وَاَنْتَ تَقُوْلُ ذٰلِكَ؟ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ نَعَمْ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً اِلاَّ اَنْزَلَ لَهٗ دَوَاءً ـ

"তিনি বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম (সাঃ) জনৈক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখার জন্যে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তিনি রোগীর নিকট উপস্থিত ব্যক্তিদের বললেন ডাক্তার ডেকে আন। এ কথা শুনে উপস্থিত লোকদের একজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও এরূপ বলছেন? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,হ্যাঁ, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নাই যার ঔষধ পাঠান নাই।"

"মুয়াত্তা ইমাম মালেক" কিতাবখানি হাদীসের প্রাচীনতম সংকলন গ্রন্থ। এই হাদীস গ্রন্থখানা মদীনার ইমাম হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) সংকলন করেছেন। এই সংকলনের উক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের নিকট যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর ঔষধ পত্র ব্যবহারের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন। এতে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। প্রথমতঃ চিকিৎসা করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় বরং এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ রোগমুক্তি ঔষধের নিজস্ব গুণ বা ক্ষমতা নয় বরং আল্লাহ তা'আলাই এতে রোগ মুক্তির বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে দেওয়াতে রোগ মুক্তি হয়। ঔষধ রোগ মুক্তির কারণ ও অছিলা তখনই হয় যখন আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। যদি তিনি ইচ্ছা না করেন কোন ঔষধই কার্যকরী হয় না। এমন কি চিকিৎসক সঠিক ঔষধ নির্বাচনই করতে পারে না। যেমন কোন এক বুযুর্গ বলেছেন ঃ

চوں قضا آید طبیب ابله شود

"যখন মানুষের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তখন অভিজ্ঞ ডাক্তার পর্যন্ত বোকা বনে যায়।"

হাতুড়ে ডাক্তার

তিব্বে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ অধ্যায়ে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন হাদীস বর্ণনা করছি যা স্বীয় গুরুত্ব ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ طَبَّبَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ الطِّبُّ قَبْلَ ذٰلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ ـ

"যদি এমন কোন ব্যক্তি চিকিৎসা করে যার চিকিৎসা বিষয়ে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নাই, এমতাবস্থায় (যদি রোগীর কোন ক্ষতি হয়) রোগীর সমস্ত দায় দায়িত্ব উক্ত চিকিৎসকের উপর বর্তাবে।"

–আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেকুতনী, মুসতাদরাক

ঐ সকল চিকিৎসকগণের বিশেষভাবে এ হাদীসের মর্ম কি তা ভেবে দেখা উচিত যারা চিকিৎসা বিষয়ে অনভিজ্ঞ হয়েও মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবন নিয়ে খেলা করে। তারা শুধু মাত্র আইনের দৃষ্টিতেই দোষী নয় বরং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষানীতি অনুযায়ীও তাদেরকে মহান আল্লাহর সামনে জবাবদেহী করতে হবে।

সনদবিহীন হাতুড়ে চিকিৎসক ছাড়াও সার্টিফিকেটধারী চিকিৎসকগণেরও (চাই সে হেকিম, কবিরাজ অথবা হোমিওপ্যাথিক বা এলোপ্যাথিক ডাক্তার হোক) এ বাস্তবতাকে ভুলে গেলে চলবে না যে, সর্ব অবস্থায়ই সে একজন মানুষ। আর কোন মানুষই সকল ঔষধ ও প্রত্যেক রোগ সম্পর্কে অভিজ্ঞ একথা দাবী করতে পারে না। সুতরাং যখন সে কোন রোগ নির্ণয়ে অক্ষম অথবা সঠিক ঔষধ নির্বাচন করতে না পারে তখন শুধু অনুমান এবং কিয়াস করে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত নয়। আর যদি তার জ্ঞাতসারে ভুল চিকিৎসায় রোগীর কোন সমস্যা দেখা দেয় তবে সে আল্লাহ এবং মানবজাতি উভয়ের সামনে জবাবদিহির জিম্মাদার হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস জানার পর হাতুড়ে চিকিৎসকদের আল্লাহর নিকট তওবা করে মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করার পেশা ত্যাগ করা উচিত।

হারাম জিনিসের মধ্যে রোগ মুক্তি নাই

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ ۔

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রোগ এবং দাওয়া (ঔষধ) দুটিই পাঠিয়েছেন এবং প্রতিটি রোগেরই ঔষধ প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর। তবে হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করো না।" – মিশকাত, সুনানে আবূ দাউদ

হারামের অর্থ হল ঐ জিনিস যা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে সকল জিনিস ব্যবহার করতে শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে তা হারাম। বিষয়টি খুবই সুস্পষ্ট যে, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা কোন জিনিসকে যখন ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন তখন আল্লাহর কোন অনুগত বান্দার জন্য তা ঔষধ হিসাবে এবং চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা কিরূপে বৈধ হতে পারে? যেখানে সর্বোতভাবেই তা ব্যবহার নিষেধ সেক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থায় তা ব্যবহার করা কিরূপে জায়েয হবে?

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযি) যিনি নওজোয়ান সাহাবীদের একজন এবং সকল জ্ঞানীগণ যার ইলমী শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন, তাঁর থেকে বর্ণিত ঃ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ كُمْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ঐ জিনিসের মধ্যে তোমাদের আরোগ্য রাখেন নাই যা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে।" – যাদুল মাআদ, মুসতাদরাক

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোল্লেখিত ইরশাদ দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হারাম বস্তুর মধ্যে আরোগ্য দানের কোন ক্ষমতা নাই এবং এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, হারাম কোন কিছুকে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা নিষেধ।

নাপাক ঔষধ ব্যবহার করার নিষিদ্ধতা

নিম্নোক্ত হাদীসের রাবী হযরত আবূ হুরাইরা (রাযি) এবং হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী,ইবনে মাজাহ এবং মিশকাতুল মাসাবীহ-এর মত কিতাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ -

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাযি) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবীস বা নাপাক ঔষধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।"

খবীস বা খারাপ কাকে বলে? এর বিশদ বর্ণনা ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (রহঃ)-এর কিতাব "মুফরাদাতুল কুরআন" এ দেখুন।

তিনি লিখেছেনঃ

"ঐ সকল জিনিস যা বাজে, ক্ষতিকর এবং নষ্ট হওয়ার কারণে খারাপ মনে হয় এবং ঐ সকল জিনিস যা অকেজো, যেমন লোহার ময়লা। মিথ্যা এবং অপছন্দনীয় কার্যকলাপও খবীসের অন্তর্ভুক্ত।"

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ -

"তাদের উপর অপবিত্র জিনিস হারাম করা হয়েছে।" (৭ পাঃ ১৫৭ পৃঃ)।

পবিত্র কুরআনের সূরা নিসায় "তাইয়্যেব"-এর বিপরীত "খবীস" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।" (৪ পাঃ ২পৃঃ)

মোটকথা খবীসের অর্থ হল, বাজে ক্ষতিকর, নষ্ট, খারাপ, অপছন্দনীয় এবং অপবিত্র। যাকে পবিত্র কালামে হারাম পর্যন্ত বলা হয়েছে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক কোন কিছু ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করতে

নিষেধ করেছেন। কারণ এটা সূচীবোধ, পবিত্রতা, এবং মানবীয় মর্যাদার পরিপন্থী। তবে অপারগতা বা মজবুরী থাকলে ভিন্ন কথা। কেননা মানুষ যখন একেবারেই নিরূপায় হয়ে যায় এবং তার জন্য অন্য কোন পথই খোলা না থাকে, এমতাবস্থায় জীবন বাঁচাবার জন্য শরীয়ত জীবন রক্ষা পরিমাণ যে কোন খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। নতুবা সকল নাপাক জিনিসই নিষিদ্ধ।

ঔষধ হিসাবে মদ

ঔষধ হিসাবে শরাব ব্যবহার সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ লক্ষ্যণীয়। সাধারণভাবে আমি প্রতিটি বিষয়বস্তুর উপর এক একটি হাদীস বর্ণনা করে ক্ষান্ত করেছি। কিন্তু এ বিষয়ের উপর আমি কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করছি, যাতে কোন দলীল বাকী না থাকে।

١- عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُسْكِرٍ وَ مُفْتِرٍ -

১. "হযরত উম্মে সালামা (রাযি) থেকে বর্ণিতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেশাযুক্ত এবং মস্তিষ্কে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী কোন কিছু ব্যবহার থেকে নিষেধ করেছেন।" –আবূ দাউদ, মিশকাত,

এটা হল সাধারণ ব্যবহার সম্পর্কিত হুকুম। এখন ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করার বিশেষ হুকুম কি তা লক্ষ্য করুন।

হযরত ওয়াইল ইবনে হাযরামী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ঃ

٢-اِنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ رض سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ - فَنَهَاهُ - فَقَالَ اِنَّمَا اَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ قَالَ اِنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ بِدَوَاءٍ لٰكِنَّهُ دَاءٌ -

২. "তারেক ইবনে সুয়াইদ (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শরাব ব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন করলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, আমিতো এটা ঔষধ হিসাবে তৈরী করেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শরাব ঔষদ নয়। বরং এটা নিজেই রোগের কারণ।

–মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ঔষধ হিসাবেই মদ ব্যবহার করতে নিষেধ করেন নাই বরং একথাও বলেছেন ঃ

٣- وَ يُذْكَرُ عَنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ قَالَ مَنْ تَدَاوٰى بِالْخَمْرِ فَلاَ شِفَاهُ اللّٰهُ

৩. "যে ব্যক্তি শরাবের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে আরোগ্য না করুন।"– ইবনে মাজাহ, যাদুল মাআদ

নেশাযুক্ত পানীয়

١- عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِّنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ-

১. "হযরত উমর (রাযি) বর্ণনা করেন, শরাব হারাম হওয়ার হুকুম নাযিল হয়। আর এটা পাঁচটি জিনিসের দ্বারা তৈরী হত অর্থাৎ আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম এবং জব থেকে এবং শরাব এমন জিনিস যদ্বারা আকল-বুদ্ধি ও জ্ঞান বিগড়ে যায়।" –বুখারী, মুসলিম

٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ-

২. "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রতিটি নেশাযুক্ত জিনিসই শরাব এবং প্রতিটি নেশাযুক্ত জিনিসই হারাম। মুসলিম শরীফ

٣- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ-

৩. হযরত জাবের (রাযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার অধিক পরিমাণে নেশা আনে তার অল্প পরিমাণও হারাম।

আরবী পরিভাষায় যে কোন পানীয় জিনিসকেই "শরাব" বলা হয়। তবে আমাদের পরিভাষায় "শরাব' শব্দটি নেশাকর বা উত্তেজক পানীয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আরবীতে যাকে "খমর" বলা হয় এর সর্ব প্রকারই হারাম।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত ইরশাদ দ্বারা এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র "শরাব" ই হারাম নয় বরং সর্বপ্রকার নেশাদার (মাদক) দ্রব্যও হারাম। তা পরিমাণে অধিক হোক অথবা অল্প হোক।

মোটকথা, সর্বাবস্থায় মদের সর্বপ্রকার এবং যে কোন পরিমাণ হারাম। এগুলি ব্যবহার করায় শুধু ক্ষতিই ক্ষতি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোল্লিখিত ইরশাদাবলীর ভিত্তিতে মুসলিম চিকিৎসকগণের উপর সর্বপ্রথম যে দায়িত্বটি অর্পিত হয়, তা হল, তারা তাদের রোগীকে এমন কোন ঔষধ ব্যবহার করাবে না–যা হারাম, ক্ষতিকর বা নেশাকর। তবে যদি এ ধরনের ঔষধের বিকল্প কিছু না মিলে অথবা জীবন রক্ষার জন্য আর কোন উপায় না থাকে তবে ভিন্ন কথা।

দ্বিতীয় দায়িত্ব স্বয়ং মুসলমান রোগীর উপর এই বর্তায় যে, তারা এমন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবে না যারা হালাল, হারাম এবং পাক নাপাকীর কোন ধার ধারে না। তাছাড়া নিজ ইচ্ছায় বা পছন্দানুযায়ী কখনও এমন কোন ঔষধ গ্রহণ করবে না যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। অবশ্য উপায় না থাকা এবং জীবন বাঁচাবার জন্য এরূপ করার মাসআলা ভিন্ন।

এ হাকীকতটি ভুলে গেলে চলবে না যে, মানুষ তো মানুষ, সাহাবায়ে কেরামগণ রোগাক্রান্ত পশুকে পর্যন্ত শরাব ব্যবহারের অনুমতি দেন নাই। হযরত নাফে (রাযি) বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি) এর এক গোলাম তাঁর একটি উটকে ঔষধ হিসাবে শরাব পান করালে হযরত উমর (রাযি) তাকে খুব ধমক দিয়েছিলেন। হাদীসের সংকলক আবদুর রাজ্জাকের মতে শুধু এটা নয় বরং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগন শরাবের তলানীও কোন জানোয়ারের দেহে মালিশ করা সহ্য করেন নাই।

নবী করীমসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মলম ও পট্টি

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবত প্রাপ্ত পুরুষরাই নন বরং মহিলাগণও স্বাস্থ্যরক্ষা এবং সফল চিকিৎসা আঞ্জাম দেওয়ার ব্যাপারে পরিপূর্ণ যোগ্যতা রাখতেন। সাহাবায়ে কেরামগণ যুদ্ধক্ষেত্রে যখন বীরত্বের পরিচয় দিতেন তখন মহিলা সাহাবীগণ প্রাথমিক চিকিৎসার দায়িত্ব পালন করতেন। জিহাদের সময় গাজীদেরকে পানি পান করান ছাড়াও তাঁরা আহতদের ক্ষত স্থানে মলম ও পট্টি লাগাতেন। এ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা লক্ষ্য করুন।

(১) হযরত আনাস (রাযি) বর্ণনা করেন যে, ওহুদের যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে যখন লোকজন সরে গিয়েছিল তখন আমি দেখলাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি) এবং উম্মে সুলাইম উভয়েই

পাজামার পা উপরে উঠিয়ে পানির মশক পিঠে বহন করে তৃষ্ণার্তদের পানি পান করাচ্ছেন। পানি শেষ হয়ে গেল ফিরে যেতেন, আবার মশক ভর্তি করে নিয়ে এসে পিপাসিত গাজীদের মুখে ঢেলে দিতেন।

(২) হযরত রবী বিনতে মুআওয়ায (রাযি) বর্ণনা করেন ঃ

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحٰى وَنَرُدُّ الْقَتْلٰى إِلَى الْمَدِيْنَةِ ـ

"আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদে অংশ গ্রহণে করে আহতদের পানি পান করাতাম এবং তাদের ক্ষতস্থানে মলম ও পট্টি লাগাতাম আর শহীদদের মদীনায় নিয়ে যেতাম।"

–বুখারী শরীফ কিতাবুল জিহাদ

(৩) ওহুদের যুদ্ধে দোজাহানের বাদশাহ রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জখমী হলে হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পট্টি বেঁধে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে হযরত আবূ হাযেম (রহঃ)-এর ভাষায় বিস্তারিত শুনুন ঃ

كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْسِلُهُ وَعَلِيٌّ يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيْدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً مِّنْ حَصِيْرٍ فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ ـ

"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেটী হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) ক্ষত স্থান ধুচ্ছিলেন এবং হযরত আলী (রাযি) পানি ঢালছিলেন। হযরত ফাতিমা (রাযিঃ) যখন দেখলেন যে, পানিতে রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। তখন তিনি খেজুর পাতার তৈরী মাদুরের একটা টুকরা জ্বালিয়ে এর ছাই ক্ষতস্থানে চেপে ধরলেন। এতে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।" –বুখারী শরীফ, কিতাবুল মাগাযী

সংযম ও তকদীর

عَنْ أَبِيْ خَزَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوٰى بِهِ وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللّٰهِ شَيْئًا فَقَالَ هِيَ مِنْ قَدْرِ اللّٰهِ

"হযরত আবূ খুযামা (রাযি) বর্ণনা করেন, আমি (একবার) আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যে সব ঝাড়ফুঁক করি এবং যে সকল ঔষধের দ্বারা

চিকিৎসা করি এবং যে সকল বিষয়ে আমরা সতর্কতা অবলম্বন করি এগুলো কি আল্লাহর নির্ধারিত তকদীরকে প্রতিহত করতে পারে? এ বিষয়ে আপনি কি বলেন? হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জওয়াব দিলেন, তোমরা যা কর স্বয়ং এগুলিও আল্লাহর নির্ধারিত তকদীরের অন্তর্ভুক্ত।"

–ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, হাকেম

হাদীস শরীফের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। নেকদিল সাহাবীর এটাই জিজ্ঞাস্য ছিল যে, আমরা যে ঝাড়ফুঁক ও ঔষধ পত্র ব্যবহার করি এবং বিভিন্ন বিষয়ে বাচ-বিচার করে ও সতর্কতা অবলম্বন করে চলি, এগুলি কি আল্লাহর লিখিত তকদীরকে বদলে দিতে পারে? যদি কারো তকদীরে রোগ লেখা থাকে বা রোগের কারণে তার মৃত্যু লেখা থাকে, তাহলে আমাদের অবলম্বন করা পন্থাগুলি কি তা টলাতে পারবে? প্রায়শঃ আমাদের মনেও এ ধরনের বিভিন্ন সন্দেহ ও সংশয় এসে থাকে। চিন্তা করে দেখুন এ প্রসঙ্গে হুযুর (সাঃ) কত হিকমতপূর্ণ জওয়াব দিয়েছেন যে, তোমাদের এই দম-দরূদ, ঝাড়ফুঁক ঔষধ পত্র ও সতর্কতা এগুলির আল্লাহর হুকুমেরই অন্তর্ভুক্ত। কে জানে যে, দয়াময় আল্লাহ তা'আলা এ গুলির মাধ্যমেই কারো আরোগ্য লেখে রেখেছেন।

এমতাবস্থায় আমাদের জন্য একান্ত জরুরী হল, প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার ওসিলা ও সতর্কতা অবলম্বন করা এবং এগুলিকে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী মনে না করা। কেননা, এই ওসিলাসমূহ অবলম্বন করাও আল্লাহর নির্দেশ এবং হুযুর পাক (সাঃ)-এর সুন্নত। কোন ক্রমেই এগুলি তাওয়া'ক্কুলের বিরোধী নয়।

চোখের অসুখে খেজুর থেকে সাবধানতা

"হযরত উম্মে মুনযির বিনতে কায়েস আনসারিয়্যা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়ীতে তশরীফ নিয়ে আসেন। তাঁর সঙ্গে হযরত আলী (রাযিঃ) ও ছিলেন। হযরত আলী সবেমাত্র অসুখ থেকে উঠেছিলেন।। আমাদের বাড়ীতে খেজুরের বাধা টানানো ছিল। বর্ণনাকারীণী বলেন, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে খেজুর খেতে আরম্ভ করেন। অতঃপর হযরত আলীও উঠে আসেন এবং খেজুর খেতে শুরু করেন। তখন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আলী! তুমি এখনো দুর্বল। তাই তুমি খেজুর খেয়ো না। একথা শুনে হযরত আলী (রাযিঃ) খেজুর খাওয়া বন্ধ করে দেন।"

–মিশকাত, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী শরীফ

এ প্রসঙ্গে হযরত সুহাইব (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতও পাঠ করুন।

তিনি বলেন ঃ

قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ خُبْزٌ وَ تَمْرٌ فَقَالَ اُدْنُ فَكُلْ فَأَخَذْتُ تَمْرًا فَأَكَلْتُ فَقَالَ أَتَاكُلُ تَمْرًا وَبِكَ رَمَدٌ ...... (الى آخر)

"আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হই। তাঁর সম্মুখে তখন রুটি ও খেজুর রাখা ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কাছে এসো, খেতে বস। আমি বসে খেজুর খেতে শুরু করি। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তোমার চোখে অসুখ আর তুমি এই অবস্থায় খেজুর খাবে? –যাদুল মাআদ

খেজুরের উপকারীতা সম্পর্কে আমরা অন্য এক অধ্যায়ে আলোচনা করেছি যে, খেজুর অত্যন্ত শক্তিশালী ও রক্ত বর্ধক। বিভিন্ন অসুখ বিসুখে ও বিশেষ ঔষধে খেজুর ব্যবহার করা হয়। এতদসত্ত্বেও এর তাছীর ও প্রতিক্রিয়া গরম। তাই অসময়ে এবং অধিক পরিমাণে খেজুর খাওয়া ক্ষতিকর হয়। বিশেষতঃ যখন চোখে ব্যথা ও জ্বালা পোড়া থাকে তখন খেজুর খাওয়া থেকে বেঁচে থাকা খুবই জরুরী।

ক্ষতিকর ঔষধ ব্যবহার না করা

عَنِ الْاَعْمَشِ سَمِعْتُ حَيَّانَ جَدَّ اِبْنِ اَبْحَرَ الْكَبِيْرِ يَقُوْلُ دَعِ الدَّوَاءَ مَا احْتَمَلَ جَسَدُكَ الدَّاءَ ـ

"হযরত আমাশ (রাযি) বলেন, আমি ইবনে আবাহরুল কবীরের পৌত্রের মাধ্যমে শুনেছি, তিনি বলেন, ঐ সকল ঔষধ বর্জন কর যা খেলে সুস্থ শরীর অসুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।" –মুজামুল কবীর

অসুস্থ ব্যক্তি কিসে আরাম পাবে, কিসে তার শক্তি অর্জিত হবে ও অসুস্থতা দূর হবে– ঔষধদাতা চিকিৎসকের এটাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর এ মহান উদ্দেশ্য নিয়েই মানুষ তিক্ত স্বাদহীন ঔষধ সেবন করে, ইনজেকশন নেয়, অপারেশনের কষ্ট সহ্য করে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি এমন কোন ঔষধ হয়, যা এক রোগে উপকারী কিন্তু তাতে অন্য কোন রোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তবে ঐ ঔষধ বর্জন কর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা এটাই যে, যদি কোন ঔষধ দ্বারা রোগ সৃষ্টি হওয়ার ভয় থাকে তবে তা ত্যাগ কর।

আমি বহুক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি যে, হাতুড়ে এবং অনভিজ্ঞ ডাক্তার অনেক সময় তাঁর রোগীদের এমন ঔষধ দিয়ে থাকে যা কোন একটি রোগকে তো দূর করে দেয় ঠিকই তবে অপর একটি রোগ সৃষ্টিরও কারণ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে সস্তা খ্যাতি, নাম যশের আকাংখী ও লোভী চিকিৎসকগণ জেনে বুঝেই এ ধরনের ভুল চিকিৎসা ত্যাগ করে না।

মূলতঃ এ সকল লোক মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে বেআইনীভাবে খেল-তামাশা করছে এবং আল্লাহর ভয়ে কম্পিত হচ্ছে না।

শিংগা লাগান

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحَجَمَ

"হযরত সামুরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের চিকিৎসা সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম চিকিৎসা হল শিংগা লাগান।"–মুসতাদরাক

"হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ নাঈম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত আবূ হুরাইরা (রাযি) বর্ণনা করেছেন যে, আমাকে আবূল কাসিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন যে, জিব্রাঈল (আঃ) তাঁকে এ সংবাদ দিয়েছেন ঃ

اِنَّ الْحَجَمَ اَفْضَلُ مَا تَدَاوٰى بِهِ النَّاسُ

"মানুষ যে সকল জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করে তন্মধ্যে উত্তম চিকিৎসা হচ্ছে শিংগা লাগান।" –মুসতাদরাক

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিংগা লাগানোর জন্য চন্দ্র মাসের সর্বাপেক্ষা উত্তম তারিখগুলি নির্ধারণ করে বলেছেন, চন্দ্র মাসের ১৭, ১৯ এবং ২১ তারিখে শিংগা লাগাবে। বুধবারকে শিংগা লাগানোর অনোপযোগী বলেছেন।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাগল, কুষ্ঠ রোগী এবং মৃগী রোগের জন্য শিংগা লাগানোকে চিকিৎসা হিসাবে নির্বাচন করেছেন।

অনুরূপভাবে হযরত ইবনে উমর (রাযি) থেকে বর্ণিত ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শিংগা লাগালে জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং স্মৃতি শক্তি প্রখর হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি) থেকে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শিংগা লাগানোর ফলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পিঠ হালকা হয়।

আমি এ সকল হাদীস মুসতাদরাকে হাকিমের চিকিৎসা অধ্যায় থেকে বর্ণনা করেছি।

চীন দেশে শিংগা লাগানোর এ পদ্ধতিটি আকুপেংচার নামে পরিচিত। এখনও আমেরিকার হাসপাতালে এ পদ্ধতির চিকিৎসা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। পাকিস্তানে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসার প্রচলন আছে।।

শিংগা লাগানোর স্থান

শিংগা লাগাবার উপকারিতা সম্পর্কে আপনারা পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ লক্ষ্য করেছেন। এ চিকিৎসা পদ্ধতিটি কিছু পরিবর্তিত হয়ে এবং চীনা পদ্ধতিতে আকুপেংচার চিকিৎসা নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

এ পর্যায়ে শিংগা লাগাবার স্থান সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস লক্ষ্য করুন।

১- عَنْ اَنَسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ فِى الْاَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ ـ

(১) "হযরত আনাস (রাযি) থেকে বর্ণিতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় কাঁধ এবং কাঁধের মাঝে (গ্রীবা বা ঘাড়ের উপর) শিংগা লাগিয়েছেন।" –বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

২- كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ ثَلَاثًا وَاحِدَةً عَلٰى كَاهِلِهٖ وَاثْنَتَيْنِ عَلَى الْاَخْدَعَيْنِ

(২) "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি শিংগা লাগিয়েছেন। একটি উভয় কাঁধের মাঝে (ঘাড়ের উপর) এবং বাকী দুইটি কাঁধের উপর।"

৩- اِنَّهٗ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فِىْ رَأْسِهٖ لِصِدَاعٍ كَانَ بِهٖ

(৩) "হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এহরাম অবস্থায় স্বীয় ব্যথার কারণে মাথা মুবারকে শিংগা লাগিয়েছেন।" –বুখারী, আবূ দাউদ, নাসায়ী

٤- اِحْتَجَمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلٰى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجْعِهٖ

(৪) "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এহরাম বাঁধা অবস্থায় পায়ের পিঠের (গোছার) উপর শিংগা লাগিয়েছেন।" ইবনে খুজাইমা, ইবনে হাববান

৫- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ فِى وَرَكِهٖ مِنْ وَثْئٍ كَانَ بِهٖ

"হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্লান্তি (বা অবসণ্নতার) কারণে স্বীয় রান মোবারকে শিংগা লাগিয়েছেন।"–আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ

আমাদের দেশের প্রাচীন অভিজ্ঞ ডাক্তারগণও এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন। তাদের মতে চিবুকের নীচে শিংগা লাগালে চেহারা, গলা এবং দাঁতের ব্যথা উপশম হয়। মাথা এবং হাতলিতে আরাম বোধ হয়।

পায়ের গোড়ালীতে শিংগা লাগানোর দ্বারা রান এবং পায়ের গোছার ব্যথা নিরাময় হয় এবং খোশ, পাচড়া জাতীয় চর্মরোগ ভাল হয়।

সীনার নীচে শিংগা লাগালে ফোঁড়া, পাচর, খুজলী, দুম্বল, চর্মরোগ, নুকরস, অর্শরোগ ও স্থূল বুদ্ধি দূর হয়।

দাগ দেওয়া একটা অপছন্দনীয় চিকিৎসা

আদি যুগে লোহা গরম করে দাগ দিয়ে অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা করা হতো। এখনও কোন কোন এলাকায় এ প্রথা প্রচলিত আছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাকে একেবারেই অপছন্দ করতেন।

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি) বর্ণনা করেনঃ

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَيِّ

"হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোহা দ্বারা দাগ লাগাতে নিষেধ করেছেন "–মুসতাদরাক

অপর এক সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ (রাযি) থেকে বর্ণিত আছে, একবার এক আনসারীর মারাত্মক অসুখ হলে তাকে দাগ লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পুনরায় অনুমতি চাওয়া হলেও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নিলেন, এভাবে তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে পাথর দিয়ে দাগ লাগিয়ে দাও।

এতদ্ব্যতীত এ সম্পর্কে আরও দু'তিনটি রেওয়ায়াত বিদ্যমান রয়েছে যার মাধ্যমে দাগ লাগানো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অপছন্দনীয় ছিল তাই সুস্পষ্ট হয়েছে।

হযরত মুগিরা ইবনে শুবা (রাযি) থেকে বর্ণিত ঃ

مَنْ : اِكْتَوٰى اَوِ اسْتَرْقٰى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ -

"যে ব্যক্তি দাগ লাগাল অথবা ঝাড়ফুঁক দ্বারা চিকিৎসা করল সে (যেন) আল্লাহর উপর ভরসা করা ছেড়ে দিল।" –তিরমিযী

মূলতঃ গরম লোহার দ্বারা দাগ লাগালে যে কষ্ট ও ব্যথা হয় এটা ছেড়ে দিলেও এর দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চেহারা ও আকৃতির যে পরিবর্তন হয়, এটাই এই পদ্ধতি ক্ষতিকর প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

অধ্যায় ঃ ৪

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিকিৎসা

খাতামুল মুরসালীন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ববাসীর জন্য শেফার এক মহাগ্রন্থ নিয়ে এসেছিলেন। খোদা প্রদত্ত এ সর্বশেষ গ্রন্থটি পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সর্বঅঞ্চলে বসবাসকারী প্রতি গোত্রের জন্যই সমভাবে শেফাদানকারী বলে প্রমাণিত। যখনই যে জাতি এ জীবনদানকারী মহাগ্রন্থটি রক্ষাকবচ বানিয়ে নিয়েছে তখনই সে জাতির নব জীবন লাভ হয়েছে।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের এমন কোন দিক নাই যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াত ও আযীমতের গন্ডি থেকে বাইরে থেকে গেছে। কারণ এটা কি করে সম্ভব যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যথাতুর পৃথিবীবাসীর শারীরিক রোগসমূহ থেকে তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখবেন। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূহানী রোগের সঙ্গে শারীরিক সমস্যারও সমাধান দিয়েছেন।

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিকিৎসক ছিলেন না। নবুওয়তের পদমর্যদার জন্য এটা জরুরীও নয়। কিন্তু আল্লাহর এই সর্বশ্রেষ্ঠ নবী চিকিৎসকদের জন্য একটি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনাও দিয়ে গেছেন। এই অধ্যায়ে তারই কিছু নমুনা প্রত্যক্ষ করুন।

ঔষধের সাথে দুআ

আধুনিক যুগে মানুষের মস্তিষ্কে বস্তুবাদ এতই প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে, যার ফলে কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিদের ঝাড়-ফুঁক ও দোয়া কালামকে একেবারেই নিঃপ্রয়োজন ও অনর্থক মনে করে থাকে। ঔষধ ব্যতীত তারা অন্য কিছুই বুঝে না। তবে ঔষধ সুস্থতার মাধ্যম মাত্র। সুস্থতা দানকারী নয়। সুস্থতাতো একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীনের হাতে। যদি ঔষধ ব্যবহারের দ্বারাই সুস্থতা লাভ করা যেত তাহলে কোন অসুস্থ ব্যক্তিই ঔষধ ব্যবহারের পর অসুস্থ থেকে যেত না। তাই আমাদের কখনও এই ধ্রুব সত্যটি ভুলে গেলে চলবে না যে, শেফা দানের ক্ষমতা এক মাত্র আল্লাহর হাতে। সুতরাং সুস্থতা লাভের জন্যে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত। ঔষধকে শুধুমাত্র একটি অবশ্য কার্যকর ও উপকারী মাধ্যম মনে করা চাই।

এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম নমুনা ও আদর্শ লক্ষ্যণীয়।

একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিয়সী স্ত্রীদের মধ্য হতে কোন এক স্ত্রীর আঙ্গুলে ফোঁড়া বের হয়। এই স্ত্রীই বর্ণনা করেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

هَلْ عِنْدَكِ ذَرِيرَةٌ؟ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ شَعْهَا عَلَيْهَا ـ وَقَالَ قُولِيْ ـ اَللّٰهُمَّ مُصَغِّرَ الْكَبِيْرِ وَمُكَبِّرَ الصَّغِيْرِ صَغِّرْ مَابِيْ

"তোমার নিকট কি "যারিরাহ" (চিরতা) আছে? আমি বললাম জী, হ্যাঁ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফোঁড়ার উপর "যারিরাহ" লাগিয়ে দাও এবং এই দোয়া পাঠ কর ঃ

اَللّٰهُمَّ مُصَغِّرَ الْكَبِيْرِ وَمُكَبِّرَ الصَّغِيْرِ صَغِّرْ مَابِيْ

স্বয়ং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একরাত্রে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায়কালে (অন্ধকারে) তাঁর হাত মুবারক মাটিতে রাখলে এক কমবখত বিচ্ছু এসে তাঁর পবিত্র হাতে দংশন করল। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু লবণ চেয়ে নিয়ে পানিতে মিশালেন। অতঃপর ঐ লবণ মিশ্রিত পানি বিচ্ছুর দংশিত স্থানে ঢালতে লাগলেন। তিনি (একহাতে পানি ঢালছিলেন এবং অন্য হাত দ্বারা ক্ষতস্থান মালিশরত অবস্থায় পবিত্র কুরআনের শেষ দুই সূরা নাস ও ফালাক পাঠ করছিলেন।" –তিরমিযী, বায়হাকী, মিশকাত

এভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঔষধ ব্যবহারের সাথে সাথে দুআও জারী রেখেছেন।

পবিত্র কুরআন একখানা রোগ নিরাময় ব্যবস্থাপত্র

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ "আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা ঈমানদারদের জন্য শেফা ও রহমত স্বরূপ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ঃ ৮২

পবিত্র কালাম এমন শেফা ও রোগ মুক্তির মহৌষধ যার মধ্যে আত্মিক ও দৈহিক সর্বপ্রকার অসুস্থতার শেফা ও নিরাময় রয়েছে। এমনকি এতে চারিত্রিক দোষ ও সামাজিক বিপথগামীদেরও শিক্ষা রয়েছে। যে সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তি

আল্লাহর কালামের দিক নির্দেশনা গ্রহণ করে নিয়েছে, তারা সকল প্রকার রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত এবং চিকিৎসক থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে গেছে। এই দাবীর প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় পাতায় বিদ্যমান রয়েছে। এখানে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানার একটি উদাহরণ পেশ করছি।

খায়রুল কুরুনের যমানায় মদীনা শরীফের ডাক্তারগণ হাতের উপর হাত রেখে বসে থাকত। এমনকি এক ডাক্তার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই অভিযোগ নিয়ে এল যে, কোন রোগীই তার নিকট যায় না। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সম্ভবত এর কারণ এই যে, এই সকল লোকেরা সে পর্যন্ত খানার প্রতি হাত বাড়ায়না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তীব্র ক্ষুধা অনুভব না করে। আর পরিপূর্ণ রূপে পেটভরার পূর্বেই খানা খাওয়া ছেড়ে দেয়। তাই মনে করা যায় যে কম খাওয়ার কারণেই তাদের সুস্থতা বজায় আছে।

পবিত্র কুরআন এখনও রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র। তবে শর্ত হলো এর উপর যথাযথ আমল করতে হবে। কুরআনকে শুধু উত্তম মনে করা এবং পাঠ করতে থাকা যথেষ্ট নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এ মহাপবিত্র গ্রন্থখানিকে আমরা আমাদের অমূল্য জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ্রহণ করে না নিব ততদিন আমরা এ থেকে কিভাবে উপকৃত হবো?

মেহ্দী ব্যবহারের উপকারিতা

মেহ্দী আমাদের দেশে ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এর পূর্ণ বৈশিষ্ট্য সাধারণ লোকের তো দূরের কথা অনেক শিক্ষিত লোকেরও জানা নাই। সাধারণতঃ মেহেদী পাতা পিষে হাতে পায়ে সৌন্দর্য্যের জন্য অথবা গরমী দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়। বিবাহ-শাদী, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ছাড়াও অন্যান্য অনুষ্ঠানে মেহ্দীর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। ডাক্তারী গবেষণানুযায়ী মেহ্দী রক্ত পরিষ্কারকারী এবং চর্ম রোগের জন্য উপকারী। কুষ্ঠরোগী, আগুনে পোড়া এবং পান্ডব রোগের জন্যও মেহ্দীর ব্যবহার খুব উপকারী। মেহ্দীর প্রলেপ ফোলা, ফোস্কা, আগুনে চামড়া পুড়ে যাওয়া রোগীর জন্য খুবই উত্তম প্রতিষেধক। মেহ্দীর বৈশিষ্ট্য ঠান্ডা।"

–কিতাবুল মুফরাদাত, খাওয়াসুল আদবিয়াঃ পৃঃ ৩৫২

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে মেহ্দী পাতাকে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করতেনঃ

(ক) ফোঁড়া পাকানোর জন্য (খ) শরীরে কাঁটা ইত্যাদি বিধঁলে (গ) মাথা ব্যথার জন্য।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেমা হযরত সালামা বিনতে উম্মে রাফে (রাযিঃ) বলেন ঃ

مَا كَانَ يَكُونُ بِرَسُولِ اللّٰهِ قَرْحَةٌ وَّلَا نَكْبَةٌ اِلَّا اَمَرَنِىْ اَنْ اَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَا ـ

"যখনই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ফোঁড়া পাচড়া বের হত অথবা কাঁটা বা এই প্রকারের কিছু ঢুকে যেত তখনই তিনি আমাকে বলতেন এর উপর মেহ্দী লাগিয়ে দাও।" –মিশকাত, তিরমিযী

অপর এক হাদীসে ইবনে মাজার বরাত দিয়ে আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) নকল করেন যে,

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا صَدَعَ غَلَفَ رَأْسَهُ بِالْحِنَاءِ وَيَقُوْلُ اِنَّهُ نَافِعٌ بِاِذْنِ اللّٰهِ مِنَ الصَّدَعِ

"যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথা ব্যথা দেখা দিত তখনই তিনি মাথায় মেহেদী লাগাতেন আর বলতে থাকতেন যে, আল্লাহর হুকুমে এটা মাথা ব্যথার শেফাদানকারী।

শিবরম একটি গরম জোলাপ বা বিরেচক

শিবরম এক প্রকার মিষ্টি ধরনের চারাগাছ যা বাঁশের কঞ্চির মত সোজা ও চিকন গিরাযুক্ত হয়ে থাকে। এর চারা গাছের উচ্চতা প্রায় এক হাত পরিমাণ হয়। এ গাছের গায়ে এক প্রকার পশম বা লোম বিশেষ থাকে যা উঠিয়ে ফেললে ভিতর থেকে ددوگون এর মত চিকন সূত বা তন্তু বেরিয়ে আসে।

এর রং সবুজ-লাল অথবা সাদাটে হলুদ বর্ণের এবং ফুল নীল রংগের হয়ে থাকে। স্বাদ তিক্ত এবং স্বভাব গরম ও রুক্ষ তবে এটা চতুর্থ পর্যায়ের গরম ও রুক্ষ ঔষধ এটা শরীরের যে কোন দুষিত পদার্থ পেশাবের সাথে বের করে দেয়।

কোন কোন প্রকারের শিবরম অত্যন্ত বিষাক্ত হয়ে থাকে, যা জীবন সংহারক বিষের চেয়ে কম নয়। এ ঔষধটি কফ এবং পাগলামীকে দাস্তের মাধ্যমে নিরাময় করে। শিবরমের তীব্র ও খারাপ প্রতিক্রিয়া এবং বিষাক্ততার কারণে কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত এটা ব্যবহার করা আদৌ ঠিক নয়। এ ব্যাপারে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ লক্ষ্যণীয় ঃ

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهَا بِمَا تَسْتَمْشِيْنَ قَالَتْ بِالشُّبْرُمِ قَالَ حَارٌّ حَارٌّ ....

"হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি জোলাবের জন্য কি ব্যবহার কর? তিনি বললেন– শিবরম। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাররুন! হাররুন!! এটা গরম এটা গরম। এই শব্দটি حَارٌّ حَارٌّ ও পড়া যায় অর্থাৎ খুব গরম এবং حَارٌّ جَارٌّ ও পড়া যায়। অর্থাৎ গরম এবং অধিক দাস্ত সৃষ্টিকারী।" তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোলাবের জন্য শিবরম-এর পরিবর্তে কালোজিরার ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়েছেন।"

মধুতে শেফা

আরবী পরিভাষায় মধু পোকাকে "নাহল" বলাহয়। পবিত্র কুরআনে এই নামে একটি স্বতন্ত্র সূরাই বিদ্যমান রয়েছে।

সূরাহ নাহলের ৪৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

"মধুর মধ্যে মানুষের শেফা রয়েছে"। মধু শেফা দানকারী" এ ঘোষণা প্রায় আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে করা হয়েছে। যা এখনও পূর্বের ন্যায় যথার্থ এবং সমগ্র বিজ্ঞান জগতই এই দাবী স্বীকার করে নিয়েছে।

মধু ঔষধ এবং খাদ্য উভয়ই। এ সুস্বাদু খাদ্যটি ছোট বড় প্রত্যেক দেশের এবং সকল পর্যায়ের মানুষই অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে ব্যবহার করে থাকে। কেনই বা করবেনা, এটাতো তিব্বে ইলাহী ও তিব্বে নববী অর্থাৎ খোদায়ী চিকিৎসা ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীস গ্রন্থের প্রসিদ্ধ কিতাব জামে সগীরে বর্ণিত আছে ঃ

عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ الْعَسَلِ وَالْقُرْاٰنِ

অর্থাৎ "মধু এবং কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের চিকিৎসা নেওয়া উচিত।"

– সূনানে ইবনে মাজাহ, হাকেম

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মধু এবং কুরআন মজীদ আমাদের জন্য শেফার মাধ্যম। আর এর দ্বারা ফায়দা হাসিল করা সকলের জন্যই অবশ্য কর্তব্য।

হযরত নাফে (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত রেওয়ায়াত সম্পর্কে একটু ভেবে দেখুন।

اِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا كَانَتْ تَخْرُجُ بِهٖ قَرْحَةٌ وَلَا شَيْءٌ اِلَّا لَطَخَ الْمَوْضِعَ بِالْعَسَلِ وَيَقْرَأُ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ -

"হযরত ইব্‌নে ওমর (রাযিঃ)-এর যখনি কোন ফোঁড়া, পাঁচড়া বা অন্য কিছু বের হত, তিনি তার উপর মধু লাগিয়ে দিয়ে পবিত্র কালামের এ আয়াত তেলাওয়াত করতেন– যার অর্থঃ "আল্লাহ তা'আলা মধুমক্ষিকার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় এবং মধু বের করে থাকেন, যার মধ্যে মানুষের শেফা ও রোগ মুক্তি রয়েছে।"

মধু এবং পেটের রোগ-ব্যাধি

মধুর মাধ্যমে শেফা সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস লক্ষ্য করুন।

"হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিতঃ এক ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, আমার ভাইয়ের পেটে ব্যথা অথবা একথা বললেন যে, সে আমাশয়ে ভুগছে।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, اِسْقِهٖ عَسَلًا - "তাকে মধু পান করিয়ে দাও।" সে ব্যক্তি চলে গেল। তবে আবার ফিরে এসে বলতে লাগল, আমি তাকে মধু পান করিয়েছি কিন্তু মধুতে কোন উপকার হয় নাই। এভাবে দু'তিনবার সে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশানুযায়ী একই কাজ করল। চতুর্থ বার এসে বলল যে, তার আমাশয় থামছে না। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

صَدَقَ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطْنُ اَخِيْكَ

"আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেছেন, হয়তো তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা।"

সুতরাং সে ব্যক্তি তার ভাইকে পুনরায় মধু পান করাল এবং সে সুস্থতা লাভ করল। হাদীসের শেষ শব্দ হলো–

فَسَقَاهُ فَبَرَأَ

সে মধু পান করল এবং সুস্থ হয়ে গেল।

–বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, সুনানে আহমদ, তিরমিযী

এখানে চিন্তার বিষয় হল আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালামের ভিত্তিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধুর দ্বারা শেফা লাভের উপর কিরূপ বিশ্বাস করেছেন এবং অবশেষে আল্লাহর হুকুম কিরূপে পুর্ণ হল!

বড় আফসোসের বিষয় আজ আমাদের অন্তর থেকে একীন ও ঈমানের দৌলত বের হয়ে গেছে। যে কারণে আমরা অনেক অনেক নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রয়েছি।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ব বর্ণিত হাদীসে বার বার ইরশাদ হয়েছে যে, "তাকে মধু পান করাও।" কারণ উক্ত রোগের (আমাশয়ের) জন্য এক নির্দিষ্ট পরিমাণ মধু সেবনের প্রয়োজন ছিল। অতএব মধুর গুণাবলীতে কোন রোগে কতটুকু ব্যবহার করা প্রয়োজন তা গবেষণা করা আমাদের চিকিৎসকদের দায়িত্ব।

প্রতি মাসে তিনবার মধু পান

মধুকে আরবীতে "আসাল" ফার্সী ভাষায় অঙ্গবীন, বাংলায় মধু, গুজরাটিভাষায় মাকদাহ, হিন্দীতে মাখী এবং ইংরেজীতে হানি (Honey) বলে। রং হিসেবে মধু দু' প্রকার হয়ে থাকে। লাল এবং সাদা কিছুটা হলুদের দিকে ধাবিত।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধুর অনেক প্রশংসা করেছেন। এখানে বিশেষভাবে নিম্নোক্ত হাদীসটির উপর চিন্তা করুন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَعَقَ الْعَسَلَ ثَلٰثَ غَدَوَاتٍ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيْمٌ مِّنَ الْبَلَاءِ

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনদিন সকাল বেলায় মধু চেটে সেবন করবে তার কোন কঠিন রোগ ব্যাধি হবে না।"

—মিশকাতুল মাসাবীহ, সুনানে ইবনে মাজাহ

আজ আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কিত গবেষণার মাধ্যমেও এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, মধু অগণিত রোগের ঔষধ। এর মধ্যে ভিটামিন এ, বি, সি, প্রচুর পরিমাণ বিদ্যমান। মধু কুষ্ঠ কাঠিণ্য দূরকারী, বাতের ব্যথা উপশমকারী এবং দুর্গন্ধ দূরকারী। মধু শরীর ও ফসফুসকে শক্তিশালী করে এবং রুচি বৃদ্ধি করে ও শক্তিসামর্থ স্থায়ী করে। কাশি, হাঁপানী, এবং ঠান্ডা রোগের জন্য মধু বিশেষভাবে

উপকারী। মুখের পক্ষাঘাত (যে রোগে মুখ অবশ হয়ে যায়) ও শরীরের পক্ষাঘাত রোগের প্রতিষেধক। মধু রক্ত পরিশোধনকারী এবং মানসিক রোগের জন্যও উপকারী। এটা চক্ষুরোগ ও দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির মহৌষধ।

–মুফরাদাত, খাওয়াসসুল আদবিয়্যা পৃষ্ঠাঃ ২৪৩

মধুর বৈশিষ্ট্যাবলী

প্রাচীন এবং আধুনিক সকল প্রকার চিকিৎসা শাস্ত্রই মধুর সীমাহীন ফায়দা এবং উপকারিতায় একমত। এমন কোন চিকিৎসা পদ্ধতি নাই, যার মধ্যে মধুর উপকারিতা স্বীকার করাই হয় না।

মধুর উপকারিতা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

মধু পেট পরিষ্কার করে, লালা ও কুষ্ঠকাঠিণ্য দূর করে, বৃদ্ধ ও শ্লেষ্মা (কাশি) প্রধান মেজাজের লোকদের জন্য খুবই উপকারী। আর ঠান্ডা প্রকৃতির রোগীর জন্যও ফলদায়ক।

চোখে লাগালে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়। চোখের যন্ত্রণা নিরাময় হয়। মধু ব্যবহারে দাঁত পরিষ্কার ও চমকদার হয় এবং দাঁতকে শক্ত করে। ঔষধের সাথে সাথে মধু উত্তম খাদ্য এবং পানীয়ও বটে।

উল্লেখিত এ সকল উপকার ছাড়াও মধুর একটি উত্তম বৈশিষ্ট্য হল, এটা সব ধরনের ক্ষতিকর দিক থেকে মুক্ত। মধুর কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নাই। এটাই একমাত্র বস্তু যা খোদায়ী ও মানবীয় উভয়বিদ চিকিৎসায় শরীর ও রূহের খোরাক। –তিব্বে নববীঃ কৃত আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ)

সিনা বা সোনামুখী গাছের পাতা একটি উত্তম জুলাব

সিনা এক প্রসিদ্ধ ঔষধ। ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতিতে এটা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সিনা পূর্বকালে যে পরিমাণ ব্যবহৃত হত আজও ঠিক সে পরিমাণই ব্যবহার হচ্ছে। এটা আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে "সেন্যায় মাককী" নামে সুপরিচিত। ইংরেজীতে বলা হয় সেন্যা বা সোনামুখী গাছ। সিনা পবিত্র হিজাযে অধিক জন্মে থাকে। দুই আড়াই শো বছর পূর্বে এই উপমহাদেশে এর উৎপাদন শুরু হয় এবং বর্তমানেও তা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছে।

সিনার পাতা মেহদী পাতার মত এবং ফল চেপ্টা ধরনের। এর আশ্চর্য্যজনক বৈশিষ্ট্য হল, এটা ত্রিমিশ্রণ অর্থাৎ শ্লেষ্মা (কাশি), পিত্তরস ও পাগলামী নাশক। সিনা একটি শক্তিশালী জুলাবেরও কাজ দেয়। মস্তিষ্ক থেকে শ্লেষ্মাও পরিষ্কার করে থাকে।

সিনা সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল্যবান ইরশাদ লক্ষ্যণীয়।

হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিতঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি জুলাবের জন্য কি ব্যবহার কর? তিনি শিবরমের নাম বললেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ

حَارٌّ حَارٌّ

"এটাতো খুবই গরম।" অতঃপর হযরত আসমা (রাযিঃ) পুনরায় আরয করলেন ঃ

اِسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيْهِ الشِّفَاءُ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِى السَّنَاءِ

"আমি সিনা দ্বারা জুলাব নেই। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি কোন জিনিসের দ্বারা মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়া যেত তবে তা সিনার দ্বারা পাওয়া যেত।"

সিনা সকল রোগের প্রতিষেধক

"হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

لَوْ اَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيْهِ الشِّفَاءُ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِى السَّنَاءِ

"যদি কোন প্রতিষেধকের মধ্যে মৃত্যু থেকে নিরাময় থাকত তবে তা সিনার মধ্যে থাকত।"

অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন –

عَلَيْكُمْ بِالسَّنَاءِ فَاِنَّهُمَا شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ اِلَّا السَّامَ ـ

"তোমরা অবশ্যই সিনা ব্যবহার করবে, কেননা এটা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের শেফা দানকারী মহৌষধ।"

উম্মি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল্যবান বাণীর আলোকে ডাক্তারী পরীক্ষা নিরীক্ষা লক্ষ্য করুন, দেখবেন তা অক্ষরে অক্ষরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল্যবান বাণীর সমর্থন করেছে।

সিনা সর্ব রোগের প্রতিষেধক। এটা মস্তিষ্ক পরিষ্কার করে, কোমর ব্যথা– ফ্লুরিসি বা পার্শ্ব বেদনা, নিউমোনিয়া, উরুর উপরাংশের ব্যথা, গিটবাত, এবং

পালা জ্বরে তা ব্যবহৃত হয়। সিনা ক্রিমিনাশক। পূর্ণ মাথা ব্যথা, মাথার এক পার্শ্বের ব্যথা এবং মৃগী রোগের জন্য উপকারী। এটা বিষাক্ত নয় এবং এতে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নাই। −মুফরাদাতঃ পৃষ্ঠা ঃ ২২৪

সিনা অনেক প্রকারের হয়ে থাকে। প্রসিদ্ধ প্রকারগুলি হল− সিনায়ে মাককী বা হেজাজী, সিনায়ে রোমী, সিনায়ে মিসরী, সিনায়ে আসকারী এবং সিনায়ে হিন্দী। সিনার আরও একটি প্রকার আছে, যা সর্বত্র পাওয়া যায়। এটা রক্ত পরিষ্কার করে, কোনী নূখা ও শ্বাস কষ্টের জন্য উপকারী। সিনা চোখের পর্দা কাটে এবং শুল বেদনা দূর করে। সিনা আজো বিভিন্ন পন্থায় শত শত রোগের ঔষধ হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে।

মুসাববরের ব্যবহার বিধি

মুসাবরর একটি বিস্বাদ ও অত্যন্ত তিক্ত কাল রঙের একপ্রকার গুড়ো। এর তাছীর গরম ও শুষ্ক। চিকিৎসকগণ এটাকে বিরোচক এবং পাকস্থলী ও হার্টের শক্তিবর্দ্ধক বলে থাকেন। অধিক বায়ু নির্গমন ও মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্যও ফলদায়ক। −মুফারাদাত ঃ পৃষ্ঠাঃ ৮৫

মুসাববর সম্পর্কে হযরত উম্মে সালমা (রাযিঃ)-এর রেওয়ায়াতটি লক্ষ্য করুন। তিনি বলেনঃ

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُوْ سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَيَّ صَبِرًا فَقَالَ مَا ذَا يَا أُمَّ سَلَمَة؟ فَقُلْتُ إِنَّهُ هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لَيْسَ فِيْهِ طِيْبٌ - قَالَ إِنَّهُ يَشُبُّ وَجْهَهُ فَلَا تَجْعَلْهُ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَنَهٰى عَنْهُ بِالنَّهَارِ -

"আবূ সালমার ইন্তেকালের পর হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাশরীফ নিয়ে আসেন। এ সময় আমার মুখে মুসাববর লাগিয়ে রেখেছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, উম্মে সালমা! এগুলি কি? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এগুলি মুসাববর! এর মধ্যে কোন সুগন্ধি নাই। হুযুর বললেন, এটা চেহারাকে পরিষ্কার ও সজীব করে। সুতরাং তুমি এটা রাতে লাগিও। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনে ব্যবহার করতে নিষেধ করেন।"

ভেবে দেখুন! হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার সাথে সাথে পবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি কত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি কোন প্রকার দৃষ্টিকটু ও বিশ্রি অবস্থা পছন্দ করতেন না। এমনিভাবে তাঁর পুত পবিত্র ও সূরুচিপূর্ণ স্বভাব কোন বিস্বাদ ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু সহ্য করতে পারতো না।

সুরমা দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়

আধুনিক ফ্যাশনের যুগে চোখে সুরমা লাগানো প্রাচীনত্বের নিদর্শন হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে বিভিন্ন প্রকারের পাউডার, ক্রীম, পালিশ ও অন্যান্য প্রসাধনী এত অধিকহারে ব্যবহার করা হচ্ছে যে, তাতে মানুষের চেহারা সুরতই বদলে যায়। অথচ এগুলির বেশীর ভাগই এমন যা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চামড়া এবং সৃষ্টিগত রঙ, রূপ ও সৌন্দর্যকে এমনভাবে বিনষ্ট করে দেয় যে, অনেক ক্ষেত্রে মানুষের গঠনই বিকৃত হয়ে যায়।

এবার আসুন! মানবতার প্রতি অনুগ্রহশীল বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুরমা সম্পর্কিত মহামূল্যবান বাণী পাঠ করুন।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন–

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِالْاِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ فَاِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ ـ

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তোমরা ঘুমানোর আগে অবশ্যই চোখে সুরমা লাগিও। কেননা, নিঃসন্দেহে সুরমা দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে ও চুল গজায়।" –মুসতাদরাক, ইবনে মাজাহ

সুরমা শুধুমাত্র একটি ফ্যাশন বা সৌন্দর্যের ব্যাপারই নয়। বরং এর মধ্যে উপকারিতাও রয়েছে। এখানে বিভিন্ন কৃত্রিম বস্তুর দ্বারা সংমিশ্রিত বাজারী সুরমার কথা বলা হয় নাই। বরং সম্পুর্ণ নির্ভেজাল সুরমা সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, ঘুমানোর পূর্বে চোখে সুরমা লাগানোর অভ্যাস করে নাও। এতে চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়। দৃষ্টি শক্তিশালী হয়। চুল গজায়। দামী ঔষধ পত্রের দ্বারা তোমরা যা পেতে চাও কুদরতী সুরমার দ্বারা তোমরা তা বিনা মূল্যেই পেয়ে যাবে। আর সৌন্দর্য তো এমনিতেই হাসিল হবে।

কত সৌভাগ্যশীল সেইসব পুরুষ ও নারী, যারা সুন্নত মনে করে এবং প্রিয় নবীর আদেশ পালনার্থে চোখে সুরমা ব্যবহার করে দৃষ্টির প্রখরতা বৃদ্ধি ও সওয়াবের ভান্ডার সমৃদ্ধ করছে।

সুরমা কিভাবে লাগাবে? হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই বার ডান চোখে ও দুই বার বাম চোখে সুরমা লাগাতেন। অতঃপর একবার কাঠিতে সুরমা নিয়ে উভয় চোখে লাগাতেন। এভাবে সংখ্যার মধ্যে বেজোড় হয়ে যেত। তিনি বেজোড় সংখ্যা খুবই পছন্দ করতেন।

কুসত্ (কুড় বা আগর কাঠ)

গলনালীর আবদ্ধতা ও গলগন্ড রোগের চিকিৎসা

কুস্ত বা আগর কাঠকে ফারসীতে কুস্তাহ্ এবং হিন্দীতে গোঠ বলা হয়; আর এর ইংরেজী নাম হলো কাস্টাস্ রোট (Castus Root)। এ কুস্ত দুইপ্রকার। একটা হলো কুস্তে বাহ্রী বা সাদা কুসত্ এবং অন্যটি হলো কুস্তে হিন্দী (কুস্তে আসওয়াদ বা কালো গোঠ)। স্বাদের দিক থেকেও কুস্ত দুইপ্রকার। একটা কুস্তে হালুয়ে বা মিষ্টি কুস্ত। অন্যটি কুস্তে মুররা বা তিক্ত কুস্ত। মূলতঃ কুস্তের স্বাদ যে শুধু তিক্ত বা মিষ্ট তা নয় বরং এর প্রতিক্রিয়া (Action) বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে।

তিক্ত গোঠ বিষাক্ত হয়ে থাকে। এটা খাওয়া যায় না, শুধু মাত্র বাহ্যিক প্রয়োগ অর্থাৎ প্রলেপ, মালিশ, ইত্যাদি রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ঔষধটি পাকস্থলীর বায়ু ও ওয়ারাম বা ফোলা ব্যাধি নিরাময় করে। তাছাড়া শরীরের প্রধান প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্তিশালী করে এবং খেঁচুনী (পেশী সংকোচন) রোগ দূর করে। হাঁপানী, এজমা, নিউমোনিয়া, শ্লেষ্মা (কফ) রোগের জন্যও বিশেষ উপকারী।

–কিতাবুল মুফরাদাত খাওয়াসসুল আদবিয়া ঃ পৃঃ ২৮৪

মিষ্টি গোঠের শিকড় সুঘ্রাণযুক্ত হয়। এটা শরীরের প্রধান অঙ্গসমূহ তথা হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক, যকৃৎ, অন্ডকোষ ইত্যাদির জন্য শক্তিবর্ধক। এছাড়া অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও শক্তিশালী করে। মস্তিষ্ক জনিত রোগ, প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাত, "লাকোয়া" বা মুখের অর্ধাঙ্গ ও কম্পন রোগের (এ রোগে হাত পা কাঁপতে থাকে) জন্যও বিশেষ উপকারী। খাওয়াস্সুল আদোবিয়া ঃ পৃঃ ২৮৫

কুস্তের উপকারীতা সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনা লক্ষ্য করুন।

١- عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْغَذَارَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ -

(১) "হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের বাচ্চাদের গলগ্রহ হলে গন্ডদেশ মালিশ করে ও দাবিয়ে কষ্ট দিও না। বরং তোমরা কুস্ত ব্যবহার কর।"

–বুখারী, মুসলিম

٢- عَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى مَا تَدْعُوْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهٰذَا الْغِلَاقِ عَلَيْكُنَّ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ ......

(২) "হযরত উম্মে কায়েস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের গলা মালিশ করে ও দাবিয়ে (এমন) কঠিন চিকিৎসা কেন করছ? তোমাদের হিন্দী উদ বা কুস্‌ত ব্যবহার করা উচিত।" –বুখারী, মুসলিম

সুনানে ইবনে মাজাহ এবং মুসতাদরাকে হাকেম নামক কিতাবদ্বয়ে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) কর্তৃক একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে, "একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর ঘরে তাশরীফ নিয়ে যান। এ সময় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর নিকট একটি শিশু ছিল। সে গলনালির আবদ্ধতা জনিত রোগে খুবই কাতর ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কুস্‌তে হিন্দী নামক ঔষুধ ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর পরামর্শানুযায়ী ঔষধ করায় শিশুটি আরোগ্য লাভ করে।"

কুস্‌ত ইত্যাদি দ্বারা নিউমোনিয়া রোগের চিকিৎসা

কুস্‌ত সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ও-এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চিকিৎসকগণের (ইউনানী মতে) অভিমত আমরা এ অধ্যায়ে পূর্বে যথাসম্ভব বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। এখানে আখেরী নবী হুযুর (সাঃ)-এর আরো দুটি হাদীস উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

إِنَّ أَمْثَلَ مَاتَدَ اوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ

(১) "নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা যেসব জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করে থাক তার মধ্যে সর্বোত্তম ব্যবস্থা হলো হাজামত বা সিংগা লাগানো ও কুস্‌ত বাহরী।" –বুখারী, মুসলিম

দ্বিতীয় হাদীসের বর্ণনাকারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিঃ) বলেন ঃ

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَدَاوٰى مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ

(২) "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুস্‌তে বাহরী এবং জায়তুন তৈল দ্বারা নিউমোনিয়া রোগের চিকিৎসা করার নির্দেশ দিয়েছেন।"

–মুসতাদরেকে হাকেম, তিরমিযী শরীফ

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ঃ

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب

অর্থাৎ "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিউমোনিয়া রোগের প্রতিষেধক হিসাবে" যায়তুন ও ওয়ারসের খুব প্রশংসা করতেন।" –তিরমিযী

মনে হয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিউমোনিয়ার চিকিৎসার জন্যে কুস্তে বাহ্‌রী (গোঠ), জায়তুন ও ওয়ারস নির্বাচন করেছেন।

তাই আমাদের চিকিৎসকগণের উচিত উপরোক্ত ঔষধাবলীর মাধ্যমে চিকিৎসার ভিত্তি স্থির করা এবং গবেষণা ও অনুসন্ধানের দ্বার উম্মুক্ত রাখা, যাতে বিশ্বের রোগক্লিষ্ট মানব জাতির নিশ্চিত সুচিকিৎসা সম্ভব হয়।

কালোজিরা সর্ব রোগের ঔষধ

কালোজিরাকে ফার্সীতে শোনিজ, আরবীতে হাব্বাতুস সাওদা এবং ইংরেজীতে ব্লাক কিউমিন (black cumin) বলা হয়। যার চারাগাছগুলি দেখতে অনেকটা ছোঁপ (গুয়ামুরী)-এর চারাগাছ সদৃশ। ডাল-পালা চিকন চিকন, ফলগুলি লম্বাটে কালো এবং শ্বাষ সাদা বর্ণ হয়। কালোজিরা সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী অবিস্মরণীয়ঃ

"হযরত আবূ সালামাহ (রাযিঃ) হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيْهَا شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ ـ

"তোমরা এই কালোজিরা ব্যবহার করবে, কেননা এতে একমাত্র মৃত্যু রোগ ব্যতীত সর্বরোগের শেফা (আরোগ্য) রয়েছে। হাদীসে উল্লেখিত সাম-এর অর্থ মৃত্যু।" –বুখারী ও মুসলিম

দ্বিতীয় রেওয়ায়াতের ভাষা হলো ঃ

إِنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِى الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ اِبْنُ شِهَابٍ اَلسَّامُ الْمَوْتُ ـ

"তিনি (হযরত আবূ সালামাহ (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন কালোজিরা একমাত্র সাম বা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের মহৌষধ। ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, এখানে "সাম" দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে।" –মিশকাতুল মাসাবীহ

বিস্ময়াভিভূত ইউনানী মতের অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ নবীয়ে উম্মী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণীর সত্যতার স্বাক্ষ্য এভাবে দিয়েছেন যে,

"কালোজিরা ঠান্ডা জাতীয় ব্যাধি–সর্দি, কফ, কাশি ইত্যাদির জন্য অত্যন্ত উপকারী।

পক্ষাঘাত (প্যারালাইসীস) ও কম্পন রোগে কালোজিরার তৈল মালিশ করলে আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যায়। কালোজিরা যৌন ব্যাধি ও স্নায়ুবিক দুর্বলতায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্দি, কাশি, বুকের ব্যথা, পাকস্থলীতে বায়ু সঞ্চয় (অম্লপিত্ত) শুলবেদনা ও প্রসূতী রোগে অত্যধিক উপকারী। ক্রুনের জন্যও উত্তম ঔষধ। এবং এতে শ্লেষ্মা, পুরাতন জ্বর, মূত্রথলির পাথর ও পান্ডুরোগ (কামিলা, জন্ডিস) আরোগ্য লাভ করে। তাছাড়া এটা মুদরে হায়েজ, বা অধিক ঋতু স্রাব, মুদরে বাওল মাত্রাতিরিক্ত পেশাব প্রতিরোধক ও ক্রিমিনাশক। –কিতাবুল মুফরাদাত ঃ খাওয়াসসুল আদোবিয়া ঃ ২৭৯

হযরত কাতাদাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রতিদিন ২১টি কালোজিরার ১টি পুটলি তৈরী করে পানিতে ভিজাবে এবং পুটলির পানির ফোঁটা এ নিয়মে নাশারন্ধ্রে ব্যবহার করবে–

প্রথমবার ডান নাশারন্ধ্রে ২ ফোঁটা এবং বাম নাশারন্ধ্রে ১ ফোঁটা। দ্বিতীয়বার বাম নাশারন্ধ্রে ২ফোঁটা এবং ডান নাশারন্ধ্রে ১ ফোঁটা। তৃতীয় বার ডান নাশারন্ধ্রে ২ ফোঁটা ও বাম নাশারন্ধ্রে ১ ফোঁটা। –তিরমিযী, বুখারী, মুসলিম

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন রোগ-যন্ত্রণা খুব বেশী কষ্টদায়ক হয় তখন এক চিমটি পরিমাণ কালোজিরা নিয়ে খাবে অতঃপর পানি ও মধু সেবন করবে।

–মুজামুল আওসাতঃ তাবরানী

গৃদ্ৰশী বা সাইটিকায় দুম্বার চাকি

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ دَوَاءُ عِرْقِ النِّسَاءِ اَلِيَةُ شَاةٍ اَعْرَابِيَةٍ تُذَابُ ثُمَّ تُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ اَجْزَاءٍ فَتَشْرَبُ فِىْ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ ـ

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, দুম্বার চাক্কির মধ্যে বেদনা রোগের শেফা রয়েছে। এটাকে দ্রবণ করে (পিশে বা গলিয়ে) তিনভাগ করবে এবং তিন দিন সেবন করবে।" –মুসতাদরাকে হাকেম

এ সম্পর্কে মুসতাদরাকে হাকেম নামক কিতাবে তিনটি রেওয়ায়াতের উল্লেখ আছে। সেখানে এ কথা অতিরিক্ত রয়েছে যে, চাক্কি অতি বড় বা ছোট না হওয়া চাই। এই ঔষধ মুখের লালা সহ সেব্য অর্থাৎ পানি ইত্যাদির সঙ্গে সেবন করবে না। এছাড়া উক্ত হাদীস শরীফে শাতুন ও কাবশুন -এর চাক্কির কথা উল্লেখ আছে। সম্ভবত উক্ত শব্দ দুটি দুম্বাকে বুঝাবার জন্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা বকরীর চাক্কি হয় না।

গৃদ্রশী বা সাইটিকা মূলত ঃ একটি অতিশয় জটিল রোগ। তবে এটা যে শুধু মাত্র মহিলাদের রোগ এটা মনে করে কেউ যেন বিভ্রান্ত না হয়। বরং এটা এক প্রকার কঠিন বেদনার নাম যা পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলেরই হতে পারে। ইংরেজীতে এটাকে সিয়াটিক পেইন (SCIATIC PAIN) বলে। সাধারণতঃ এ বেদনা মেরুদন্ডের হাড্ডি থেকে আরম্ভ করে রগের মধ্য দিয়ে পায়ের গিট পর্যন্ত নিম্নভাগে অসহনীয় উপায়ে সঞ্চারিত হতে থাকে।

দুর্বলতা, বার্ধক্য ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শুষ্কতা এ রোগের কারণ। আর দুম্বার চাক্কীই যে এ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ এটা সুস্পষ্ট।

জ্বরের চিকিৎসায় ঠান্ডা পানি

জ্বর একটা প্রসিদ্ধ রোগ। সকল দেশের প্রত্যেক এলাকায় এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়। ছোট বড় যুবক বৃদ্ধ, নির্বিশেষে সকলেই এই রোগের শিকার হয়ে থাকে। এ জ্বর যেমন অনেক প্রকার তেমনি এর কারণ বা উপসর্গও অসংখ্য। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে জ্বরের প্রকোপ খুব বেশী দেখা যায়। এখানকার মানুষ প্রচন্ড গরম ও সূর্যোত্তাপে খুবই অস্থির হয়ে পড়ে। যার ফলে জ্বরের উত্তাপের সীমা চরমে পৌঁছে। বর্তমানে এ ধরনের রোগীকে বরফের সেল দ্বারা ঠান্ডা করা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠান্ডা পানিকে জ্বরের একটা উৎকৃষ্ট চিকিৎসা সাব্যস্ত করেছেন। এ সম্পর্কে একাধিক সাহাবায়ে কিরাম হতে রেওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ اَلْحُمّٰى مِنْ كِيْرِ جَهَنَّمَ فَامْحُوْهَا مِنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

"জ্বর জাহান্নামের একটা উত্তপ্ত পাত্র বিশেষ তোমরা ঠান্ডা পানির দ্বারা এটাকে দূর কর।" –সুনানে ইবনে মাজাহ

কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে যমযমের পানি দ্বারা ঠান্ডা করবে।

হযরত সামুরা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত ঃ

عَنْ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ - اَلْحُمّٰى قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ ......

"জ্বর জাহান্নামের উত্তাপের অংশ বিশেষ। তোমরা ঠান্ডা পানি দ্বারা এটা ঠান্ডা কর।"– মুস্তাদরাকে হাকেম, তাবরানী।

হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ - اَلْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ......

"জ্বর জাহান্নামের তাপ। পানি দ্বারা এটাকে ঠান্ডা কর।"

– ইবনে মাজাহ্, মালেক, আহমদ, নাসায়ী, হাকেম

প্রায় অনুরূপ একটা হাদীস হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকেও বর্ণিত রয়েছে।

প্রখ্যাত হেকীম জালিনুস স্বীয় "হীলাতুল বার" নামক কিতাবে জ্বরের জন্য পানিকে সর্বোত্তম উপকারী বলে বর্ণনা করেছেন। যুগশ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ ইমাম রাযী (রহঃ) তাঁর 'কাবীর' গ্রন্থে জ্বরের জন্যে ঠান্ডা পানি ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন।

কুম্বা চক্ষু রোগের ঔষধ

'কুম্মা' কে উর্দূতে কুম্ব বা কুম্বী বলা হয়। এটা দেখতে দুগ্ধবরণ ক্ষুদ্রাকার বলের মত। বর্ষাকালে আপনা থেকেই জন্মে। চাষাবাদ প্রয়োজন হয় না। কুম্বির ক্রিয়া ঠান্ডা। এর তরকারী সুস্বাদু। এটা শুকিয়ে চিবিয়ে খেলে বমি উপশম হয়। এটা প্রধানত তিন প্রকার (১) সাদা (২) লাল ও (৩) কালো। কালচে কুম্বী খুবই বিষাক্ত হয়ে থাকে। এটাকে হিন্দীতে "পদ ভেড়া" বলে। আহার্য এবং ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত কুম্বা আরবীতে 'আল কুম্বা' নামে পরিচিত। এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ পাঠ করুন ঃ

اَنَّ نَاسًا مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ص اَلْكَمْأَةُ جُدَرِىُّ الْاَرْضِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاءُ هَا شِفَاءُ الْعَيْنِ -

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আরয করলেন, কুম্বী তো জমিনের বসন্ত রোগ! তাদের একথা শ্রবণ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, কুম্বী তো মান্না (ঐ খাদ্য যা বনী ঈসরাইলকে মাঠে দান করা হয়েছিল।) থেকে উৎপন্ন। আর এর পানি চক্ষু রোগের প্রতিষেধক। অতঃপর হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) তাঁর নিজের ব্যক্তিগত ঘটনা বর্নণা করেন যে, আমি তিন, চার বা পাঁচটি কুম্বা সংগ্রহ করি এবং এগুলি নিংড়িয়ে একটা ছোট শিশিতে ভরে রাখি। আমার এক বাঁদীর চোখে ব্যথা ছিল, আমি তার চোখে সেই পানি লাগিয়ে দিলাম এবং সে সুস্থ হয়ে গেল।" –তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) তাঁর বাঁদীর চোখের যে অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন তা ছিল "আমাশ' অর্থাৎ চক্ষু ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া। এ রোগে চক্ষু থেকে অধিকাংশ সময় পানি ঝরতে থাকে এবং চক্ষু স্থির রেখে দীর্ঘক্ষণ কোন কিছুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা সম্ভব হয় না।

আমাদের দেশের চক্ষু বিশেষজ্ঞগণের উক্ত ঔষধের উপর প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা করা আবশ্যক এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণা অনুযায়ী এতে চক্ষু রোগের কি কি শেফা রয়েছে এবং এটা ব্যবহার বিধিইবা কি তা তলিয়ে দেখা উচিত।

মাছি বাহিত রোগ ও চিকিৎসা

মাছিকে ফারসী ভাষায় "মাগাস" এবং আরবীতে "যুবাব" বলা হয়। মাছি একটা উড্ডয়নশীল তুচ্ছ ও ঘৃণিত প্রাণী। এটা সাধারণতঃ ময়লাযুক্ত স্থানে বসে এবং তথায় বসবাস করে। এ কারণে কেউই এ প্রাণীটিকে পছন্দ করে না। মাছির মল যদি কোন রশি ইত্যাদির উপর লেগে থাকে তা পানিতে ভিজিয়ে কানে প্রবেশ করালে কানের ব্যথা উপশমহয়। কাউকে না জানিয়ে মাছির মল গুড়ের সঙ্গে মিশ্রিত করে ১১দিন খাওয়ালে পান্ডব রোগের অশেষ উপকার হয়।"

–কিতাবুল মুফরাদাত, খাওয়াসসুল আদবিয়াঃ পৃঃ ৩৪১

মাছি সম্পর্কিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মূল্যবান বাণী লক্ষ্য করুনঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَامْقُلُوْهُ فَاِنَّ فِىْ اَحَدِ جِنَاحَيْهِ دَاءً وَّفِى الْاٰخِرِ شِفَاءً۔

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কারো পানির পাত্রে মাছি পতিত হলে এটাকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে উঠাও। কেননা মাছির এক পাখায় রোগ ও অপর পাখায় রোগের প্রতিষেধক রয়েছে।" –বুখারী ও মুসলিম শরীফ

অন্য এক হাদীসের শেষ বাক্যটি এরূপ "মাছির বিষক্রিয়া সম্পর্কে কারো অজানা নেই। তবে এর এক পাখায় রোগ এবং অন্য পাখায় শেফা রয়েছে।" এ সম্পর্কে কারো যদি দ্বিমত থাকে; তার স্মরণ রাখা উচিত যে, এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী। সুতরাং এতে সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশই নাই। এটাও বাস্তব বিষয় যে, বল্লা ও বিচ্ছুর ক্ষত স্থানে মাছি মালিশ দিলে আরামবোধ হয়। এ সকল তত্ত্ব দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায়, মাছির মধ্যে রোগ নিরাময়ের প্রভাব রয়েছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে যদি মাছি নিমজ্জিত খানা অথবা পানকৃত পানি গ্রহণ করা না করা নিয়ে প্রশ্ন উঠে সেখানে বলা হবে যে, এর সম্পর্ক ইচ্ছার সঙ্গে এবং প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুতরাং কোন ব্যক্তি এমন আহার্যাদি গ্রহণ করতে না চাইলে এতে জোর করার কিছুই নাই।

ঔষধ হিসাবে লবণ

সাধারণতঃ আমরা লবনকে মসলা হিসাবে ব্যবহার করে থাকি। কোন তরকারী লবণ ব্যতীত খাওয়ার উপযুক্ত হয় না। তাছাড়া লবণ ব্যতীত কোন মসলাই সিদ্ধ হয় না। সুতরাং লবণ খাদ্যের একটা অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। লবণ হজম শক্তি বর্ধক, ক্ষুধা দূরকারী ও মন প্রফুল্লকারী। চুকা ঢেকুর এবং পেটের বায়ূ পরিশোধিত করা এর বৈশিষ্ট্য। হজম শক্তির দুর্বলতা, রক্ত দোষণ, যকৃৎ ও প্লীহার কমজোরী নিরাময়ে লবণ বিশেষ উপকারী।

–সিহ্হাত ও যিন্দিগীঃ পৃঃ ১৩৩

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষক্রিয়া দূর করার জন্য লবণ ব্যবহার করতেন।

"হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিতঃ একদা রাত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করছিলেন। সিজদারত অবস্থায় জমীনে হাত রাখলে একটা বিচ্ছু প্রিয় হাবীবকে দংশন করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচ্ছুটিকে তাঁর জুতা দিয়ে মেরে ফেললেন। অতঃপর নামায থেকে ফারেগ হয়ে বললেন, এ বিচ্ছুটির উপর আল্লাহর অভিশাপ। কারণ এটা নামাযী ও বেনামাযী কাউকেই ছাড়ে না। অথবা তিনি বললেন, এটা নবী এবং সাধারণ মানুষের কাউকেই রেহাই দেয় না।"

ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِىْ اِنَاءٍ ثُمَّ جَعَلَ يَصُبُّهُ، عَلٰى اِصْبَعَيْهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ وَيَمْسَحُهَا وَيُعَوِّذُهَا بِمُعَوِّذَتَيْنِ -

"অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লবণ ও পানি চাইলেন এবং তা একটা পাত্রে ঢাললেন। অতঃপর ঐ দ্রবণে আঙ্গুল ডুবিয়ে ক্ষতস্থানে

মালিশ করলেন। অবশেষে পবিত্র কুরআনের শেষোক্ত দুটি সূরা তেলাওয়াত করলেন।" –মিশকাতুল মাসাবীহ, বায়হাকী

এখানে এ বিষয়টি বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ঝাড় ফুঁক ও দূআ কালামই যথেষ্ট মনে করে ঔষধ ত্যাগ করেন নাই। অথবা শুধু ঔষধের উপরও নির্ভর করেন নাই। বরং বিষক্রিয়া নষ্ট করার জন্য আক্রান্ত আঙ্গুলের উপর লবণ পানি ঢাললেন এবং সাথে সাথে আল্লাহর কালাম পাঠ করে (বিতাড়িত শয়তান থেকে) আল্লাহর নিকট আশ্রয়ও প্রার্থনা করলেন। মোটকথা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ ও দাওয়া দুইটিকেই সমান গুরুত্বের সাথে দেখতেন। কেননা, রোগ আরোগ্যের দুইটি অছিলার একটা হলো বস্তুগত এবং অপরটি হলো রূহানী। সুতরাং কেউ যদি একচ্ছত্র শেফাদানকারী আল্লাহকে ভুলে যেয়ে শুধু মাত্র ঔষধের উপর ভরসা রাখে, তার মত বড় দুর্ভাগা আর কে হতে পারে? অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ রাখে বটে, কিন্তু তাঁর সৃষ্ট নিয়ামতকে কাজে না লাগায় সেও ভুলের মধ্যে আছে।

সর্দি, কাশি এবং গলার সমস্যায় লবণ পানি গড়গড়া খুবই উপকারী। শরীরের হাড্ডি ভেঙ্গে গেলে বা মচকে গেলে সামান্য উষ্ণ পানিতে লবন মিশিয়ে আক্রান্ত স্থান ঐ লবণ পানিতে ডুবিয়ে রাখলে অথবা সেখানে পানি ঢাললে বর্ণনাতীত উপকার পাওয়া যায়।

ত্বকাচ্ছাদন প্রদাহ বা চুলকানি রোগে রেশমী কাপড়

ইসলাম অনুগত বান্দাদেরকে আয়েশী বা ভোগ বিলাসী যিন্দিগীর পরিবর্তে অনাড়ম্বর ও সরল জীবন যাপন প্রণালী শিক্ষা দেয়। সুখ অন্বেষণ ও আরাম প্রিয়তার পরিবর্তে কর্মঠ ও পরিশ্রমী করে তোলে। মূলতঃ ইসলামের ইবাদত বন্দেগী এই বাস্তবতার চাক্ষুষ প্রমাণ এবং ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানই এ ব্যাপারে যথার্থ সাক্ষী।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় স্বর্ণ ও রৌপ্যের বর্তন ব্যবহারের কোন প্রকার অনুমতি নাই। তবে মহিলাদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকারাদি ব্যবহারের অনুমতি অবশ্যই রয়েছে। তবে এগুলির পরিমাণ একটা নির্দিষ্ট সীমায় অর্থাৎ নেছাব পরিমাণে পৌঁছালে যাকাত দেয়া ফরয। পুরুষদের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য এবং রেশমী কাপড় ব্যবহারের অনুমতি যদিও নাই তবে অসুস্থতার মজবুরীতে এ নির্দেশেরও ব্যতিক্রম ঘটতে পারে।

যেমন হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِيْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا ـ

"হযরত রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারেশ বা চুলকানির কারণে হযরত জাবের (রাযিঃ) এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিঃ)কে রেশমের কাপড় পরার অনুমতি দিয়েছিলেন।"–বুখারী, মুসলিম

রেশমী পোষাক কোমল ও ঠান্ডা হয়ে থাকে বিধায় খারেশ রোগীদের জন্য খুবই আরামদায়ক হয়।

অতিরিক্ত রক্তে সিংগা লাগান

সাধারণ প্রচলিত ঔষধ ছাড়াও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য ঔষধেরও পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন তীরের জখম ও কাঁটা বিধলে উত্তপ্ত লোহার দাগ দেওয়া বা অতিরিক্ত রক্ত চাপে সিংগা লাগানো। ফোঁড়া দুম্বল ইত্যাদির অপারেশন। এক বিশেষ ইসতিসকার (এক প্রকার ব্যাধি যাতে রোগী খুব বেশী পানি পান করতে চায়) চিকিৎসায় এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় পেট ছিদ্র করা ইত্যাদি।

এখানে আমরা হযরত নাফে (রাযিঃ)-এর ভাষায় সিংগা লাগানো সম্পর্কে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ বর্ণনা করছিঃ

قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرُ رضـ يَا نَافِعُ رضـ يَنْبَعُ لِيْ الدَّمُ فَأْتِنِيْ بِحَجَّامٍ وَاجْعَلْهُ شَابًّا وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا وَلَا صَبِيًّا قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضـ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيْقِ اَمْثَلُ وَهِيَ تَزِيْدُ فِي الْعَقْلِ وَتَزِيْدُ فِي الْحِفْظِ

"হযরত নাফে (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমাকে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর (রাযিঃ) একদা বললেন, হে নাফে, আমার রক্তের মধ্যে বিশেষ চাপ (উত্তেজনা বা স্ফুটন) সৃষ্টি হচ্ছে। এমন একজন হাজ্জাম (সিংগা লাগানেওয়ালা) ডাক – সে যেন যুবক হয়– বৃদ্ধ অথবা অল্প বয়সী না হয়। অতঃপর হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, খালি পেটে সিংগা লাগান খুবই উত্তম। এতে জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এবং স্মৃতি ও মেধাশক্তি প্রখর পায়।

জবের দালিয়া (জবের ছাতু ও গুড় বা চিনি দ্বারা তৈরী এক প্রকার গোল্লা)

জব খাদ্য দ্রব্য সম্পর্কিত একটা অতি পরিচিত নাম। এটাকে যদিও নিম্নশ্রেণী ও গরীব দুঃখীদের খাদ্য মনে করা হয় তথাপি এর ছাতু দ্বারা তৈরী শরবত গ্রীষ্মকালে ব্যাপকভাবে পান করা হয়ে থাকে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীদের জন্য জবকে একটা উত্তম পথ্য, পেটের পীড়ার একটি উপকারী ঔষধ এবং দুর্বলতায় বিশেষ শক্তি বর্ধক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রা স্ত্রী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের কারো জ্বর হলে তার জন্য জবের দালিয়া তৈরী করার নির্দেশ দিতেন এবং সেমতে তা তৈরী করে রোগীদের খাওয়ানা হতো।" –যাদুল মাআদ

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর অপর এক বর্ণনা ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قِيْلَ لَهُ إِنَّ فُلَانًا وَجِعٌ لَا يَطْعَمُ الطَّعَامَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالتَّلْبِيْنَةِ فَحَسُوْهُ إِيَّاهَا وَيَقُوْلُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ إِنَّهَا تَغْسِلُ بَطْنَ أَحَدِكُمْ كَمَا تَغْسِلُ إِحْدَاكُنَّ وَجْهَهَا مِنَ الْوَسَخِ ـ

"কেউ যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ সংবাদ নিয়ে আসত যে, অমুক ব্যক্তির পেটে অসুখ, খানা পিনা গ্রহণ করছে না। তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিতেন 'তাকে তালবিনা (জবের দালিয়া) তৈরী করে খাওয়াও।" অতঃপর তিনি বলতেন, আল্লাহ্র কছম। এটা তোমাদের পেটকে এমনভাবে পরিষ্কার করে যেমনভাবে কোন ব্যক্তি স্বীয় চেহারা ময়লা হতে পরিষ্কার করে থাকে।" –যাদুল মাআদ, মুসতাদরাকে হাকেম

বুখারী এবং মুসলিম শরীফের বর্ণনাঃ কোন বাড়িতে কারো আকস্মিক মৃত্যু হলে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) তালবিনার বুন্দিয়া রান্নার জন্য নির্দেশ দিতেন। সেমতে তালবিনা পাকানো হত, আর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) নিজ হাতে গোস্ত ও রুটির টুকরা এক সাথে মিশিয়ে সরীদ তৈরী করতেন এবং সরীদের মধ্যে তালবিনা মিশিয়ে বলতেন, "তোমরা এটা খাও।" কারণ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তালবিনা রোগীদের মনে শান্তি আনে এবং মৃত্যু শোক দূর করে। –যাদুল মাআদঃ ২য় খন্ড, মুসতাদরাকে হাকেম।

আমাদের দেশে মৃত ব্যক্তির জন্য শোক পালনকালে খিচুরী, রুটি ও পিঠা পাকানোর প্রচলন রয়েছে। আর এটা সাধারণতঃ মাইয়্যেতের কোন নিকট আত্মীয় স্বজন নিজেদের পক্ষ হতে নিয়ে আসে। তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত খাদ্য হলো তালবীনা ও সরীদ। এটা একদিকে যেমন খাদ্য অপর দিকে শোকের প্রতিষেধকও বটে।

ইসতেসকা (সৌথ বা দেহে পানি আসা) রোগের জন্য অপারেশন

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা সংক্রান্ত হাদীসসমূহ পাঠকালে খুবই আশ্চর্যকর এবং গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের সন্ধান মিলে। বিশেষ করে এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হেকিমী বিষয় এবং চিকিৎসার প্রতি আগ্রহীই ছিলেন না বরং এ শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায়ও অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের উপকারিতায় বিশ্বাসী ছিলেন ঠিকই তবে রোগ এবং এর চিকিৎসা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত বলেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই শিক্ষার ফলেই মুসলিম জাতি রোগের চিকিৎসা গ্রহণ না করে সবকিছুই ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেয় না।

এ সম্পর্কে হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ)-এর বর্ণনা লক্ষ্য করুন ঃ

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ طَبِيْبًا اَنْ يَّبُطَّ بَطْنَ رَجُلٍ اَجْوَى الْبَطْنِ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসতেস্‌কা বা সৌথ রোগ গ্রস্থ এক রোগীর চিকিৎসককে হুকুম করলেন, "তার পেটে সেগাফ (অর্থাৎ অপারেশন) কর।"

অতঃপর কেউ আরয করলেন–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هَلْ يَنْفَعُ الطِّبُّ؟ قَالَ الَّذِىْ اَنْزَلَ. الدَّاءَ اَنْزَلَ الشِّفَاءَ فِيْمَاشَاءَ ـ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! চিকিৎসা কি উপকারে আসে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, যিনি রোগ দিয়েছেন, তিনি প্রতিষেধক দিয়েছেন। তিনি যে কোন জিনিসের মাধ্যমে ইচ্ছা মুক্তি দেন।"

–যাদুল মাআদঃ খন্ড ঃ ২

ইসতেস্‌কার বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। তন্মধ্যে এক প্রকার হলো ইসতেসকায়ে ঝাকি। এই প্রকার ইসতেসকা বা সৌথ রোগীর চিকিৎসার জন্য অপারেশন করা হয়। উপরোক্ত বর্ণনায় এটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখিত ব্যাধির বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কেও ধারণা ছিল। শুধু তাই নয়, রোগের কোন্ পর্যায়ে কি ধরনের চিকিৎসা প্রয়োজন এটাও জানা ছিল।

ফোঁড়ার অপারেশন

আধুনিক যুগে অস্ত্রোপচার বিদ্যার অশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছে সত্য, তবে এ কথার অর্থ এই নয় যে, এ শাস্ত্রের উদ্ভবও এ যুগেই হয়েছে অথবা পাশ্চাত্য কোন দেশ এটার উদ্ভাবক। বরং আমদের পূর্বসূরী মনীষীগণও এ শাস্ত্রে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন। বর্তমান সময়ে হার্ট ও মস্তিষ্কের মত জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পর্যন্ত অপারেশন হচ্ছে। তবে একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আল্লাহ পাকের ফযল ও করমে আগেকার দিনে মানুষের স্বাস্থ্যের এত দুরাবস্থা ছিল না। এবং এখনকারমত জটিল ব্যাধিও তখন সচরাচর দেখা যেত না। কারন তখন খাদ্য ছিল নির্ভেজাল, স্বভাব চরিত্র ও অভ্যাস ছিল সুন্দর। মেজাজ ছিল উত্তম, আর স্বাস্থ্যও ছিল যথোপযুক্ত। মোটকথা সে যুগের চাহিদানুযায়ী অস্ত্র চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিপূর্ণ উন্নত ছিল।

এ ব্যাপারে হযরত আলী (রাযিঃ)-এর বর্ণনা উল্লেখযোগ্য, তিনি বলেন–

دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رَجُلٍ يَعُوْدُهُ بِظَهْرِهِ وَرَمٌ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ بِهٰذِهِ مِدَّةٌ ـ قَالَ بُطُّوْا عَنْهُ قَالَ عَلِيٌّ فَمَا بَرِحْتُ حَتّٰى بُطَّتْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ ـ

"এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখার জন্য আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। সে ব্যক্তির কোমর ফোঁড়ার কারণে ফোলা ছিল। লোকেরা বলতে লাগল এতে পুঁজ হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ফোঁড়া সেগাফ (অপারেশন) করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, আমি তৎক্ষণাৎ সেগাফ করে ফেললাম এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন।"

–যাদুল মাআদঃ খন্ড ঃ ২

"হযরত আলী (রাযিঃ)-এর উক্ত বর্ণনায় বুঝা যায় যে, তিনি সেগাফ করে ছিলেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। অন্যথায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন জটিল কাজ সমাধা করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দিতেন না। কারণ অস্ত্রোপচার (Surgery) বাচ্চাদের খেলনা নয় যে, প্রত্যেকে এটা করতে পারবে বা যে কোন লোকের দ্বারা এ কাজটি সম্পন্ন করান যাবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জখমে চিকিৎসা

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَأَلَهُ النَّاسُ بِاَيِّ شَيْءٍ دُوْوِىَ جُرْحُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى ا للّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَابَقِىَ اَحَدٌ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ كَانَ عَلِىٌّ يَجِئُ بِتُرْسِهِ فِيْهِ مَاءٌ وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ وَاُخِذَ حَصِيْرٌ فَاُحْرِقَ فَحُشِىَ بِهِ جُرْحُهُ ـ

"হযরত সাহল ইবনে সায়াদ সায়ীদী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জখমের চিকিৎসা কি দিয়ে করা হয়েছিল? তিনি জবাবে বললেন, এ সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক পরিজ্ঞাত কোন ব্যক্তি অবশিষ্ট নাই।" (অতঃপর বলতে লাগলেন) হযরত আলী (রাযিঃ) তাঁর ঢালে পানি নিতেন এবং হযরত ফাতিমা (রাযিঃ) তাঁর চেহারা মোবারক থেকে রক্ত মুছতেন। অতঃপর একটা চাটাই জ্বালান হল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষতস্থানে চাটায়ের ছাই লাগিয়ে দেওয়া হল।" –বুখারী শরীফ

ইসলামের ইতিহাসে এটা একটা প্রসিদ্ধ ঘটনা যে, ওহুদের যুদ্ধে কাফেরদের প্রস্তরাঘাতে দোজাহানের বাদশাহ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দন্ত মোবারক শহীদ হয়। কপাল মোবারক জখমী হয়। আহ্! তখন কতইনা হৃদয় বিদারক দৃশ্য ঘটেছিল! বিশ্ববাসীর যিনি রহমত হয়ে এসেছিলেন সেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেররা আহত করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে।

পরবর্তী সময় এঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে শুধু এ হাদীসের রাবী হযরত সাহল ইবনে সাআদ সায়ীদী (রাযিঃ) জীবিত ছিলেন। তাই প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তিনি স্বীয় জুবানে এ ঘটানাকে এভাবে প্রকাশ করেছেন। হযরত আলী (রাযিঃ) তাঁর ঢালে করে পানি ভরে আনেন। আর হযরত ফাতিমা (রাযিঃ) তাঁর মোবারক হাতে নিজে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করেন। কিন্তু তাঁরা দেখলেন এতে রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছে না। অতঃপর হযরত ফাতিমা (রাযিঃ) চাটাইয়ের একটা টুকরা নিয়ে তাতে আগুন দিলেন। যখন এটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল তখন ছাই ভস্ম জখমের মুখে ভরে দিলেন। এতে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়।

–বুখারী, মুসলিম, সুনানে আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, আহমদ

পাট এবং চাটাই পোড়া ছাই যখমের ক্ষত ও প্রবাহিত রক্ত বন্ধ করার একটি অতি উত্তম ও সহজ চিকিৎসা। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরীক্ষিত এই ব্যবস্থা আজও পল্লীগ্রামে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

নিউমোনিয়ায় যায়তুনের চিকিৎসা

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ

"হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) 'যাতুল যাম্ব' অর্থাৎ ফ্লুরিসি বা পাঁজরের ব্যথাজনিত রোগে যায়তুন এবং অরসের উপকারিতার প্রশংসা করতেন। –তিরমিযী, মিশকাত শরীফ

"অরস" ইয়ামন দেশে উৎপাদিত হলুদ বর্ণের এক প্রকার ঘাস। এতে সামান্য সুঘ্রাণ এবং তিক্ততা থাকে। কাপড় রঞ্জিত করার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (ইমতিহানুল আতিব্বা) কোন কোন লোক 'অরস' দ্বারা "যাফরান" বুঝিয়ে থাকেন, এটা ঠিক নয়।

'যাইত' দ্বারা উদ্দেশ্য যায়তুন, যাকে ইংরেজীতে অলিভ (OLIVE) বলা হয়। এর পুষ্ট পাকা ফল থেকে তৈল বের হয়। যাকে আমরা রওগণ বলে থাকি। এ তৈল আরবীতে যায়তুন তৈল এবং ইংরেজীতে অলিভ অয়েল নামে পরিচিত। রং সবুজাভাব হলুদ হয়ে থাকে। যায়তুনের আলোচনা সম্ভবত সকল আসমানী সহীফায় এসেছে। তাওরাত এবং ইঞ্জিল ছাড়াও আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ কিতাব কুরআন মজীদেও এর আলোচনা এসেছে।

যেমন কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ

প্রাচীন এবং আধুনিক চিকিৎসকগণ যায়তুন তেলের অশেষ প্রশংসা করেছেন এবং এটাকে ত্বক সিক্ত ও সতজেকারী হিসাবে সকলেই মেনে নিয়েছেন।

ঠান্ডাজনিত ব্যথা, দুর্বল শিশু ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তি বর্ধনে এ তৈল খুবই উপকারী। যায়তুনের তৈল কুষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, হাতের পাঞ্জা প্রশস্ত করে, শরীরের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সর্বোপরি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যথা উপশম করে। ত্বকাচ্ছাদন প্রদাহ বা চুলকানির জন্যও আরামদায়ক।

এটা শূলবেদনা এবং নাড়ীর বেদনারও মহৌষধ। সর্বোপরি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই যার গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন তার উপকারিতা সম্পর্কে আর কি সন্দেহ থাকতে পারে।

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ঃ

تَدَاوُوادَوَا ء مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِى وَالزَّيْتِ

"হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা পাঁজরের ব্যথাজনিত রোগে কুস্তেবহরী এবং যায়তুন তৈল দ্বারা চিকিৎসা নাও।"

–ইবনে মাজাহ, আহমদ ও হাকেম

সফরজাল বা বিহিদানা

সফরজালকে ফারসী ভাষায় বাহ, উর্দূতে বাহি আর ইংরেজীতে কাওন্স (QUINCE), এবং বাংলায় বিহিদানা বলা হয়। এটা বহুল পরিচিত এবং টকমিষ্টি বিশিষ্ট একটা ফল।

বিহিদানা দিয়ে শরবত, রস এবং মোরব্বা তৈরী করা হয়। এটা দেহের শক্তিবর্ধক ও চিত্তের জন্য আনন্দদায়ক। পেট, যকৃৎ ও মন-মস্তিষ্ক সতেজকারী। হৃৎ কম্পন, যকৃৎ দাহ ও মানসিক দুর্বলতায় উপকারী। পিপাসা ও বমনের ক্ষেত্রে প্রশান্তিদায়ক। –(কিতাবুল মুফরাদাত) ঃ পৃঃ ১১২

সফরজাল সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী–

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِيَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ فَقَالَ دُونَكَهَا يَا طَلْحَةُ فَإِنَّهَا تَجِمُّ الْفُؤَادَ ـ

(১) "হযরত তালহা ইবনে উবাইদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, 'আমি একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হই, এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্ত মোবারকে একটা আমলকী বিহিদানা ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দানাটি দেখিয়ে বললেন, হে তালহা ! এটা নিয়ে নাও, নিঃসন্দেহে এটা চিত্ত সতেজকারী।" –ইবনে মাজাহ, যাদুল মাআদ

(২) এ হাদীসটিই অন্য সনদে নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

فَإِنَّهَا تَشُدُّ الْقَلْبَ وَتَطِيبُ النَّفْسَ وَتُذْهِبُ بِطْخَاءَ الصَّدْرِ ـ

"নিশ্চয়ই এটা (বিহিদানা) ক্বলবের শক্তি বৃদ্ধি করে, মন প্রশান্ত করে এবং দম বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্বাস কষ্ট দূর করে।" –নাসায়ী শরীফ

অন্য এক বর্ণনায় আছে–

وَيَجْلُوا الْفُؤَادَ

অর্থাৎ এটা মনকে স্বচ্ছ করে। –মুজামুল কাবীর, তাবরানী

আজওয়া খেজুর বিষের মহৌষধ

খেজুরের স্বভাব তীব্র গরম। এ কারণে এটাকে নাতিশীতোষ্ণ ফল বলা হয়। খেজুরের মধ্যে প্রচুর খাদ্যোপাদান রয়েছে। এটা তাজা রক্ত উৎপন্নকারী, হজমশক্তি বর্ধক। যকৃৎ ও পাকাশয় সুস্থ্য রাখে এবং কামশক্তি বৃদ্ধি করে। শরীরকে মোটা করে এবং মুখের অর্ধাঙ্গ রোগ, পক্ষাঘাত এবং এ ধরনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশকারী রোগের জন্য খুবই উপকারী।

খেজুরের বীচিও রোগ নিরাময়কারী। এটা পাতলা পায়খানা বন্ধ করে। পোড়া খেজুর বীচির চূর্ণ প্রবাহিত রক্ত বন্ধ করে এবং ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে। এই চূর্ণ মাজন হিসাবে ব্যবহার করলে দাঁত পরিষ্কার হয়।

–কিতাবুল মুফরাদাত ঃ খাওয়াসসুল আদোবিয়াহ ঃ পৃঃ ৩৮৮

খেজুর পেটের গ্যাস, শ্লেষ্মা, কফ দূর করে। শুষ্ক কাশি এবং এজমা রোগে উপকারী। সিহ্হত ও যিন্দেগীঃ পৃঃ ১২৪

খেজুরের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। এ গুলোর রং আকার আকৃতি এবং স্বাদ যেমন ভিন্ন তেমনি এগুলির ক্রিয়াও ভিন্ন। যেমন আম্বরী (উত্তম ধরনের খেজুর), বরনী, জাবী, জালী কালমাহ্, শাকাবী, আজওয়া, ও সুখখাল্ (এই প্রকার খেজুরের শুধু বীচিই কাজে লাগে) ইত্যাদি।

আজওয়া ঃ এ খেজুর মধ্যম আকৃতি বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এর ঘনত্বও মধ্যম ধরনের এবং রং কালচে বর্ণের হয়। এই খেজুর সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

১– وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِّنَ السَّمِّ

"আজওয়া জান্নাতের ফল। এর মধ্যে বিষের নিরাময় রয়েছে।"

–তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ

আল্লাহর কি শান! এটা খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনি রোগ নিরাময়েরও প্রতিষেধক। তাছাড়া এতে প্রচুর খাদ্যোপাকরণ এবং অন্যান্য ফায়দা রয়েছে।

আজওয়া খেজুর দিলের ঔষধ

আজওয়া অতি উন্নত পর্যায়ের খেজুর ও তৃপ্তিদায়ক। আজওয়া এবং অন্যান্য খেজুর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এ অধ্যয়ের পূর্বে দেওয়া হয়েছে। এখানে আজওয়া খেজুর সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো কয়েকটি বাণী পাঠ করুন। হযরত সায়ীদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেনঃ

مَرِضْتُ مَرَضًا فَاتَانِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِىْ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثُدْيَىَّ حَتّٰى وَجَدْتُّ بَرْدَهَا عَلٰى فُؤَادِىْ وَقَالَ اِنَّكَ رَجُلٌ مَفْؤُدٌ اِئْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلْدَةَ اَخَا ثَقِيْفٍ فَاِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ فَلْيَاخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِّنْ عَجْوَةِ الْمَدِيْنَةِ فَلْيَجَاهُنَّ بِنَوَاهُنَّ ثُمَّ لِيَلُدَّكَ بِهِنَّ ـ

"একদা আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে তাশরীফ নিয়ে এলেন। তিনি স্বীয় হস্ত মোবারক আমার বুকের উপর রাখলেন। তাঁর পবিত্র হাতের শীতলতা আমার অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি অন্তরে কষ্ট অনুভব করছ। তুমি হারেস ইবনে কালদাহ সাক্বিফীর নিকট যাও। কারণ সে একজন চিকিৎসক। সে যেন মদীনার সাতটি আজওয়া খেজুর নিয়ে বীচসহ পিশে তোমার মুখে ঢেলে দেয়।" –আবূ দাঊদ, মিশকাত

مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ

"হযরত সাআদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে সে দিন বিষ এবং যাদু তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" –বুখারী শরীফ

বরনী খেজুর

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ تَمَرَاتِكُمُ الْبَرْنِىُّ يُخْرِجُ الدَّاءَ وَلَا دَاءَ فِيْهِ

"হযরত আবূ সায়ীদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের খেজুরগুলির মধ্যে সর্বোত্তম খেজুর হলো বরণী। এটা রোগ নিরাময় করে এবং এতে কোন রোগ ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নাই।" –মুসতাদরাকে হাকিম

উল্লেখিত বর্ণনাটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। পূর্ণ হাদীসের বিষয়বস্তু নিম্নরূপঃ একদা হজর নামক স্থানে কিছু লোক একটা প্রতিনিধি দলের আকারে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়। কথা প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এলাকার খেজুরের নামের এক বিরাট ফিরিস্তি বর্ণনা করতে লাগলেন।

তখন তাদের মধ্যেকার এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসুল! আপনার উপর আমার মাতা পিতা কুরবান হোক, আপনি যদি হজরে অর্থাৎ আমাদের এলাকায় জন্ম গ্রহণ করতেন তথাপি এর চেয়ে বেশী নাম জানতেন না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল। অন্যথায় আপনি আমাদের এলাকার এত খেজুরের নাম জানতে পারতেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার সামনে এই মাত্র তোমাদের দেশের সমস্ত ভূখণ্ড তুলে ধরা হয়েছে এবং আমি এর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দেখে নিয়েছি। তাই বুঝতে পারলাম তোমাদের এলাকায় খেজুরের মধ্যে বরণী খেজুরই সর্বোত্তম খেজুর। এটা রোগ নিরাময় করে এবং এতে কোন রোগ বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় না।

বরণী খেজুর একেবারে কালো না হয়ে সামান্য লালিমা মিশ্রিত কালো রংগের হয়ে থাকে। এ খেজুরের আকার বড় এবং খুবই মিষ্টি। শাঁস অধিক এবং বীচি ছোট হয়। এ কারণে সকলেই এই খেজুর বেশী পছন্দ করে থাকে। আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খেজুরকে রোগের ঔষধ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

অর্শ এবং গেটে বাতে আনজীর বা বিলাতি ডুমুর

اُهْدِىَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَبَقٌ مِنْ تِيْنٍ فَقَالَ لِاَصْحَابِهٖ كُلُوْا فَلَوْ قُلْتُ اِنَّ فَاكِهَةً نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ بِلَاعَجَمٍ لَقُلْتُ هِىَ التِّيْنُ وَاِنَّهٗ يَذْهَبُ بِالْبَوَاسِيْرِ وَيَنْفَعُ النِّقْرِسَ

"একদা হাদিয়া হিসেবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক থাল আনজীর আসলে তিনি সাহাবাদের বললেন, খাও। আমি যদি বলতাম যে জান্নাত থেকে ফল এসেছে; তবে আমি নিশ্চয়ই বলতাম যে এটা হল আনজির। এটা অর্শ্বরোগ দূর করে এবং গেটে বাতের ব্যথার জন্য উপকারী।"

–মিশকাত শরীফ

যেমন পবিত্র কুরআনে ত্বীন নামক একটি সতন্ত্র সূরা রয়েছে। তেমিন ভাবে ইঞ্জীলের বিভিন্ন বর্ণনায় আনজিরের আলোচনা এসেছে। উদাহরণতঃ। ইরমিয়াহ অধ্যায় ঃ ২৪, ও মতি অধ্যায় ঃ ২১ ইত্যাদি। আনজির ফল, খাদ্য এবং ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। শাম ও ফিলিস্তিনে এ গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। শামবাসীদের জন্য এটা একটা লাভজনক অর্থকরি ফসল।

আখেরী নবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনজিরকে জান্নাতের ফল এবং গেটে বাত ও অর্শ্বরোগ এই দুই ব্যাধির ঔষধ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

ছোট অস্থিসন্ধির ব্যথাকে নকরস বলে। যা খুবই কষ্টদায়ক হয়ে থাকে; এটাকে দাউল মাফাসিল বা Gout গেটে বাত বলা হয়। বাওয়াসির বা অর্শ্বরোগ দুই প্রকার হয়ে থাকে। (১) খুনি বা রক্ত প্রবাহকারী (২) বাদি বা পেটের গ্যাস নির্গমনকারী।

আমাদের দেশের হেকিম এবং চিকিৎসকগণ যদি এ যমানায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা পদ্ধতিকে অনুসন্ধান করে সে মতে এ জরাক্লিষ্ট দুঃখী মানুষদের চিকিৎসা করে শান্তি পৌছাত তবে কতইনা উত্তম হতো!

অধ্যায় ঃ ৫

রোগ এবং রূহানী চিকিৎসা

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের একটা মৌলনীতি হল এই যে, মানুষের অন্তরে যখন শান্তি লাভ হয় তখন দেহের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির শক্তিও কয়েকগুণ বেড়ে যায়। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তি শারীরিক সুস্থতার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। যার ফলে মানুষের শুধু প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার বিক্ষিপ্ততা এবং চিন্তার ভিড় থেকে নিঃস্কৃতি লাভ হয় না বরং শারীরিক দিক দিয়েও মানুষের শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান যুগের মানুষ বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগত দুষিত ও বিকৃত ধ্যান-ধারণার এমনভাবে শিকার হয়ে পড়েছে যার ফলে শান্তির মহৌষধ এবং ঘুমাবার পিলও তাদের কোন কাজে আসছে না।

বস্তুতঃ প্রকৃত আরোগ্য শুধুমাত্র বাহ্যিক বস্তুসমূহে অন্বেষণ করাই তাদের বঞ্চিত হওয়ার প্রধান কারণ। সুস্থতা নিশ্চয়ই একমাত্র আল্লাহর হাতে ।

যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেছেন ঃ

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ

এবং আমি অসুস্থ হয়ে গেলে তিনিই আমাকে সুস্থতা দান করেন।

–সুরা শুআরা ঃ আয়াতঃ ৮

এ ব্যাপারে সর্বোত্তম পন্থা হল ঔষধের সাথে সাথে দুআ করা। তাই বেশী করে আল্লাহর স্মরণ করা এবং আল্লাহর প্রতি রুজু হওয়া উচিত।

এ অধ্যায়ে আমি পবিত্র কোরআনের কিছু আয়াতে শেফা এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় দোআ পেশ করছি। পবিত্র কোরআন ঝাড়ফুঁক এবং তাবীজ তুমারের কিতাব নয় বটে। কিন্তু নিঃসন্দেহে এটা সকল রোগের অব্যর্থ শেফার কিতাব।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

"আমি কুরআনে এমন জিনিস নাযিল করেছি যা ঈমানদারদের জন্য শেফা ও রহমত। – সূরা বনী ইসরাঈলঃ আয়াত ঃ ৮২

হাদীস বিশারদগণ তাদের প্রায় সকল গ্রন্থেই 'তিব্বে নববী" শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সংকলন করেছেন। অতএব যদি কুরআনের মত আরোগ্যদানকারী কিতাবের দ্বারাও কারো আরোগ্য হাসিল না হয় তবে তার স্বীয় গুনাহসমূহ থেকে তওবা করা উচিত এবং যাবতীয় শুবা সন্দেহ ও সংশয় থেকে মুক্তিলাভ করা একান্ত কর্তব্য। কারণ প্রবাদে আছে যে, ভক্তিতে মুক্তি মিলে তর্কে বহু দুর। সাথে সাথে একথাও স্মরণ রাখা চাই যে, যদি তাকে বাহ্যিক রোগ থেকে মুক্তি দেওয়া সকল রোগের আরোগ্যদাতা মহান আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রেত না হয় তাহলে এতটুকু সৌভাগ্যই বা কম কিসের যে, এই রোগের অসিলায় আল্লাহ্ তাকে স্বীয় নৈকট্য দান করবেন। এবং রোগ অসিলা করে আল্লাহর দরবারে তার দুআ ও কাকুতি মিনতি চলতে থাকলো।

সত্য কথা তো এই যে, যে মালিকের সাথে তার গোলামের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়, তার আর অন্য কারো প্রতি ভরসা করার প্রয়োজন থাকে না। এই সম্পর্ক স্থাপনের সবচেয়ে কার্যকর, প্রভাবশালী ও নিশ্চিত পন্থা হল দুআ।

বর্তমান অধ্যায়ে সংযোজিত দুআসমূহের বেশীর ভাগ দুআই শায়খ আবুল আব্বাস সুরজী (রহঃ)-এর "আল ফাওয়ায়েদ" ও হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ)-এর "আল ক্বাওলুল জামিল" গ্রন্থদ্বয় হতে ডাক্তার ওয়ালী উদ্দীন (রহঃ) কৃত "বিমারী আওর উসকা রূহানী এলাজ" গ্রন্থের হাওয়ালায় উদ্ধৃত করা হল।

নামাযে শেফা বা আরোগ্য রয়েছে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ فِى الصَّلٰوةِ شِفَاءً

"নিশ্চয়ই নামাযে শেফা ও আরোগ্য রয়েছে।" – ইবনে মাজাহ

নামায যাবতীয় আত্মিক ও দৈহিক রোগ-ব্যাধির শেফা ও আরোগ্য দান করে। এখানে আমরা পাকিস্তানের বিখ্যাত হৃদরোগ চিকিৎসক ডাক্তার মুহাম্মদ আলমগীর খানের গবেষণার সারাংশ উপস্থাপন করছি। তার এই গবেষণার দ্বারা হুযুর পাক (সাঃ)-এর উপরোক্ত বাণীর ব্যাখ্যা হয়ে যায়। তবে ব্যাখ্যা এজন্য নয় যে তাঁর কোন বাণী সত্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। বরং রাসূল (সাঃ)-এর বাণী সতত মহিয়ান ও পরম সত্য। তাঁর বাণীর যত ব্যাখ্যাই করা হোক তাও অতি নগণ্য হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করে দিয়ে আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন। নামায একদিকে আত্মিক উন্নতিদান করে এবং মন্দ ও অশ্লীলতা থেকে বের করে এনে পাক পবিত্র জীবন দেয়। অপরদিকে দৈহিক সুস্থতার জন্যও নামাযের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মানুষের বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে তার দেহের কোল্যাষ্টোল (CHOLESTEROLF) চর্বির দ্বারা দেহের শিরাগুলি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে। এই ক্ষীণতার কারণে অসংখ্য রোগ-ব্যাধি দেখা দেয়। যেমন, ব্লাড প্রেসার, অর্ধাঙ্গ, হৃদরোগ, বৃদ্ধতা, হজম মন্দা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

এই চর্বির স্ফীতি রোধ করার সর্বোত্তম পন্থা হলো ব্যয়াম। যা নামাযের মাধ্যমে অতি উত্তমভাবে পুরা হয়ে যায়। এ জন্যেই নামাযী ও শ্রমিক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে এই রোগ-ব্যাধিগুলি তুলনামূলক খুবই কম হয়ে থাকে।

এবার নামাযের হিকমতপূর্ণ তরতীবের বিষয়টি লক্ষ্য করে দেখুন। যখন পেট খালী থাকে তখন নামাযের রাকআত সংখ্যাও কম থাকে। যেমন ফজর, আসর ও মাগরিবের সময় নামাযের রাকাআত সংখ্যা কম। কিন্তু খাওয়ার পর যোহর ও ঈশার নামাযে রাকাআতের সংখ্যা বেশী। কেননা, খাওয়ার দ্বারা চর্বির বৃদ্ধি ঘটে। রমযানুল মুবারকে মাগরিবের পর বেশী খাওয়া হয় তাই ইশার সময় তারাবীর নামাযে রাকাআতের সংখ্যা বেশি। এভাবে নামায রূহানী বরকতের সাথে সাথে একটি সামঞ্জস্যশীল দৈহিক ব্যয়ামও হয়ে যায়। এটা শরীরের রক্ত ঘন ও ঘাড় না হওয়ার কারণ হয়ে যায়।

(৩) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নামায পড়ে দেখিয়েছেন এবং যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন আমরা যদি ঠিক সেইভাবে যথাযথ নামায আদায় করি তাহলে শরীরের এমন কোন অঙ্গ বাকী থাকে না যার ব্যয়াম এমনিতেই উত্তম পদ্ধতিতে হয়ে যায় না। যেমন ঃ

তাকবীরে উলাঃ তাকবীরে উলা অর্থাৎ নিয়ত বাঁধার জন্য যখন কনুই পর্যন্ত হাত কাঁধ বরাবর উত্থোলন করা হয় তখন স্বাভাবিক ভাবেই রক্ত সঞ্চালনের তীব্রতা বেড়ে যায়।

কিয়ামঃ অর্থাৎ দাঁড়ানোর অবস্থায় হাত বেঁধে রাখার সময় কনুই থেকে কব্জি ও আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত হাত ব্যবহৃত হয়। এতে রক্তের চলাচল তীব্র হয়।

রুকুঃ রুকুর সময় হাঁটু কনুই কব্জি এবং কোমরের সবগুলি জোড় প্রবলভাবে ঝাকুনী দেয়।

সেজদাঃ সেজদার অবস্থায় হাত পা পেট পিঠ কোমর রান ও শরীরের সবগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়ায় নাড়া পড়ে এবং টানটান অবস্থায় থাকে। সেজদারত অবস্থায় মেয়ে লোকদের বুক রানের সাথে মিশে থাকে। এতে তাদের বিশেষ অভ্যন্তরীণ রোগ-ব্যাধির উপশম হয়। এতদ্ব্যতীত সেজদার সময় রক্ত মস্তিষ্ক পর্যন্ত সঞ্চালিত হয়। যা সুস্থতার জন্য একান্ত আবশ্যকীয়।

তাশাহহুদঃ এই অবস্থায় কোমর থেকে পা পর্যন্ত রগগুলি টানটান হয়ে থাকে। একদিকে থাকে টাখনো ও পায়ের অন্যান্য জোড় এবং অন্যদিকে থাকে কোমর ও গর্দানের জোড়াগুলি।

সালামঃ সালাম ফেরানোর সময় গর্দানের দুই দিকের জোড়াগুলিই কাজ করে এবং গর্দান ঘুরানোর সময় রক্ত সঞ্চালন তীব্র হয়।

(৪) নামাযের এই নড়াচড়াগুলির দ্বারা একটি উত্তম ব্যায়াম হয়ে থাকে। নামাযের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার কারণে কুদরতী ভাবে ব্যায়ামের মধ্যেও একটি সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়। অন্যান্য ব্যায়ামের মত এতে কোন শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হয় না।

উত্তম পন্থায় রক্ত সঞ্চালিত হওয়ার কারণে হৃদযন্ত্র সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ থাকে। এতে না তো রক্ত ঘন হয়ে যায় আর না রক্তের সঞ্চালনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। 'হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথার্থই বলেছেন, "মানুষের দেহে একটি গোশত পিন্ড আছে। তা যতক্ষণ সুস্থ থাকে ততক্ষণ সমগ্র শরীরই সুস্থ থাকে। আর যখন তা খারাপ হয়ে যায় তখন সারা দেহই খারাপ হয়ে যায়। সাবধান! খুব মনে রেখো! সেই গোশত পিন্ডটা হল মানুষের অন্তর বা কলব।"

–মুসলিম ও নাসায়ী শরীফ

জামাআতে নামায পড়ার জন্য বারবার মসজিদে উপস্থিতি এবং বাড়ী থেকে মসজিদ ও মসজিদ থেকে বাড়ীতে যাওয়া আসা করা এবং এ বিষয়ে গুরুত্বের জন্য অতিরিক্ত সচেতনতা আত্মা ও দেহ উভয়ের জন্যই অশেষ কল্যাণকর ও বরকতময়।

(৫) আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার পর আমরা দেহের তথ্য ও অবস্থা এবং রোগ-ব্যাধির বিষয়ে অবগত হতে পেরেছি। কিন্তু মানবজাতির মহান পথপ্রদর্শক চৌদ্দশ বছর আগেই আমাদরেকে এমন এক জীবন ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন যা সর্বময় রহমত বরকত ও কল্যাণে ভরপুর।

রোগ-ব্যাধি ও দুআ দরূদ

পূর্বে আমরা দুইটি হাদীস উদ্ধৃত করেছি। যদ্বারা এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে আখেরী রাসূল (সাঃ) রোগে চিকিৎসার সাথে সাথে দুআও করতেন। বস্তুতঃ হযরত সাহাবায়ে কেরামগণের আমলও এরূপই ছিল। তাঁরা না চিকিৎসা বর্জন করাকে বৈধ মনে করতেন। আর না চিকিৎসার উপর ভরসা করে মহান আল্লাহকে ভুলে যেতেন।

এ পর্যায়ে আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের একটি ঘটনা পেশ করছি।

হযরত উসমান গনী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একদা আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার ব্যথার অভিযোগ করি। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, শরীরের যে জায়গায় ব্যথা হচ্ছে সেখানে হাত রাখ এবং ৩ বার বিসমিল্লাহ পড়। অতঃপর ৭ বার এই দুআটি পাঠ কর।

أَعُوذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আরো একটি ঘটনা লক্ষ্য করুন। তিনি বলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম। এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় হুযুর (সাঃ) তার হাল অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটি তার অসুখ ও কষ্টের কথা বলল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কালিমা শিখিয়ে দেবনা যদ্বারা যে কোন রোগ ও কষ্ট দূর হয়ে যায়? লোকটি আরয করল, অবশ্যই বলুন ইয়া রাসূলাল্লাহ! হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি এই দুআটি পাঠ করোঃ

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ـ

কয়েকদিন পর যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার এই রাস্তা দিয়ে যান তখন লোকটির অবস্থা ভাল ছিল। লোকটি আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে যে কালিমাগুলো শিখিয়ে দিয়েছিলেন আমি সর্বদাই এইগুলি পাঠ করি।

দম দরূদ

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ لِثَابِتٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَلَا اَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ بَلٰى ـ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَأْسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَا شَافِىَ اِلَّا اَنْتَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا

হযরত আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত সাবেত (রহঃ)কে বলেছেন আমি কি তোমাকে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দম দরূদ অর্থাৎ ঝাড়-ফুঁকের নিয়ম শিখিয়ে দেবো না? হযরত সাবেত বললেন,হ্যাঁ, অবশ্যই শিখিয়ে দেন। হযরত আনাস (রাযিঃ) বললেন, রোগ-ব্যাধির জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআ পাঠ করতেন।

"হে আল্লাহ! হে সকল মানুষের রব! কষ্ট দূর করুন। আরোগ্যদান করুন! আপনিই আরোগ্য দানকারী, আপনি ব্যতীত কোন আরোগ্য দানকারী নাই। আপনি আরোগ্যদান করুন যারপর আর কোন কষ্ট থাকবে না।" –বুখারী শরীফ

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটিও হযরত আনাস (রাযিঃ) এর বর্ণিত উপরোক্ত বয়ান ও আমলের সমর্থন করে। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেনঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعُوْدُ بَعْضَ اَهْلِهٖ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهِبِ الْبَأْسَ ـ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ ـ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

"হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পরিবারের কারো অসুখ হলে তাকে ইআদত করার সময় ডান হাত তার শরীরে ফেরাতেন এবং মুখে এই দুআ পাঠ করতেন। হে আল্লাহ! হে সকল মানুষের রব! কষ্ট দুর করে দিন। আরোগ্যদান করুন। আপনিই আরোগ্য দানকারী। আপনি ব্যতীত আর কেউ আরোগ্যদানকারী নাই। এমন আরোগ্য দান করুন, যার পর আর কোন কষ্ট না থাকে। – বুখারী শরীফ

এই ছিল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝাড়-ফুঁক। এটাকে প্রচলিত ঝাড়-ফুঁকের নামে নামকরণ করা কোন ভাবেই সঙ্গত নয়। কোন যাদু মন্ত্র নয়। বরং কয়েকটি দুআর শব্দাবলী যা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর

মুবারক মুখে আদায় করেছেন। আর রুগ্নের আরোগ্যের জন্য সকল রোগের আরোগ্যদানকারী মহান আল্লাহর দরবারে দুআ করেছেন।

প্রচলিত অনৈসলামিক ঝাড়-ফুঁক ও ফালনামার সাথে একজন প্রকৃত মুসলমানের দূরবর্তী সম্পর্কও থাকতে পারে না। এ ব্যাপারে বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসখানি লক্ষ্য করুন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"সত্তর হাজার এমন সৌভাগ্যশীল লোক রয়েছে যারা কোন হিসাব কিতাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরা হল সেই সব লোক যারা না ঝাড়-ফুঁক করে, না দাগ লাগায় আর না ফালনামায় বিশ্বাস করে বরং তারা স্বীয় পরওয়ারগিদারের উপর ভরসা রাখে।" – বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, আহমদ

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের উপরও একটু চিন্তা করুন। তিনি বলেনঃ

مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ دَاءٍ اِلاَّ وَقَدْ اَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ

অর্থাৎ "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ-ব্যাধি দেন নাই যার সাথে এর প্রতিষেধক নাযিল করেন নাই। তবে এর জ্ঞান যাকে দেওয়ার তাকেই দিয়েছেন। আর যাকে বে-খবর রাখার তাকে বে-খবরই রেখেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রোগেরই প্রতিষেধক সৃষ্টি করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রত্যেককে এর জ্ঞান দান করেন নাই।" – মুসতাদরাক

এস্তেখারার নিয়ম

যে ব্যক্তি স্বীয় মুসীবত অর্থাৎ রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি থেকে মুক্তি লাভের তরীকা ও পদ্ধতি অবগত হতে চায় সে যেন পাক-পবিত্র কাপড় পরিধান করে অযুসহ কেবলামুখী হয়ে ডান কাতে শয়ন করে ৭ বার করে সূরা শামস, সূরা লাইল এবং সূরা ইখলাস পাঠ করে। অপর এক রেওয়ায়াতে সূরা ইখলাসের পরিবর্তে সূরা ত্বীন–এর কথা এসেছে। অতঃপর এ দুআ পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اَرِنِىْ فِىْ مَنَامِىْ كَذَا وَكَذَا (مقصود كانام لے) وَ اجْعَلْ لِّىْ مِنْ اَمْرِىْ فَرَجًا وَّاَرِنِىْ فِىْ مَنَامِىْ مَا اَسْتَعْمِلُ عَلٰى اِجَابَةِ دَعْوَتِىْ۔

এটা আমলকারী অভিজ্ঞ উলামাদের পদ্ধতি। এতএব যদি সে যা জানতে চায় তা সে রাত্রেই স্বপ্নে দেখে তবে তো উত্তম। নতুবা ক্রমাগত ৭ রাত একইভাবে

এই আমল করতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ্ সপ্তম রাত পর্যন্ত সে অবশ্যই তার অবস্থা জেনে যাবে। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ)

এস্তেখারার অর্থ হল মঙ্গল অন্বেষণ করা অর্থাৎ মঙ্গল ও কল্যাণ প্রার্থনা করা। এটাকে না রমল বলে, আর না ফাল বলে। ররং এটা হল দয়াময় মাওলা পাকের নিকট নিজের জন্য কল্যাণ চাওয়ার একটা আকুতি। তিনিই সকল দুঃখী ও সহায়হীনের ভরসা ও আশ্রয়স্থল, তাঁরই নিকট স্বীয় কল্যাণ ও হেদায়াতের মিনতি পেশ করা উচিত।

সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার

(দারিদ্রবিমোচন ও প্রশস্ত রিযিকের জন্যে)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এস্তেগফারকে নিজের জন্য অপরিহার্য্য করে নিয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সকল অভাব অনটন ও দারিদ্র থেকে মুক্তি দেন এবং যে কোন চিন্তা ও পেরেশানী থেকে নাজাত দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। – আবূ দাউদ, নাসায়ী

যে কোন বালা-মুসীবত ও দুঃখ কষ্টের সময় দুইটি জিনিসই মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও পেরেশানী দুর করতে পারে। একটি হল অধিক পরিমাণে এস্তেগফার আর অপরটি হল সদকা-খয়রাত। হাদীস শরীফে বিভিন্ন এস্তেগফার বর্ণিত হয়েছে। এর যে কোন একটি পাঠ করাই যথেষ্ট। তবে বুখারী ও মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত সাইয়্যেদুল এস্তেগফারের বহু প্রশংসা উল্লেখিত হয়েছে।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَعَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّاۤ اَنْتَ ـ

হযরত আদম (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরয করেছিলেনঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

"হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। – সূরাহ্ আরাফ ঃ আয়াতঃ ২৩

ফাতেহাঃ সূরায়ে শেফা

পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরা ফাতেহাকে উলামাগণ সবচেয়ে মর্যাদাবান সূরা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এই সূরা ফাতেহাকে "আযমে সূআর" বা সূরা সমূহের মর্যাদাবান সূরা এবং 'কুরআনুল আযীম' নামে উল্লেখ করেছেন। স্বয়ং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ لِكُلِّ دَاءٍ

অর্থাৎ "সূরা ফাতেহা প্রত্যেক রোগের জন্য শেফা।"

সূরা ফাতেহার কয়েকটি বিশেষ আমল নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

আমল-১ ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম –এর শেষ অক্ষর "মীম" কে সূরা আলহামদুর সাথে মিলিয়ে ৪১বার পড়ুন এবং রোগীর উপর দম করুন। ইনশাআল্লাহ যে কোন ব্যথা ও রোগ ব্যাধি নিরাময় হবে।

আমল-২ ঃ ফজরের সুন্নত ও ফরয নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে সূরা ফাতেহাকে ৪১ বার বিসমিল্লাহ-এর সাথে মিলিয়ে পড়লে রুগ্ন ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করবে। বিশেষতঃ চোখের রোগ বিদুরিত হবে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণমুক্ত হবে। দুর্বল সবল হবে।

আমল-৩ ঃ ফজরের নামাযের পর ১২৫ বার সূরা ফাতেহা পাঠ করলে অবশ্যই মকসূদ ও উদ্দেশ্য হাসিল হবে। ইনশাআল্লাহ

আমল-৪ ঃ আল্লামা আহমদ দায়রবী (রহঃ) বলেন, শরীরের যে কোন জায়গায় ব্যথা হলে ব্যথার স্থানে হাত রেখে ৭ বার সূরা ফাতেহা পাঠ করবে এবং আল্লাহর নিকট আরোগ্যের জন্য দুআ করবে। ইনশাআল্লাহ রোগী আরাম পাবে। – ফতহুল মজীদ

হযরত আলী (রাযিঃ) ও এক বিশেষ তরতীব ও পদ্ধতিতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার তালক্বীন দিয়েছেন। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (রহঃ) ও এক খাস তরতীবে সূরা ফাতেহা পাঠ করার তরীকা বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী (রহঃ) ও সূরা ফাতেহা পাঠ করার এক বিশেষ নিয়ম পদ্ধতি বাতলিয়েছেন।

আমল-৫ ঃ মানুষ বাধ্য করা, কল্যাণ লাভ এবং অনিষ্ঠতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে সূরা ফাতেহা পাঠ অত্যন্ত উপকারী। তবে এই আমল কোন অবস্থাতেই অসৎ উদ্দেশ্যে করা যাবে না। তরতীবটি নিম্নরূপ ঃ

ফজরের নামাযের পর বিসমিল্লাহসহ শুরু করবে–

রবিবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ৬১৬ বার

সোমবার اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ৬১৯ বার

মঙ্গলবার مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ২৪২ বার

বুধবার اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ৮৫৬ বার

বৃহঃবার اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ১০৭৩ বার

শুক্রবার صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ৮৩৭ বার

শনিবার غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ৪২৩৩ বার

আমল-৬ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরা ফাতেহা বিষের ঔষধ। – দারেমী

আয়াতুল কুরসী

আয়াতুল কুরসী কুরআন মজীদের দ্বিতীয় সূরা, সূরা বাক্বারার দুইশত পঞ্চাশ নম্বর আয়াত। এই আয়াত অত্যন্ত বরকতময় ও মর্যাদাবান। হযরত উবাই ইবনে কাব (রাযিঃ)-এর রেওয়ায়াতে এই আয়াতকে "আযম আয়াতুল্লাহ বা আল্লাহর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। –মুসলিম। হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ)-এর রেওয়ায়াতে এটাকে "সাইয়্যেদু আয়াতুল কুরআন" বা কুরআনের আয়াত সমূহের সর্দার বলা হয়েছে। –তিরমিযী শরীফ

আমলঃ বমির উদ্রেকের জন্য লবণের ছোট ছোট ৭টি পুটলি বানিয়ে ৭ বার আয়াতুল কুরসী পাঠ করে দম দিন এবং সাতদিন সকালে রোগীর মুখে এগুলি ঢেলে দিন। ইনশাআল্লাহ্ বমির উদ্রেক থেকে আরোগ্য লাভ করবে।

এই আয়াত ১১ বার পাঠ করে মৃগী রোগীর উপর দম করলে খুবই উপকার পাওয়া যায়। কলিজা ব্যথা এবং হার্টের কম্পন দূর করার জন্য পাক বর্তনে তিনবার আয়াতুল কুরসী লিখে ধুয়ে রোগীকে পান করান। আল্লাহ চাহেন তো ফায়দা পাওয়া যাবে।

রোগ-ব্যাধি থেকে হিফাযত এবং যুগের ফেৎনা ফাসাদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লামা আবুল ইয়াসার (রহঃ)ও আল্লামা দায়রবী (রহঃ) তাদের স্ব স্ব কিতাবে এই আমল লিখেছেন যে, মুহাররম মাসের প্রথম রাতে বিসমিল্লাহ্সহ্

আয়াতুল কুরসী ৩৬০ বার পাঠ করে দুআ করবে এবং নিজের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট, বালা মুসীবতের জন্য আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতি করবে। ইনশাআল্লাহ সকল দুঃখ কষ্ট ও বালা মুসীবত দূর হয়ে যাবে।

উলামাগণ এই আয়াতে কারীমার অসংখ্য ফাযায়েল লিখেছেন। বিশেষতঃ রাতে ঘুমানোর আগে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে সীনায় দম করলে মানুষ দুঃস্বপ্ন, পেরেশান খেয়াল ও চুরি-চামারী থেকে নিরাপদ থাকে। করুণাময় আল্লাহ্ তার জান-মাল, পরিবার-পরিজন ও বাড়ী ঘরের হিফাযত করেন। কেননা, তিনিই তো সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা দানকারী। তিনিই সর্বোত্তম মাওলা ও সর্বোত্তম সাহায্যকারী। আর এ আয়াতে এই শিক্ষারই ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ -

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই, তিনি জীবিত ও সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পেছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন? তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না কিন্তু তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলিকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন কিছু নয়। তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান। – সূরা বাকারা ঃ আয়াতঃ ২৫৫

আল্লামা মুহাম্মদ আল জাযরী (রহঃ) বলেন, যে মাল বা সন্তানকে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে দম দেওয়া হবে অথবা লিখে মালের ভেতর ও সন্তানের গলায় রেখে দেওয়া হবে, শয়তান সেই মাল বা সন্তানের কাছেও পৌঁছতে পারবে না।

–হিসনে হাসিন

সূরা ইখলাস

রোগমুক্তির জন্য

সূরা ইখলাস পবিত্র কুরআনের একটি সংক্ষিপ্ত সূরা। এর ছোট্ট ছোট্ট পাঁচটি আয়াত রয়েছে। শব্দ সংখ্যা মাত্র পনেরটি। অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই সূরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যেই এই সূরাকে সুলুসে কুরআন বা কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। বহু উলামায়ে কেরামের অভিমত হল এই যে, যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে এই সূরা তেলাওয়াত করবে সে সামগ্রিক কল্যাণ লাভ করবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের প্রত্যেক অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকবে। আল্লামা বোনী (রহঃ) নিজের হাজত পুর্ণ হওয়া ও রোগ মুক্তির জন্য নিম্নোক্ত তরীকা উল্লেখ করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ اَحَدٌ لَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ اَحَدًا وَلَا تُحَوِّجْنِيْ اِلٰى اَحَدٍ وَاَغْنِنِيْ يَا رَبُّ عَنْ كُلِّ اَحَدٍ بِفَضْلٍ -

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ-اَللّٰهُ الصَّمَدُ-لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ - يَا مَنْ هُوَ قَدِيْمٌ وَّدَائِمٌ وَّيَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا اَوَّلُ يَا اٰخِرُ اِقْضِ حَاجَتِيْ يَا فَرْدُ يَا صَمَدُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ

আয়াতে শেফা

প্রত্যেক রোগের জন্য

কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত ছয়খানি আয়াতে কারীমাকে আয়াতে শেফা বা রোগ মুক্তির আয়াত বলা হয়। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) স্বীয় "শিফাউল আলীল" নামক কিতাবে এই আয়াতগুলির খুবই তারীফ করেছেন। এইগুলি কুরআনুল হাকীমের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আয়াত। বিসমিল্লাহ ও সূরা ফাতেহাসহ এই আয়াতগুলি পাঠ করে রুগ্ন ব্যক্তির উপর দম দিবে অথবা চীনা মাটির বাসনে লিখে পানির দ্বারা ধৌত করে রোগীকে পান করাবে। ইনশাআল্লাহ যে কোন রোগ আরোগ্য হবে।

ছয়টি আয়াত এই-

(١) وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ

(٢) وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ

(٣) يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

(٤) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

(٥) وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ

(٦) قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ

আয়াতে কেফায়াতে মুহিম্মাত

(সকল প্রকার বালা-মুসীবত ও বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তার জন্য)

কুরআনুল হাকীমের নিম্নোক্ত সাতটি আয়াতে কারীমাকে আয়াতে কেফায়াতে মুহিম্মাত বা সকল প্রকার বালা-মুসীবত ও বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা লাভের আয়াত বলা হয়। এই মহান আয়াতগুলি দ্বারা যাবতীয় বালা-মুসীবত থেকে নিরাপদ থাকা যায়। এই আয়াতে কারীমাগুলি পাঠ করার মানে নিজের জন্য সার্বিক নিরাপত্তা হাসিল করা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দ্বীনি ও দুনিয়াবী ব্যাপারে এই সাতটি আয়াতের চেয়ে উত্তম আর কোন বিষয়ই হতে পারে না। এই সাতটি আয়াতে কারীমা প্রত্যেকদিন সাতবার পড়া উচিত। বুযুর্গানে দ্বীন শুরু এবং শেষে দরূদ শরীফও পাঠ করতেন।

সাতটি আয়াতে কারীমা এই-

(١) اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبٰٓئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا-

(٢) وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا-

(٣) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا-

(٤) إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا-

(٥) وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

(٦) وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْيَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

(٧) مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ وَ كَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا

فَسَهِّلْ يَا اِلٰهِىْ كُلَّ صَعْبٍ * بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْاَبْرَارِ سَهِّلْ

দশটি 'ক্বাফ'' অক্ষর বিশিষ্ট পাঁচটি আয়াত

(দীর্ঘ জীবন সুস্বাস্থ্য ও বরকতের জন্য)

পবিত্র কুরআনে এমন পাঁচটি আয়াত রয়েছে যার প্রত্যকটি আয়াতে দশটি করে "ক্বাফ" অক্ষর আছে। এ গুলির রহস্য ও উপকারিতা অসংখ্য।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত ঃ হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন এই পাঁচটি আয়াত লিখবে এবং ধুয়ে পানি পান করবে তার হাজার শেফা, হাজার স্বাস্থ্য ও হাজার রহমত হাসিল হবে। হাজার নরমী, হাজার ইয়াক্বীন ও হাজার নুর তার ভেতরে প্রবেশ করবে। যাবতীয় রোগ ব্যাধির দুঃখ কষ্ট ও চিন্তা পেরেশানী তার থেকে বের হয়ে যাবে।– তাফসীরে কাওয়াসী

হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক প্রশ্নের জওয়াবে ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এই আয়াতগুলি পাঠ করবে তার হায়াত দীর্ঘ হবে, তার গুনাহ মাফ হবে এবং তার উদ্দেশ্য সফল হবে। –তাফসীরুল আরায়েশ

মর্যাদাপুর্ণ পাঁচটি আয়াত এই–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا

تُقَاتِلُوْا قَالُوْا وَمَا لَنَا اَنْ لَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ـ

(٢) لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ـ

(٣) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْآ اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةٍ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ـ

(٤) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ـ

(٥) قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا

(٦) قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (قَيُّوْمٌ يَّرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ الْقُوَّةَ ـ)

রোগ-ব্যাধি ও ক্ষতিগ্রস্ততার প্রতিকার

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত ঃ একদা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। এসময় একজন ভগ্ন হৃদয় জীর্ণশীর্ণ ব্যক্তির উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার এ অবস্থা কি করে হল? লোকটি বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! রোগ-ব্যাধি ও ক্ষয় ক্ষতির কারণে আমার এ অবস্থা হয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কালিমা শিখিয়ে দেবনা যা তোমার রোগ ও ক্ষয়-ক্ষতি দূর করতে পারে?

হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার অনুরোধে এ আয়াত আমাকে শিখিয়ে দেনঃ

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِى لَا يَمُوتُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا

অর্থাৎ "আমি সেই মহান সত্তার উপর ভরসা রাখি, যিনি জীবিত, যার মৃত্যু নাই, এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি না কোন সন্তান রাখেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরীক আছে এবং দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন।" – সূরা বনী ইসরাইল ঃ আয়াত ১১১

চিন্তা ও পেরেশানীর প্রতিকার

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহঃ) বলেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন চিন্তা ও পেরেশানী দেখা দিলে তিনি এই দুআ করতেন ঃ

يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ

অর্থাৎ "হে চিরঞ্জীব , হে চিরন্তন! তোমার অনন্ত রহমতের অছিলায় প্রার্থনা করছি।" – হাকেম, তিরমিযী শরীফ

দুআ ইউনুস (আঃ)

হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াককাস (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে এই দুআ পাঠ করেছিলেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

"আপনি ছাড়া কোন মাবূদ নাই। আপনি পাক ও পবিত্র। নিশ্চয় আমি যুলুম করেছি।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই দুআ কি হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জন্যই খাছ ছিল, না সাধারণ মুমিনদের জন্যেও এই দুআ প্রযোজ্য? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি আল্লাহ তাআলার এই আয়াত শুননি?

فَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ

"আমি তাঁর (হযরত ইউনুস (আঃ)-এর দুআ কবূল করেছি ও তাঁকে এই কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছি এবং আমি এভাবেই মুমিনদেরকে মুক্তি দেই।"

মনোবেদনা ও অস্থিরতার প্রতিকার

মানুষ স্বভাগতভাবেই অত্যন্ত দুর্বল ও স্পর্শকাতর। তার সকল প্রকার শক্তি সামর্থের পরও সে এতো দুর্বলচিত্ত যে সামান্য বিষয়ই তাকে বেদনাক্লিষ্ট ও ব্যাকুল করে তোলে। তবে আল্লাহ্ তা'আলার খাস বান্দাগণ বড় বড় অঘটন দুর্ঘটনার পরও ভগ্নহৃদয় ও ব্যাকুল হয়ে যান না। আমাদের সম্মানিত বুযুর্গগণ এই মনোবেদনা ও চিত্তের অস্থিরতা দূর করার বিভিন্ন দুআর তালীম দিয়েছেন। স্বয়ং রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, এরূপ মনোবেদনার কোন কারণ ঘটলে নিম্নোক্ত দুআ পড়ে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। – বুখারী শরীফ

দুআটি এই–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ عِبَادِكَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) হতে বর্ণিতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনের দুঃখ-কষ্ট ও অস্থিরতা দূর করার জন্য এই দুআ শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ـ

দুনিয়া ও আখেরাতের বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তার তদবীর

নিম্নোক্ত দশটি সূরা, আয়াত, দুআ ও দরূদ শরীফ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে সাত বার পাঠ করা অত্যন্ত উপকারী। – কুওয়াতুল কুলূব

(১) সূরা ফাতেহা (২) সূরা নাস (৩) সূরা ফালাক্ব (৪) সূরা ইখলাস (৫) সূরা কাফেরূন (৬) আয়াতুল কুরসী (৭) কালিমায়ে তামজীদ (৮) এই দরূদ শরীফ।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ حَبِيْبِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

(৯) এই দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّكَ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ وَرَافِعُ الدَّرَجَاتِ يَا قَاضِى الْحَاجَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

(১০) এবং

اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ افْعَلْ بِىْ وَبِهِمْ عَاجِلاً وَّاٰجِلاً فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مَا اَنْتَ اَهْلُهٗ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ لَهٗ اَهْلٌ اِنَّكَ غَفُوْرٌ جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

যে কোন রোগ-ব্যাধি ও ব্যথার জন্য এই তাবীয লিখে গলায় বেঁধে রাখলে খুবই উপকার পাওয়া যায়ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطٰنٍ وَّهَامَّةٍ وَّعَيْنٍ لَّامَّةٍ تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ اَلْفِ اَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ -

রোগীর উপর দম দেওয়া

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী হুযুরের সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখার জন্য তাশরীফ নিয়ে আসেন। তিনি বললেন, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আমার উপর যে দম করেছিলেন−আমি কি তোমার উপর সেই দম করব না? আমি আরয করলাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আপনি অবশ্যই দম করুন। অতঃপর তিনি এই দুআ পড়ে আমার উপর দম করেন। −হাকেম, ইবনে মাজাহ

দুআটি এই−

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيْكَ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নের কালিমাগুলি পাঠ করে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ)-এর উপর দম করেছিলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُّؤْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَّ عَيْنِ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ

চোখের দৃষ্টি শক্তি

(১) হযরত লাইস ইবনে সাআদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত উক্ববা ইবনে নাফে (রহঃ)কে অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়াতে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে চোখের দৃষ্টিশক্তি কিভাবে দান করলেন? তিনি জওয়াব দিলেন, আমাকে স্বপ্নে একজন লোক কিছু কালিমা পড়তে বললেন। আমি কালিমাগুলি পাঠ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। কালিমাগুলি হল এই -

يَا قَرِيْبُ يَا مُجِيْبُ يَا سَمِيْعَ الدُّعَاءِ يَا لَطِيْفًا لِّمَا يَشَاءُ اُرْدُدْ عَلَىَّ بَصَرِىْ

(২) খাজা ফরীদুদ্দীন (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি নিম্নের আয়াতটি ৭ বার এবং তার সাথে ৭ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে নখের উপর ফুঁক দেবে এবং নখ দিয়ে চোখের উপর মসেহ করবে তার চোখের দৃষ্টি কখনো নষ্ট হবে না।

আয়াত খানি এই-

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) ও স্বীয় "কাওলুল জামীল" কিতাবে এই তদবীরের উল্লেখ করেছেন।

كهيعص - حم عسق

"হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আওলিয়া (রহঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি উপরোক্ত দশটি অক্ষরের একেকটি অক্ষর মুখে উচ্চারণ করবে এবং একেকটি আঙ্গুল বন্ধ করবে। এভাবে এক হাতের দশটি আঙ্গুল বন্ধ হয়ে গেলে তা চোখের উপর ফেরাবে, ইনশাআল্লাহ তার চোখের রোগ সম্পূর্ণরূপে ভাল হয়ে যাবে।

-সিয়ারুল আওলিয়া

মাথা ব্যথা, দাঁত ব্যথা ও চোখের ব্যথা

(১) হযরত জাফর সাদেক (রহঃ) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেছেন, মাথা ব্যথার জন্য এই দুআটি ৭ বার পড়ে মাথা হাতিয়ে দেবে ঃ

(١) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِىْ سَكَنَ لَهٗ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

(২) আধ-কপালী ব্যথার জন্য আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত গুণবাচক পবিত্র নামগুলি লিখে মাথার উপর বেঁধে দিলে ব্যথার উপশম হবে ইনশাআল্লাহ!।

(٢) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَافَتَّاحُ يَا وَهَّابُ يَا رَحِيْمُ

(৩) দাঁত ব্যথার জন্য একটি কাগজের টুকরায় নিম্নোক্ত আয়াতখানি লিখে যে দাঁতে ব্যথা তার উপর রেখে দিবে।

(٣) لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

(৪) ইমাম শাফী (রহঃ)–এর নিকট এক ব্যক্তি চোখের ব্যথার অভিযোগ করলে তিনি একটি কাগজে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ-قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ

লিখে দিয়ে বললেন, এটা মাথায় বেঁধে রাখ। এতে আল্লাহর ইচ্ছায় সে ব্যক্তির চোখের ব্যথা ভাল হয়ে যায়।

নারীদের জন্য বিশেষ তদবীর

(১) প্রসব বেদনা ঃ কোন মহিলার প্রসব বেদনা উঠলে কাগজের টুকরায় এই আয়াতটি লিখে এটাকে পাক কাপড়ে পেছিয়ে মহিলার বাম রানে বেঁধে দেবে। দ্রুত সন্তান প্রসব হয়ে যাবে।

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ-اهيا اشراهيا

(২) হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) বলেন, আমাকে একজন অতি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বলেছেন যে, যদি কোন মহিলার সন্তান প্রসবের পর জীবিত না থাকে তাহলে আজওয়াইন (উগ্রগন্ধ লতাবিশেষের বীজ) ও গোল মরিচ নিয়ে সোমবার দুপুর সময় ৪০ বার সূরা শামস পড়বে। প্রত্যেক বার আগে ও পরে দরূদ পাঠ করবে। অতঃপর আমলের দিন থেকে শিশুর দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত প্রতি দিন খাবে। ইনশাআল্লাহ এই মহিলার সন্তান স্বাভাবিক জীবন লাভ করবে।

শিশুদের হিফাযতের জন্য

(১) হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নে উল্লেখিত দু'আটি পাঠ করে হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাযিঃ) এর শরীরের উপর

দম দিতেন এবং তিনি বলতেন যে, তোমাদের দাদা হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল এবং হযরত ইসহাক (আঃ) ও এই দুআ পাঠ করতেন। –মুসলিম শরীফ

আমাদের পূর্বসূরী বুযুর্গদের মধ্যে হযরত মাওলানা আবদুল আযীয ও মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক (রহঃ) শিশুদের হেফাযতের জন্য শুধু এই দুআটিই লিখে দিতেন। এই দুআটি যদি কাগজে লিখে শিশুর গলায় বেঁধে দেওয়া হয় তাহলে আল্লাহ চাহেন তো শিশু সর্বদিক থেকে নিরাপদ থাকবে।

দু'আটি এই

(١) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ -

(২) বদ নযেরর জন্য শুরু ও শেষে দরূদ শরীফসহ নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে শিশুর উপর দম করবে।

(٢) وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ -

বদ নযর থেকে আত্মরক্ষার তদবীর

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَاٰى شَيْئًا يُعْجِبُهٗ فَخَافَ اَنْ يَّعِيْنَهٗ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَلَا اَخِيْرَهٗ -

হাকীম ইবনে হেযাম (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন জিনিস দেখতেন এবং এটা তাঁর নিকট খুব ভাল লাগত, তখন তাঁর ভয় হত যে, পাছে আবার বদ নযর লেগে না যায়। তাই তিনি বলতেন, আয় আল্লাহ! আপনি এতে বরকত দান করুন এবং এটাকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন। – মুসলিম শরীফ

হাদীসের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ সুনানে নাসায়ী ও ইবনে মাজায় হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিতঃ আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ নিজের মধ্যে, নিজের মালের মধ্যে বা অপর কোন মুসলমান ভায়ের মধ্যে এমন কোন জিনিস দেখ, যা তার খুবই পছন্দ

হয় তখন তার মধ্যে বরকতের জন্য দুআ করা উচিত। কেননা, নযর লাগার বিষয়টি খুবই সত্য।

উপরোক্ত দুইটি পবিত্র বাণী থাকার পর নযর লাগার ব্যাপারে কোন প্রকার শুবা সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নাই। নযর লাগার বিষয়টি কোন কল্পকাহিনী বা রূপকথা নয়। বরং এটা একটা অতি বাস্তব ব্যাপার।

অধুনা দেহতত্ত্ববিদগণও এই সত্যটি স্বীকার করে নিয়েছেন। বস্তুতঃ হ্যাফনাটিজমের ভিত্তিই চোখের আকর্ষণ শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নযর লাগার মন্দ প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য যে দুআ শিক্ষা দিয়েছেন, চিন্তা করে দেখুন তা কত সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক অর্থবোধক।

অধ্যায়ঃ ৬

পানাহারের আদব

আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানাহারের আদব সম্পর্কে আমাদের জন্য সুস্পষ্ট হেদায়াত রেখে গেছেন।

কিভাবে খানা খাবে? প্রথমে কি করবে? খানার জন্য বসার পদ্ধতি কি হবে? খাদ্য কি পদ্ধতিতে আহার করবে? একত্রে খাওয়ায় কি কি বরকত রয়েছে? অন্যকে খানার মধ্যে শরীক করায় কেমন বরকত? খানার পূর্বে এবং পরে কোন্ কোন্ দোয়া পাঠ করা সুন্নত? মোটকথা খানা সম্পর্কে সম্ভাব্য যত প্রকার প্রশ্নই হোক না কেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীর মধ্যে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট জওয়াব ও সমাধান রয়েছে।

খানার আদব ও উপদেশ সম্পর্কিত তিব্বে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই অধ্যায়টি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী এবং আমলী নমুনার অন্তর্ভুক্ত।

হালাল খাদ্য

কোন খাদ্য জায়েয অথবা নাজায়েয হওয়ার মৌলিক শর্ত দুটি। প্রথমটি হলো খাদ্য হালাল হওয়া। দ্বিতীয়টি হলো পবিত্র হওয়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ হচ্ছেঃ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا .....

"হে মানব! জমিনে যা কিছু রয়েছে তা থেকে হালাল ও পবিত্র জিনিসগুলি খাও।" –সূরা বাকারাঃ আয়াতঃ ১৮৬

(১) হালাল ঃ ঐ সকল জিনিসকে বলে যা শরীয়ত অনুমোদিত। এবং তা গ্রহণ করাকে শরীয়ত নিষেধ করে নাই। যেমন দুধ, ঘি, ফল, শাক-সব্জি, হালাল জীব-জন্তুর গোশত ইত্যাদি। তবে শরয়ী অনুমোদনের সাথে সাথে উক্ত হালাল বস্তু অবশ্যই জায়েয পন্থায় অর্জিত হতে হবে। নাজায়েয পন্থায় উপার্জিত অথবা প্রাপ্ত হলে চলবে না। যেমন চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, ছিনতাই, অথবা কোন নাহক পন্থায় অর্জিত জীবিকা হালাল নয়।

(২) পবিত্রতা ঃ খাদ্য হালাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় শর্ত হলো, তা পবিত্র হতে হবে। কারণ কোন বস্তু যতই হালাল এবং বৈধ উপায়ে তা অর্জিত হোক না কেন, যদি এর মধ্যে নাজায়েয নাপাক কিছু মিশ্রিত হয়ে যায় তবে তা আর

জায়েয থাকে না। নিম্নের উদাহরণ দ্বারা উক্ত শর্তটি সুস্পষ্ট করা হলো। মোরগ একটি হালাল প্রাণী। শরীয়ত এর গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। তথাপি তা বৈধ হওয়ার জন্য চুরিকৃত না হওয়া, অবৈধ পন্থায় উপার্জিত না হওয়া, মৃত না হওয়া বরং নিয়মানুযায়ী জবাইকৃত হওয়া শর্ত। এমন কি উক্ত শর্তাবলী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি গোশতের ডেগের মধ্যে নাপাকী পতিত হয় তবে সমস্ত গোশতই নাপাক হয়ে খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে যায়। কতইনা পরিতাপের বিষয় উচু তলার লোকদের জন্য যাদের থেকে হারাম হালালের পার্থক্য একেবারে উঠেই গেছে। তবে সাধারণ লোকদের মধ্যে এ বিষয়ে কিছু সতর্কতা দেখা গেলেও তারা জায়েয নাজায়েযের প্রতি তেমন খেয়াল করে না। আর পাক-নাপাকের প্রতি তো সাবধানতা মোটেই নাই।

কতিপয় হারাম খাদ্য

(১) মৃত জীব-জন্তু ঃ

ইরশাদ হচ্ছেঃ .... اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ

"নিঃসন্দেহের তোমাদের উপর মৃত প্রাণীর গোশত হারাম করা হয়েছে।"
–সূরাহ বাকারা আয়াতঃ ১৭৩

হারাম প্রাণীর মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলী বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ঃ

(ক) জবাই ব্যতীত রোগ অথবা অন্য কোন কারণে স্বাভাবিক মৃত প্রাণী।
(খ) গলাটিপে মারা প্রাণী।
(গ) আঘাত লেগে মৃত্যু হয়ে যাওয়া প্রাণী।
(ঘ) উপর থেকে পড়ে মৃত্যুবরণকারী প্রাণী।
(ঙ) শিং এর আঘাতে মৃত্যু হওয়া প্রাণী।
(চ) বন্য বা হিংস্র জন্তুর খাওয়ার কারণে মৃত্যুবরণকারী প্রাণী।
(ছ) কোন পূজা বা বলীর বেদীর উপর জবাই কৃত প্রাণী।
(জ) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাইকৃত প্রাণী।

হারাম প্রাণী সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত স্থানসমূহে রয়েছে।

সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৭৩
সূরা মায়েদা ঃ আয়াত ঃ ৩
সূরা আনআম ঃ আয়াত ঃ ১১৮, ১৬১, ১৫৪
সূরা নাহল ঃ আয়াত ঃ ১১৫

মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া নিষেধ। এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে বড় হেকমত নিহিত রয়েছে। যদিও আমরা এই হেকমত বুঝতে সক্ষম নই তবুও আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনের মধ্যেই আমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

নিম্নের বিষয়গুলির কারণে প্রাণীর মৃত্যু হতে পারে। * বার্ধক্য, শারীরিক দুর্বলতার কারণে ক্রমে এতে দুর্বল হয়ে পড়ে যে, তার জীবনীশক্তিই রহিত হয়ে যায়।

* শারীরিক অসুস্থতার কারণে শরীর এবং গোশতে কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা সৃষ্টির ফলে মৃত্যু হয়

* বাহ্যিক দুর্ঘটনা অথবা অভ্যন্তরীণ বিষাক্ত পয়জনে মৃত্যু হয়।

* কোন বিষাক্ত প্রাণী সাপ ইত্যাদির দংশন মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে।

উপরোল্লেখিত যে কোন কারণেই মৃত্যু হোক না কেন মৃত প্রাণীর মাংসে বিষাক্ত পয়জন, দুষিত রক্ত এবং ক্ষতিকর পয়জন ও জীবাণুর সমাবেশ ঘটে। ফলে তা কেউ ভক্ষণ করলে শারীরিক রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাছাড়া যে সকল প্রাণীর মৃত্যু জবাই ছাড়া হয় ও রক্ত প্রবাহিত না হয় তার বিষাক্ত জীবানু শরীরে থেকে যায়। আর যে সকল প্রাণী দেব-দেবীর নামে অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই করা হয় এরূপ জন্তুর গোশত খেলে আকীদা নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মৃত জন্তুর গোশত হারাম করে দিয়েছেন।

কতিপয় হারাম খাদ্যের বর্ণনা

(২) শূকরের মাংস

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ

"তোমাদের উপর মৃত প্রাণী, রক্ত এবং শুকরের মাংস হারাম করা হয়েছে, (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ঃ ১৭৩)

এ আয়াত ছাড়াও শূকরের মাংস হারাম হওয়ার হুকুম সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ সূরা মায়েদা ঃ আয়াত ঃ ৩, সূরা আনআম ঃ আয়াত ঃ ১৪৫, সূরা নাহল ঃ আয়াত ঃ ১১৫ ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং সীমাতীত অপবিত্র ঘৃণিত জন্তুর মাংস সম্পুর্ণরূপে হারাম বলেছেন। তাই মজুবত

আকীদার মুসলমানগণের নিকট এটা এত ঘৃণিত যে, উক্ত জন্তুটির নাম লওয়াকেও তারা সহ্য করতে পারে না। সূরা আনআমের ১৫৪ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে 'রিজসুন' এবং ফুসুক অর্থাৎ সীমাহীন অপবিত্র ও আল্লাহর হুকুমের নাফরমানী বলে উল্লেখ করেছেন।

শূকর পৃথিবীর নাপাক প্রাণীকুলের অন্তর্ভুক্ত একটা ঘৃণিত প্রাণী। এটা ময়লা আবর্জনার উপর মুখ লাগাতে থাকে, নাপাকী খায়, নোংরা স্বভাব বিশিষ্ট, এর মধ্যে নাই লজ্জা শরমের কোন বালাই, মেজাজ সাংঘাতিক উগ্র, আর রক্ত ক্ষতিকর জীবাণুর ভান্ডার এবং মাংস রূহানী এবং শারীরিক ক্ষতির মূল।

শূকরের গোশত সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের অভিমত খুবই শিক্ষাপ্রদ। গবেষণায় জানা গেছে যে, ক্রমাগত এই গোশত ব্যবহারে চর্ম রোগ, যকৃৎ এবং নাড়ীর রোগ, আমাশয়, পাতলা পায়খানা, মূত্র থলীর সমস্যা, পেটে ক্রিমির আধিক্য, হৃদরোগ ও ক্যান্সার হয়ে থাকে। এবং মাংস থেকে সৃষ্ট পোকা নাড়ী এবং রক্তে প্রবেশ করে মস্তিষ্কে পৌঁছে মৃগী রোগ সৃষ্টি করে। এবং চর্বি ব্যবহারে রক্তে কোলিস্টোল বেড়ে যাওয়ায় রক্তবাহী ধমনী (শিরা) সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং শিরা সংকুচিত হওয়ায় রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে। যার প্রতিক্রিয়া হিসাবে অবশ্যই প্যারালাইসিস অথবা মানসিক রোগ দেখা দেয়। সচরাচর শূকরের মাংস ভক্ষণকারীদের চামড়ার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা সৃষ্টি হয় যা একটা স্থায়ী চর্মরোগের আকার ধারণ করে। এ ছাড়াও শূকরের মাংস খাওয়ায় ছোট বড় আরো অনেক প্রকার রোগ হয়ে থাকে।

পবিত্র কুরআন মজীদ ছাড়াও ইঞ্জিল শরীফেও শূকরকে হারাম বলা হয়েছে। কিন্তু আজ সমস্ত পাশ্চাত্য দেশে শূকরের মাংস প্রিয় হয়ে উঠেছে এবং তাদের দেখা দেখি প্রাচ্য দেশগুলিও এর প্রতি ধাবিত হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত বাস্তব একটা বিষয় যে, শূকরের মাংসভোজী জাতি এবং গোত্র উক্ত বেহায়া জন্তুর মতই নির্লজ্জ ও বেশরম, কারণ মাদী শূকর একটি মাত্র পুরুষ শূকরের সঙ্গমে গর্ববতী হয় না। বরং তাদের গর্ভধারণের জন্য একটার পর একটা শূকরের বারবার সঙ্গমের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অনেক পশুও এমন নির্লজ্জতা পছন্দ করে না।

সুতরাং শূকরের মত জানোয়ার যার মাংস ভক্ষণে রূহানী এবং চারিত্রিক রোগ সৃষ্টি হয়, এর ধারে কাছে যাওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

কতিপয় হারাম খাদ্য

(৩) রক্ত

পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য মৃত জীব এবং রক্ত হারাম করেছেন।" সূরা বাকারা ঃ আয়াত ঃ ১৭৩

খানা-পিনার বস্তুর মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের হারাম হল রক্ত। মৃত্যু প্রাণী এবং শূকুরের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত হারাম হওয়া সম্পর্কেও বারবার আলোচনা এসেছে।

(حَرَم - حَرَام) এবং (مَحْرُوْم) এই তিনটি শব্দ একই শব্দ মূল বা ধাতু থেকে এসেছে।

(حَرَم) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে নিষেধের অর্থ কখনো এর সম্মানের কারণে ও হতে পারে যেমন বাইতুল্লাহ শরীফের হারাম ইত্যাদি। নিষিদ্ধতার দ্বিতীয় কারণ হলো এর নিকৃষ্টতা। যেমন মৃত প্রাণীর মাংস, শূকর, কুকুর এবং রক্ত ইত্যাদি হারাম হওয়া।

মূলত রক্ত শরীরের সকল জীবাণু, বিষাক্ত পদার্থ, ক্ষতিকর প্রভাব এবং রোগ বহনকারী। রক্তের তীব্রতা ও উষ্ণতার দ্বারাই এই ক্ষতিকর প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা রক্তকে হারাম আখ্যায়িত করে স্বীয় হেকমতের মাধ্যমে মানুষের উপর বড় মেহেরবানী করেছেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, রক্ত পানকারীর নাড়ীতে পৌঁছে তার জীবানুগুলি ইমোনিয়া সৃষ্টি করে। ফলে যকৃৎ দুষণ এবং বিভিন্ন প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়।

শরাব একটা হারাম পানীয়

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ

...... فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ -

"নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তি এবং লটারী শয়তানের গর্হিত কর্ম। তোমরা এগুলি হতে সম্পূর্ণ দূরে থাক, তোমাদের মঙ্গল হবে। শয়তান মদ এবং জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও

নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখতে চায়। এখনও কি তোমরা ফিরে আসবে না।" –সূরা আনআম ঃ আয়াত ঃ ৯০-৯১

অন্যস্থানে আল্লাহ্ তা'আলা মদ এবং জুয়া সম্পর্কে বলেছেন যে, ("হে নবী!) আপনার কাছে (মানুষ) মদ এবং জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করছে, আপনি বলে দিন এতে গুনাহ এর উৎস রয়েছে, আর মানুষের জন্যে কিছু উপকারও নিহিত আছে।" – সূরা বাকারা ঃ আয়াত ঃ ২১৯

শরাব বা মদ আঙ্গুর, খেজুর, গম, জব ইত্যাদির রস দ্বারা তৈরী করা হয়। পবিত্র কোরআনের সূরা নাহ্ল এর ৬৭ নং আয়াতে শরাব সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, এটা আকলকে বিকৃত , বুদ্ধিমত্তা ও বোধশক্তিকে বিভ্রান্ত ও অনুভূতিকে উত্তপ্ত করে স্বাভাবিক ও সুস্থ্ লোককে অজ্ঞান করে দেয় এবং চিন্তা শক্তি নষ্ট করে ফেলে। মদ্য পানকারীর মধ্যে এক প্রকার উত্তেজনার আধিক্য দেখা যায়, যার ফলে আজে বাজে বকতে থাকে, যে সব কথা বলা যায় না তাও বলে ফেলে। এমতাবস্থায় সে না পারে ইজ্জত সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখতে আর না পারে গোপনীয়তা বজায় রাখতে। এমনকি রাষ্ট্রীয় একান্ত গুরুত্বপূর্ণ গোপন কথা পর্যন্ত মাতাল অবস্থায় প্রকাশ হয়ে পড়ে।

শরাবের মাতলামীতে যেহেতু হুশ-জ্ঞান ঠিক থাকেনা, মা বোন ভাল মন্দ ইত্যাদির পার্থক্য পর্যন্ত বাকী থাকে না। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নির্দেশের আনুগত্য করা এবং ইবাদাতের প্রতি মনোযোগী হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

মদ্যপানে শুধু মানুষের হুশ জ্ঞানই বিগড়ে যায় না বরং পাকস্থলী নষ্ট হওয়ায় হজম শক্তির সর্বক্ষমতা ও নিয়ম বিগড়ে যায়। এতে পাকস্থলীর ব্যথা, পাকস্থলীতে ক্ষত বরং; এতে পাকস্থলীতে ক্যান্সারের মত মারাত্মক রোগও সৃষ্টি হয়। মদ্য পানে রক্তের তীব্রতা খুবই বেড়ে যাওয়ায় খুব শীঘ্র অসুস্থতা দেখা দেয়। আপাতঃ দৃষ্টিতে মদের গরম প্রভাবে বুকের রোগে শান্তি পাওয়া যায় বটে তবে প্রকৃত পক্ষে অন্তরের অবস্থা একেবারেই বিগড়ে যায়। কারণ কেন্দ্রীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি প্রভাবিত হওয়ার ফলে প্লীহা এবং যকৃৎ – এর কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। বেশী বেশী মদ্যপান করায় প্রস্রাব বৃদ্ধি সমস্যা দেখা দেয়, এমন কি মদ্যপায়ী প্রস্রাবের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে।

এর চেয়ে বড় খারাবী এবং দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে যে, শরাব পানকারী ভাল মন্দের পার্থক্য বরং মা-বোনের চেতনা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। সে আকল বিবর্জিত এবং আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদত থেকে দূরে সরে পড়ে। লা হওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

বর্তমান যুগের পশ্চিমা দেশবাসীর মত অন্ধকার যুগে আরবের অধিবাসীগণও শরাব প্রিয় ছিল। শরাব তাদের মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইসলামের দৌলত দান করতঃ অল্প দিনের মধ্যে শরাব থেকে মুক্তি দিলেন। শরাব হারাম হওয়ার বিধান সম্বলিত হুকুম আহকাম ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়। তবে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত সর্বশেষ হুকুম যখন নাজিল হয় এবং মদীনার অলি গলিতে শরাব হারাম হওয়া সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া হয় তখনই শরাবের পাত্র, পান পাত্র ও কলসীগুলি টুকরা টুকরা হয়ে গেল। পবিত্র মদীনার গলীতে গলীতে দুর্গন্ধযুক্ত পানির মত শরাব ঢেলে ফেলা হল। অতঃপর আর কখনই তা কারো মুখের কাছে আসে নাই।

মাটি খাওয়া এবং চলা ফেরা অবস্থায় খাওয়া

مَنْ اَكَلَ الطِّيْنَ فَكَاَنَّمَا اَعَانَ عَلٰى قَتْلِ نَفْسِهٖ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন "যে ব্যক্তি মাটি ভক্ষণ করে সে যেন নিজকে নিজে হত্যা করার জন্যে সাহায্য করে।"

– তাবরানী

মাটি গুণগত ভাবে পবিত্র এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে নাপাকী না লাগে ততক্ষণ তা পবিত্র থাকে। তবে মাটি খাওয়ার জিনিস নয়। মাটি খাওয়া অথবা মাটি মিশ্রিত কোন কিছু খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্যে খুবই ক্ষতিকর। এখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী পাঠকগণের সামনে তুলে ধরা হল।

মাটি হজমে সাহায্য করতে পারে না এবং নিজেও হজম হতে পারে না। কেননা এটা পাকস্থলীতে স্থির থাকে এবং পেটের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلاَ كْلُ فِى السُّوْقِ دَنَاءَةٌ

অর্থাৎ "বাজারে কোন কিছু খাওয়া নিকৃষ্ট কাজ।" বাজারে চলা ফেরা অবস্থায় খাওয়া ভদ্রতা ও সভ্যতার খেলাপ এবং স্বাস্থ্য রক্ষা বিধানের পরিপন্থী। চলতে ফিরতে এটা সেটা মুখে দেওয়া পশুর আচরণ, মানুষের কাজ নয়।

খাওয়ার পূর্বে হাত ধৌত করা

اَلْوُضُوْءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِى الْفَقْرَ وَبَعْدَهٗ يَنْفِى اللَّمَمَ

"খাওয়ার পূর্বের অযূ (হাত মুখ ধৌত করা) দরিদ্রতা দূর করে এবং খাওয়ার পর (হাত মুখ) ধৌত করায় স্থূলতা দূর হয়।"

অযূর আভিধানিক অর্থ ধৌত করা ও পবিত্র করা। উলামাগণ তিন প্রকার অযূর উল্লেখ করে থাকেন।

(১) অযূয়ে সালাত বা নামাযের অযূ। এতে হাত মুখ ধৌত করা ব্যতীত মাথা মাসেহ্ করা ও পা ধৌত করা ফরজ। কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া সুন্নাত।

(২) অযূয়ে নাউম বা ঘুমের অযূ। এ অযূতে হাত মুখ ধৌত করতে হয় এবং ইস্তিঞ্জা করতে হয়।

(৩) অযূয়ে তায়াম বা খাওয়ার অযূ। এ অযূতে হাত ধৌত করা ও কুলি করা সুন্নাত।

হযরত সালমান ফারসী (রাযি) বর্ণনা করেন, আমি তাওরাত কিতাবে পড়েছি, খাওয়ারপূর্বে অযূ করায় বকরত নাযিল হয়। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনি বললেন – بركت الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده "খাওয়ার পূর্বে এবং খাওয়ার পরে অযূ করলে খানায় বরকত হয়।" –সূনানে আবূ দাঊদ, তিরমিযী

আজো অধিকাংশ মানুষের সামনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী সুন্নত বিষয় অস্পষ্ট রয়ে গেছে। তা হল রুমাল অথবা তোয়ালে ইত্যাদি দ্বারা হাত মোছা (শুষ্ককরা) অথবা না মোছার ব্যাপারে হুকুম কি?

মূলতঃ সুন্নত হল খাওয়ার পূর্বে হাত ধৌত করার পর কোন কাপড় বা তোয়ালে দ্বারা হাত না মোছা। অবশ্য খাওয়ার পর হাত ধৌত করে অবশ্যই কোন কাপড় অথবা তোয়ালে দ্বারা হাত মোছন করা যাবে। কিন্তু আশ্চর্য! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ পদ্ধতি কতই না হেকমতপুর্ণ। কারণ রুমাল হোক অথবা তোয়ালে হোক তাতে জীবানু অথবা ময়লা ইত্যাদি থাকা খুবই সম্ভব। তাই খানা খাওয়ার জন্য হাত ধৌত করার পর রুমাল তোয়ালে দ্বারা হাত মুছে ফেললে হাত ধোয়ার সমস্ত উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে গেল।

খাওয়ার পূর্বে দুআ পাঠ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে সকল কাজ আল্লাহর নামে শুরু করা হবে তার মধ্যে বরকত হবে। সেমতে খানা শুরু করার পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত দোয়া রয়েছে। তা হলো ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ

অর্থাৎ আল্লাহর নাম ও তাঁর বরকতে শুরু করছি। এতে বুঝা যায়, খানার পূর্বে তাছমিয়াহ অর্থাৎ পূর্ণ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া জরুরী নয়।

যেমন ভাবে জানোয়ার পাখী ইত্যাদি জবাই করার পূর্বে তাছমিয়ার পরিবর্তে بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ "বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার" বলা হয়। তেমনি খাওয়ার পূর্বেও এভাবে বললে চলবে।

বস্তুবাদী যে সকল লোক মাল আসবাব ও যুক্তি ব্যতীত অন্য কিছুতে বিশ্বাসী নয় তারা বলে থাকে, রুটির পরিবর্তে কয়েকটি কালিমা ও শব্দের দ্বারা পেট ভরবে কি করে? কি করে অল্প খাদ্য 'বিসমিল্লাহ' দ্বারা বাড়তে বা রবকতপূর্ণ হতে পারে? এ সকল লোক এ হাকীকত ভুলে যায় যে, ক্ষুধা এবং পরিতৃপ্তির সম্পর্ক বস্তুর সঙ্গে অবশ্যই রয়েছে কিন্তু তদাপেক্ষা অধিক সম্পর্ক হল অনুভূতি ও উপলব্ধির সাথে।

কে না জানে যে, চিন্তা ও পেরেশানীর সময় ক্ষুধা থাকে না। দুঃখে কষ্টে ক্ষুধা পিপাসার প্রতি লক্ষ্য থাকে না। পক্ষান্তরে বিপদে পড়লে পিপাসার সীমা থাকে না। তাই যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তির চিন্তা চেতনা মহান আল্লাহ্ কেন্দ্রিক হয়ে যায় এবং যার ঈমান সকল গুণের আধাঁর মহান সত্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায়, সে অবশ্যই সামান্য নেয়ামতকে অনেক বেশী মনে করে। বস্তুর বেশী কমের প্রতি তার ভ্রুক্ষেপ থাকে না। এ কারণে যে, তার জন্য স্বীয় প্রভুর নামই সব কিছু। সুতরাং নিজ প্রভুর স্মরণ তার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সামগ্রী। প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই সুখী যে তার সৃষ্টিকর্তা ও মালিক-এর নামেই সকল কাজ আরম্ভ করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করে।

খানা খাওয়ার জন্য বসার পদ্ধতি

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে বসে খানা খেতেন? এ প্রশ্নের জবাবের জন্যে নিম্নের হাদীসটি দেখুন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .... عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَجَلَسَ عَلٰى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ رُبَّمَا نَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَجَلَسَ عَلَى الْيُسْرٰى

"খানা খাওয়ার সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই হাটু গেড়ে স্বীয় কদম যুগলের পিঠের উপর বসতেন। অধিকাংশ সময় ডান পা খাড়া করে রেখে বাম পায়ের উপর বসতেন। (বর্ণনাকারী বসার উক্ত পদ্ধতি বর্ণনা করে এ কথাও বলেছেন যে, এ পদ্ধতিটি স্বীয় মহান রব্বুল আলামীনের প্রতি মনোযোগী হওয়ার বহিঃপ্রকাশ ছিল। এবং এতে খানার প্রতি আদব ও সম্মানের প্রকাশ ঘটতো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দিষ্ট বসার পদ্ধতির কথা একটু ভেবে দেখুন, তা কতইনা স্বাভাবিক ছিল এবং এভাবে বসায় কিরূপ আরামবোধ হয়। নিঃসন্দেহে মানুষ এভাবে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলেও ক্লান্তি অনুভব হবে না। কিন্তু আজ আমরা এভাবে না বসে যে পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকি এটা স্বভাবতই এক প্রকার বোঝা (ঝামেলা)। মনে হয়। যে সকল সাহেবগণ দাঁড়িয়ে অর্থাৎ BUFFET –এ খাওয়াকে সম্মান ও গৌরব মনে করে তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারা শুধু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতেরই বিরোধিতা করছে না বরং খানাকেও অসম্মান করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার মধ্যে অযথা কষ্টও করছে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার খানা টেবিলে রাখার ফলে একটা টানাটানি অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

অন্যদিকে দস্তরখানার উপর বসে খানা খেতে খুবই অল্প জায়গার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া এতে ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পারিক সসুম্পর্কের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা অন্য কোন পদ্ধতিতে সম্ভব নয়।

খানার মধ্যে তাড়াতাড়ি করা

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قُدِّمَ الْعِشَاءُ فَابْدَؤُا بِهٖ قَبْلَ اَنْ تُصَلُّوْا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوْا عَنْ عَشَائِكُمْ

"হযরত আনাস (রাযি) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, খানা সামনে এলে মাগরিবের নামায আদায়ের পূর্বেই খানা খেয়ে নাও এবং খানার মধ্যে তাড়াহুড়া করো না।" –বুখারী শরীফ

রাত্রের খানাকে عَشَاءٌ আশাউন বলা হয়। অধুনা সভ্যগণ রাত্রের খানা খুবই দেরী করে খেয়ে থাকে। খানা বিলম্বে খেয়ে এবং খাওয়ার পরই ঘুমিয়ে গেলে খানা ঠিকমত হজম হয় না। হজম শক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ডাক্তার ছিলেন না বটে, তবে লক্ষ্য করার বিষয় হল তাঁর কথাগুলি কতই না হেকমতপূর্ণ । তিনি বলেন দুপরের খানা খাওয়ার পর কায়লুলাহ অর্থাৎ কিছুক্ষণ শুয়ে আরাম করবে এবং রাত্রের খানা খাওয়ার পর চল্লিশ কদম হাঁটাহাঁটি করবে।

উপরোল্লিখিত হাদীসের উদ্দেশ্য হল, ক্ষুধার সময় সকল কাজের পূর্বে খানা খাবে। যদি কখনও এমনটি ঘটে যায় যে, খানা সামনে রাখা হয়েছে আর এদিকে নামাযের আযান হয়ে গেছে তাহলে এমতাবস্থায় প্রথমে খানা খাবে অতঃপর নামায আদায় করবে।

মাগরিবের নামাযঃ যার ওয়াক্ত খুবই সংকীর্ণ সে ক্ষেত্রেও ঠিক একই হুকুম। অর্থাৎ ওয়াক্ত চলে যাওয়ার ভয়ে জলদী জলদী খাবে না। বরং হাদীসে বলা হয়েছে – খানায় জলদী করো না; ধীরে ধীরে আরামের সঙ্গে খাও।

মনে রাখবে এমন ঘটনা কদাচিতই (কখনও কখনও) ঘটে থাকে। তবে এটাকে এমন অভ্যাসে পরিণত করে নিবে না যে, ঠিক নামাযের সময় খানা সামনে রাখা হবে আর নামায বাদ দিয়ে খানা খেতে বসে যাবে।

আল্লাহর নামে ডান হাত দ্বারা খানা শুরু করা

খানা-পিনার আদব সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় ছাড়াও দুটি বিষয় সর্বদা খেয়াল রাখা খুবই জরুরী ।

(১) খানা পিনা আল্লাহর নামে বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করা।

(২) ডান হাত দ্বারা পানাহার করা।

এ বিষয়গুলির উপকারিতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে নিজের পক্ষ হতে কিছু না লিখে সরাসরি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুল্যবান বাণী সমূহ উল্লেখ করার সৌভাগ্য লাভ করছি।

١- عَنْ عُمَرَو بْنِ اَبِىْ سَلْمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّ اللّٰهَ كُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ

(১) "হযরত আ'মর ইবনে আবূ সালমা (রাযিঃ) বলেন, আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নাম লও, অর্থাৎ বিসমিল্লাহ পাঠ কর,ডান হাত দ্বারা খাও এবং নিজের সম্মুখ থেকে খাও।" –বুখারী, মুসলিম

(২) হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাযি) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاِنْ نَسِىَ اَنْ يَّذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ اَوَّلِه فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ ـ

"তোমাদের মধ্যে কেউ যখন খানা খেতে শুরু করবে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে খানা আরম্ভ করবে। যদি প্রথমে আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায় তবে বিসমিল্লাহি আউওয়ালিহি ওয়া আখিরিহি বলবে–

–আবু দাউদ, তিরমিযী

(৩) "হযরত জাবের (রাযি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় ঘরে প্রবেশের সময় এবং খানা খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ্ পড়ে তবে শয়তান তার সাথীদের বলতে থাকে, চলো! এটা তোমাদের জন্য রাত্রি কাটাবার এবং খানা খাওয়ার স্থান নয়। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি ঘরে প্রবেশের সময় এবং খানা শুরু করার সময় বিসমিল্লাহ্ না পড়ে তবে শয়তান বলতে থাকে তোমাদের জন্য রাত্রি যাপন করার এবং খানা খাওয়ার স্থান উভয়ই মিলে গেছে।"

– মুসলিম শরীফ

(৪) হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাযি) বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছয়জন সাহাবী (রাযি)-এর সঙ্গে খানা খাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে একজন গ্রাম্য অশিক্ষিত লোক এসে তাদের সঙ্গে খেতে বসে দুই লোকমাতেই সব খানা খেয়ে ফেলল। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই ব্যক্তি যদি আল্লাহর নামে শুরু করত তবে তোমাদের সকলের জন্যেই এই খাদ্য যথেষ্ট হত।" – তিরমিযী শরীফ

(৫) হযরত ইবনে ওমর (রাযি) থেকে বর্ণিতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ اَحَدٌ مِّنكُمْ بِشِمَالِهٖ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَاِنَّ الشَّيْطٰنَ يَاْكُلُ بِشِمَالِهٖ وَيَشْرَبُ بِهَا

"তোমাদের কেউ বাম হাত দিয়ে খেও না। কেননা শয়তান বাম হাত দ্বারা পানাহার করে।" – সূনানে আবূ দাঊদ, তিরমিযী

খানা এবং অপব্যয়

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

"তোমরা খাও, এবং পান কর তবে অপব্যয় করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ্ অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না। –সূরাহ্ আরাফ ঃ আয়াত ঃ ৩১

পানাহার সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের উক্ত মহামূল্যবান নীতি গ্রহণ করে নেওয়ার পর হজম শক্তির গন্ডগোল এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। ইসরাফ (اسراف) শব্দটি সাধারনণত অপব্যয় ও অতিরিক্ত খরচ অর্থে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ সীমাতিরিক্ত খরচ।

কিন্তু খানা-পিনার ক্ষেত্রে অনর্থক খরচ অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়াকেই ইসরাফ বুঝায় না বরং খানা-পিনার মধ্যে দুই প্রকার ইসরাফ রয়েছে যা থেকে বিরত থাকা একান্ত জরুরী।

(১) কামমিয়াত বা পানাহারের পরিমাণের মধ্যে ইসরাফ বা অপব্যয় করা। (২) কাইফিয়াত বা খানার কোয়ালিটি ও গুণের মধ্যে ইসরাফ করা।

কামমিয়াত বুঝবার জন্য অন্য একটি সহজ শব্দ 'পরিমাণ' মাত্রা বা সংখ্যা ইত্যাদি বলা যায়। অর্থাৎ এত পরিমাণ আহার করা যে, সহজে হজম করতে সক্ষম না হয়, যার ফলে মারাত্মক অসুখে পতিত হতে হয়। নিয়মিত বদহজমী শুরু হয়, ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমস্যা এবং চিন্তা-ভাবনার মধ্যে বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি হয়। অনুভূতি শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, পাকস্থলী নিজ কর্মে অক্ষম হয়ে পড়ে। ঘুম বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং দুঃস্বপ্ন দেখা শুরু হয়। শরীর মোটা হওয়াটাও সাধারণত খানা-পিনার মধ্যে ইসরাফ করার ফল।

খানার কাইফিয়াত অর্থাৎ Quality গুণ বা অবস্থার মধ্যে ইসরাফ হল ঐ সকল জিনিস পানাহার করা যা তার দৈহিক চাহিদা স্বভাব ও মেজাজের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। অথবা মওসুম বা ঋতু হিসাবে উপযোগী না হওয়া। যেমন শীতকালে ঠান্ডা জাতীয় খাবার বা জ্বরের অবস্থায় জ্বরের অনুপযোগী বা প্রতিকুল গরম কিছু গ্রহণ করা। আল্লাহর কালাম যেহেতু চিরন্তন শ্বাশত ও সমগ্রবিশ্ববাসীর জন্যেই প্রযোজ্য সেহেতু তার স্বর্ণোজ্জ্বল নিয়ম পদ্ধতিও চিরন্তন শ্বাশত এবং সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য কল্যাণকর।

কিছুদিন পূর্বে "লুইংগ কারনারো" (Luigi cornoro) নামে ইটালির এক লেখক এ বিষয়ের মূলনীতি সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখেছেন। গ্রন্থটি সকল মহলেই সমাদৃত ও গ্রহনীয় হয়েছে। ইংরেজী এবং ইউরোপের কয়েকটি ভাষায় এই গ্রন্থ অনুদিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও আমরা যদি খানা পিনার ক্ষেত্রে ইসরাফে লিপ্ত থাকি তাহলে আমাদের চেয়ে দুর্ভাগা আর কে হতে পারে?

এবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীসমূহ লক্ষ্য করুন ঃ

(১) "মুসলমান এক নাড়ি দ্বারা খায় আর কাফের ও মোনাফেক সাত নাড়ি দ্বারা খেয়ে থাকে। – বুখারী শরীফ

(২) "ক্ষুধার অতিরিক্ত ভক্ষণকারীকে খুবই ঘৃণার চোখে দেখা হয়।"

– মুসনাদে দাইলামী

(৩) " যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অত্যধিক খাবে কিয়ামত দিবসে সে ঐ পরিমাণ ক্ষুধার্থ থাকবে।" – ইবনে মাজাহ

বেশী খাওয়ার ক্ষতি সমূহ

تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ تَعَالٰى مِنَ الرَّغْبِ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

"বেশী খাওয়া থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও।" (الكامل لابن عدى) খানা এবং ইসরাফ অধ্যায়ে আমরা খানা পিনার মধ্যম পন্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে খানা-পিনার মধ্যে অতিরিক্ত আহারের ক্ষতিকর দিকগুলি তুলে ধরছি।

(১) **ডায়েবেটিসঃ** অধিক ভোজনের প্রাথমিক ফল হল ডায়াবেটিস। কেননা বেশী খাওয়ার কারণে লালাগ্রন্থীকে বেশী কাজ করতে হয়। এ কারণে অভ্যন্তরীণ আদ্রতা (রস বা insulin অর্থাৎ বহুমূত্র রোগের প্রতিষেধক) কমে যায় এবং রক্তে চিনির (Sugar) পরিমাণ বেড়ে যায়।

(২) **ব্লাড প্রেসার ঃ** অধিক ভোজন রক্তের চাপ বৃদ্ধির একটা অত্যাবশ্যকীয় দ্বিতীয় কারণ। কেননা ডায়াবেটিস এবং ব্লাড প্রেসার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

(৩) **ফালেজ বা প্যারালাইসিস ঃ** প্যারালাইসিসও অধিক ভোজনের কারণে হয়ে থাকে। এতে রক্তবাহী শিরাগুলি সংকীর্ণ হয়ে যায়, ফলে রক্ত চলাচল বাঁধা প্রাপ্ত হয়। এভাবে যখন শিরাগুলি একেবারেই সংকীর্ণ হয়ে পড়ে তখন সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনুভূতিহীন হয়ে যায়। আর এ অবস্থাটি মস্তিষ্কের কোন অংশে হঠাৎ প্রকাশ পেলে মানুষ প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়।

(৪) **হৃদ রোগঃ** শিরার সংকীর্ণতা হৃদ রোগের অন্যতম কারণ। কেননা শিরার চূড়ান্ত সংকীর্ণতা হৃদপিন্ডের সংগে সম্পর্কযুক্ত হয়। এমতাবস্থায় হৃদপিন্ডের বিবর্তন হওয়া এক অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

(৫) **অসময়ে বার্ধক্যে পতিত হওয়া ঃ** অধিক ভোজনের ফলেই এ অবস্থা হয়ে থাকে। কেননা বেশী খেলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি যথাযথভাবে কাজ করতে অপরাগ হয়ে পড়ে। ফলে মানুষ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই দুর্বল বা শক্তিহীন হয়ে যায় এবং তাকে বৃদ্ধ মনে হতে থাকে।

(৬) **শরীর মোটা বা স্থুল হওয়াঃ** এটাও অধিক ভোজনের কারণে হয় এবং এই অবস্থায় আরো বহু রোগের কারণ হয়। যেমন শরীরের জোড়ার রোগ ও অস্থিমজ্জার ব্যথা ইত্যাদি।

(৭) অজীর্ণ গ্যাস্টিক এবং অতিসার তথা ধ্বংসাত্মক ব্যাথাও অধিক ভোজনের ফল। এতে মানুষ পায়খানা ও প্রস্রাবের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এভাবে ভাল মানুষও (অনেক সময়) পাগল উন্মাদ পর্যন্ত হয়ে যায়।

মোটকথা অধিক ভোজ হাজরো সমস্যা সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে যদি কেউ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের উপর আমল করে, সময় মত এবং জরুরত পরিমাণ খানা খায় তবে সর্বদাই সুস্থ শরীরে সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। এ সম্পর্কে নিম্নের বাণীটি লক্ষ্য করুন ঃ

"মানুষের জন্য কোমর সোজা রাখার মত কয়েক লোকমা (সামান্য) খানাই যথেষ্ট। আর যদি একান্তই বেশী খাওয়ার আবশ্যক হয়ে পড়ে তবে পেটের এক তৃতীয়াংশ খানা, এক তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা পূর্ণ করবে এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস প্রশ্বাসের জন্যে খালি রাখবে।"

অল্প অল্প খাওয়া

"হযরত জাবালা ইবনে সুহাইম (রাযি) বর্ণনা করেন, তখন ছিল দুর্ভিক্ষের বছর। আমরা ইবনে যুবায়ের (রাযি)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদেরকে খাওয়ার জন্যে খেজুর দেওয়া হতো। একদিন আমরা যখন খানা খাচ্ছিলাম তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি) আমাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ

لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْقِرَانِ

"তোমরা (দুইটি খেজুর) একত্রে মিলিয়ে খেয়ো না, কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোকে একত্রে খেতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি বললেন তবে তার ভাই (যার সঙ্গে সে একত্রে খাচ্ছে) অনুমতি দিলে এর ব্যতিক্রম করে খেতে পারবে। — বুখারী মুসলিম শরীফ

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রাযি) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব বড় একটা পিয়ালা ছিল যার নাম ছিল "গার্‌রা"(غُرَّاء) এটাকে চার জনে উঁচু করতে হত। (সম্ভবতঃ এটা ডেক জাতীয় বর্তন হবে। চাস্তের নামায শেষ করে সকলে মিলে এটা নিয়ে যেতেন। অতঃপর এর মধ্যে সারীদ (এক প্রকার সুস্বাদু খানা) পাকান হত। সাহাবীদের (রাযি) সংখ্যা যখন বেশী হত তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাটুতে ভর করে বসে যেতেন। একদা এক গ্রাম্য লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে বসা দেখে বলল, এটা কেমন বসা ? লোকটির কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ جَعَلَنِىْ كَرِيْمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا عَنِيْدًا - ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلُوْا مِنْ حَوَالِيْهَا وَدَعُوْا ذِرْوَتَهَا يُبَارِكُ فِيْهَا

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ আমাকে উদার, দয়াশীল করে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাকে অবাধ্য হঠকারী ও উদ্ধত করেন নাই। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা বর্তনের একপার্শ্ব হতে খাও এবং উপরের অংশ বাদ রাখ। (কারণ) আল্লাহ্ এটা থেকে তোমাদের জন্য বরকত নাযিল করবেন।" – আবূ দাউদ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি) থেকে বর্ণিত ঃ

اَلْبَرَكَتُ تَنْزِلُ فِىْ وَسَطِ الطَّعَامِ فَكُلُوْا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوْا مِنْ وَسَطِهِ

"খানার মধ্যখানে বরকত নাযিল হয়। তোমরা খানার কিনারা থেকে খাও এবং মধ্যখান থেকে খেয়ো না।" – তিরমিযী শরীফ

খানার মধ্যে ফুঁক দিও না

لَا يَنْفَخُ فِى الطَّعَامِ الْحَارِّفَهُوَ مَنْهِىٌّ عَنْهُ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, গরম খানার মধ্যে ফুঁক দিও না। কেননা এটা করতে নিষধ করা হয়েছে।"

–মুসনাদে ইমাম আহমদ, ইবনে মাজাহ

আল্লাহ! আল্লাহ! খানার মধ্যে ফুঁক না দেওয়ার উপদেশ কতই না হেকমতপূর্ণ শিক্ষা। কারণ দাঁতের মধ্যে যে সকল অসুখ হয়ে থাকে তার কোন কোনটি সংক্রামক ব্যাধি অর্থাৎ একজন থেকে অন্যের দেহে ছড়ায়) কারো কারো মুখ থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বের হয়। এমতাবস্থায় প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, খানার মধ্যে ফুঁক দেওয়া অন্যের জন্য কতটুকু কষ্টের কারণ হয় এবং স্বয়ং ভক্ষণকারীর জন্যই বা কতটুকু ক্ষতিকর। এটা হল গরম খাদ্যে ফুঁক দেওয়ার কথা। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বেশী গরম খানা পছন্দই করতেন না। তিনি বলতেন, এর মধ্যে বরকত হবে না। এটা সতঃসিদ্ধ কথা যে, আপনি পরীক্ষামূলকভাবে রুটির তাওয়া থেকে গরম গরম রুটি তুলে তুলে খাওয়া শুরু করুন এবং লক্ষ্য করে দেখুন সাধারণ খানার চেয়ে অধিক খেতে পারেন কি না এবং খাওয়ার সময় রুটির পরিমাণ সম্পর্কিত বোধটুকুও থাকে কি না।" –মুসতাদরাকে, হাকিম, মুজামে তাবরানী

গরম খানা ভক্ষণে গালের ছাল উঠে যায় এবং পরিপাক তন্ত্রের সুস্থতা (অর্থাৎ স্বাভাবিক কার্যক্ষমতার উপর প্রভাব পড়ে। গরম গরম খানার মধ্যে ঠান্ডা পানি

পান করাতো (আর এর প্রচলন এখন খুবই ব্যাপক) দাঁতের সঙ্গে বড় জুলুম করার শামিল। বিশেষ করে গরমকালে বরফের ঠান্ডা পানি পানকারীর জন্য গরম খানা খাওয়া খুবই ক্ষতিকর। সুতরাং ধীরস্থির ভাবে এতমিনানের সঙ্গে খানা খাওয়া উচিত, যাতে ফুঁক দিয়ে ঠান্ডা করার প্রয়োজন না হয় বা দাঁত ও পরিপাকের জন্য ক্ষতিকর না হয়।

পড়ে যাওয়া লোকমা

عَنْ جَابِرٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَاْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذًى وَلْيَاْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ -

"হযরত জাবের (রাযি) থেকে বর্ণিত ঃ তোমাদের মধ্যে কারো লোকমাহ পড়ে গেলে তা তুলে নাও এবং মাটি ইত্যাদি পরিষ্কার করে খেয়ে ফেল এবং শয়তানের জন্য এটা রেখে দিও না।" – মুসলিম শরীফ

এ বিষয়ে অন্য এক হাদীসের বর্ণিত বাক্য হল; সর্বাবস্থায়ই শয়তান তোমাদের নিকট এসে থাকে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কারো কোন লোকমা পড়ে গেলে তা থেকে মাটি ইত্যাদি পরিষ্কার করে খেয়ে নাও; শয়তানের জন্য এটা রেখে দিওনা।"

আমাদের এযুগে পাকী নাপাকীর অনুভূতিই তো প্রায় উঠে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা এবং ইস্তিঞ্জার এহতেমাম না করা একটা ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে হাত থেকে কোন খাদ্য দ্রব্য পড়ে গেলে তা উঠিয়ে খাওয়া খারাপ মনে করা হচ্ছে। মনে করা হয় এটা নাপাক হয়ে গেছে, চাই সেটা শুকনা কোন খাবার হোক না কেন। আসল কথা হল রিযিকের গুরুত্ব এবং নেয়ামতের কদর সম্পর্কিত অনুভূতি অন্তর থেকে মুছে গেছে তাই বরকতও উঠে গেছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "হাতের লোকমা পড়ে গেলে তা পরিষ্কার করে খেয়ে নাও। তুমি না খেলে এটা শয়তানের লোকমায় পরিণত হবে এবং তোমাদের খাদ্য শয়তানের কাজে আসবে।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই তালীমের প্রতিক্রিয়া এমন হয়েছিল যে, আমাদের বুযুর্গগণ খাদ্যের কণা এবং লবনের দানা পর্যন্ত যত্নের সঙ্গে ভক্তি সহকারে চেটে খেয়ে নিতেন।

পতিত খানা

পড়ে যাওয়া খানা সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ

مَنْ اَكَلَ مَا سَقَطَ مِنَ الْمَائِدَةِ عَاشَ فِى سَعَةٍ وَ عُوفِى فِى وَلَدِهِ

"যে ব্যক্তি দস্তরখানা থেকে পড়ে যাওয়া খানা উঠিয়ে খেয়ে নিল তার দস্তরখানা প্রশস্থ হয়ে গেল অর্থাৎ তার রিযিকের মধ্যে বরকত এসে গেল এবং তার সন্তান-সন্ততি সুস্থতা ও নিরাপত্তা পেয়ে গেল।"

এ সম্পর্কে অন্য একটি হাদীস হলো ঃ

اٰمَنَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَصَرَفَ عَنْ وَّلَدِهِ الْحُمْقُ

"সে দারিদ্র এবং মুখাপেক্ষিতা হতে নিরাপদ হয়ে গেল। ধবল ও কুষ্ঠরোগ থেকে রক্ষা পেল এবং তার সন্তানাদি থেকে নির্বুদ্ধিতা ও বোকামি দূর হয়ে গেল।"

এ সম্পর্কিত তৃতীয় হাদীসের বর্ণনা ঃ

اُعْطِى سَعَةً مِّنَ الرِّزْقِ

"তার রিযিকের মধ্যে প্রশস্ততা (স্বচ্ছলতা ও বরকত) দান করা হয়।"

হযরত জাবের (রাযি) থেকে অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

اِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَاْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذًى وَلْيَاْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ -

"তোমাদের কারো কোন লোকমা পড়ে গেলে তা তুলে নাও (অতঃপর) এর উপর যে সকল ময়লা লেগে গেছে তা পরিষ্কার করে খেয়ে ফেল এবং শয়তানের জন্য এটা ছেড়ে দিও না।" – মুসলিম শরীফ

আমাদের নিজেদের মনগড়া অথবা পাশ্চাত্য থেকে ধার করা সভ্যতানুযায়ী পতিত খাদ্যদ্রব্য উঠিয়ে খাওয়া আদব (ATICATE বা ভদ্রতা) এর পরিপন্থী মনে করা হয়। আমাদের বুঝেই আসে না যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোল্লেখিত ইরশাদ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আমাদের স্বেচ্ছাচারিতার কি অধিকার থাকতে পারে।

পতিত খানার বরকত সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত ফরমান একবার আমাদের চিন্তা করে দেখা উচিত। পতিত খানা উঠিয়ে খাওয়ার বরকত ও উপকারিতা–

১। খানা এবং রিজিকের মধ্যে বরকত ও প্রশস্ততা আনে।
২। সন্তানাদির সুস্থতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
৩। অভাব-অনটন ও ভিক্ষাবৃত্তি ও অনাহার থেকে নিরাপদ রাখে।
৪। কুষ্ঠ রোগের মত ব্যাধি থেকে রক্ষা করে।
৫। সন্তান সন্ততি নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী হতে রেহাই পায়।
৬। স্বীয় খানা শয়তানের খাদ্য হয় না।

আমাদের উচিত পাশ্চাত্য সভ্যতার ছোবলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে জলাঞ্জলী না দিয়ে পতিত খানা ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করতঃ ভক্তি সহকারে বিনা দ্বিধায় খেয়ে নেওয়া। এতেই মঙ্গল ও বরকত রয়েছে।

টেক লাগিয়ে খেয়ো না

كَانَ يَقُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اٰكُلُ مُتَّكِاً

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তাকিয়া বা টেক লাগিয়ে খাই না।" এ বিষয়ে হযরত আলী ইবনে আকমর (রযিঃ)-এর বর্ণিত অন্য এক হাদীস হলঃ

اَمَّا اَنَا فَلَا اٰكُلُ مُتَّكِئًا

"যথা সম্ভব আমি টেক লাগিয়ে খাই না।" –বুখারী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টেক দিয়ে খাওয়া কেন পছন্দ করতেন না? এ প্রশ্নের জবাব হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রা সহধর্মিনী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর মোবারক জুবানেই শুনুন। তিনি বলেন। আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম (আমার জীবন আপনার উপর কুরবান হোক) "আপনি তাকিয়া লাগিয়ে আহার করুন" একথা শুনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা মোবারক জমিনের দিকে ঝুকিয়ে বললেন,

اِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ اَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ وَاٰكُلُ كَمَا يَاْكُلُ الْعَبْدُ

"আমি আল্লাহর একজন গোলাম মাত্র। তাই এই ভাবে আমার বসা শোভা পায় যেভাবে একজন গোলাম (মনিবের সামনে) বসে। আর এমন ভাবেই আমার খানা খাওয়া উচিত যেমনভাবে একজন গোলামের তার মনিবের সামনে খাওয়া শোভা পায়। –আহকামুন নবুওয়াত

চিন্তার বিষয়, এ বিনয় ও নম্রতা এবং বন্দেগী ও দাসত্বের প্রকাশ এমন ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পেয়েছে যিনি বিশ্ব জাহানের সর্দার, সৃষ্টির মূল, যার কারণেই বিশ্ব জাহান অস্তিত্ব লাভ করেছে, যার জন্য চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে আমাদের অবস্থা হলো আমরা সর্বক্ষণই উদ্ধত ও বাবুয়ানায় লিপ্ত থাকি। অসুস্থতা অথবা কোন অপারগতার কারণে কখনো টেক লাগিয়ে খাওয়া দাওয়া করলে তো কোন কথা নাই। তবে একজন সুস্থ সবল ও সামর্থবান লোকের জন্য কখনোই এভাবে খাওয়ার অনুমতি নাই। আল্লাহর কোন বান্দা তার দেওয়া নেয়ামত খাবে আর বাঁকা হয়ে বাবুয়ানা কায়দায় বসবে এটা তার দাসত্বের পরিপন্থী।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মিলিত খানা

সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আনাস (রাযি) বর্ণনা করেন ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ وَحْدَهُ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী খানা খেতেন না।" এটা শুধু মাত্র একজন সাহাবীর (রাযি) বর্ণনা নয়, বহুসংখ্যক সাহাবাদের বর্ণনা এবং তাদের নিজেদের সম্মিলিত খাওয়ার আমলই এ বিষয়ে স্বাক্ষ্য বহন করে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথকভাবে খানা খেতেন না বরং মজলিসে উপস্থিত ছোট বড় সকল পর্যায়ের লোকদের নিয়ে খানা খেতেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মাত্র মজলিসের সকল ব্যক্তিদের খানায় শরীক করতেন না। বরং আমীর, গরীব, ছোট বড় ইত্যাদির মধ্যে কোন পার্থক্য না করেই সাথীদেরকে নিজ বর্তনের খানায় শারীক করতেন। উপস্থিত সকলকেই একই দস্তরখানায় বসাতেন এবং একই বর্তনে, একই স্থানে বসিয়ে খাওয়াতেন।

হযরত জাবের (রাযি) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "একজনের খানা দু'জনের এবং দু'জনের খানা চারজনের ও চারজনের খানা আটজনের জন্য যথেষ্ট হয়।" –মুসলিম

আধুনিক সভ্যতা মানুষকে অনেক কিছুই দিয়েছে। নবনব আবিষ্কার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা দূরকে করেছে নিকট; প্রচার মাধ্যমের যন্ত্রগুলি সমগ্র দুনিয়াকে করেছে একাকার। কিন্তু মানুষকে ভদ্রতা এবং মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে। মানুষের পরস্পরে একের থেকে অপরকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। একত্রে দস্তরখানার উপর খানা খাওয়ার মানসকিতা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেকে ব্যক্তিগত প্লেট ও গ্লাস ব্যবহার করছে। ফলে একত্রে খাওয়ায় যে ভালবাসা হৃদ্যতা ও মহব্বত সৃষ্টি হত তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। আসুন! আমরা আবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে জীবন্ত করি।

একত্রে খাওয়ার আদব

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُوْمُ رَجُلٌ حَتّٰى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَاِنْ شَبِعَ حَتّٰى يَفْرُغَ الْقَوْمُ وَلْيُعْذِرْ فَاِنَّ ذٰلِكَ يُخْجِلُ جَلِيْسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ وَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ فِى الطَّعَامِ حَاجَةٌ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দস্তরখানা বিছাবার পর অর্থাৎ কোন মজলিসে একত্রে খাওয়া শুরু করার সময় ততক্ষণ পর্যন্ত উঠবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দস্তরখানা উঠিয়ে নেওয়া না হয় অর্থাৎ সকলের খাওয়া শেষ না হয় এবং কোন ব্যক্তি খেয়ে তৃপ্ত হয়ে গেলেও সকল লোক ফারেগ না হওয়া পর্যন্ত খানা থেকে হাত উঠাবে না। তবে একান্ত অপারগ হলে অপরাগতা পেশ করবে। নতুবা বৈঠকের সাথীদের লজ্জা করবে এবং তারা খানা বন্ধ করে দিবে। অথচ হতে পারে তাদের খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।" –ইবনে মাজাহ

স্বয়ং বিশ্ব জাহানের সর্দার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ঃ

اِذَا اَكَلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ اٰخِرَهُمْ اَكْلًا

"নবী করীম (সাঃ) যখন অন্যান্যদের সঙ্গে খানা খেতেন তখন সকলের শেষে খানা শেষ করতেন।"– মিশকাত শরীফ

উক্ত হাদীস দ্বারা আমরা নিম্নোক্ত মুলনীতিগুলির শিক্ষা পাই।

১। দস্তরখানায় খাওয়ার পর খানা রেখে দস্তরখানা থেকে উঠবে না।

২। সকলে খানা থেকে ফারেগ না হওয়া পর্যন্ত খানা খাওয়া বন্ধ করবে না। কারণ, হতে পারে অন্যের পেটে এখনও ক্ষুধা রয়েছে। তাই তোমরা খাওয়া বন্ধ করে দিলে সেও খানা থেকে হাত তুলে নিয়ে ক্ষুধার্থ থেকে যাবে।

৩। যদি তোমার কোন অসুবিধা থাকে তাহলে অপারগতা পেশ করবে।

একত্রে খাওয়ার বরকত

পূর্ব অধ্যায়ে একত্রে খাওয়া সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ জেনেছেন। এখন সাহাবায়ে কেরামদের (রাযিঃ) আমল সম্পর্কে ঐতিহাসিক প্রমাণ এবং তাদের ইসলামী সভ্যতা ও আদর্শের বরকত সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন।

كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يَقُوْلُوْنَ الْاِجْتِمَاعُ عَلَى الطَّعَامِ مِنْ مَّكَارِمِ الْاَخْلَاقِ

"হযরত সাহাবায়ে কেরামগণ বলতেন, একত্রে খানা খাওয়া মহৎ চরিত্রের পরিচায়ক।"

হযরত ওয়াহ্শী ইবনে হরব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা পানাহার করি কিন্তু তৃপ্ত হই না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সম্ভবত তোমরা পৃথক পৃথক ভাবে খাও? তাঁরা বললেন, জি হ্যাঁ। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

اِجْتَمِعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيْهِ

"তোমরা একত্রে খানা খাও। এতে তোমাদের খানায় বরকত হবে।" এ বরকতের বাহ্যিক প্রকাশ ও বাস্তব প্রমাণ হলো সর্বদা দুইজন পৃথক পৃথক ব্যক্তির খানা একত্রে তিন জনের এবং তিনজনের খানা চার জনের জন্য যথেষ্ট হয় এবং কেউই ক্ষুধার্থ থাকে না। আর এর বিপরীত এই লোকগুলি যদি উক্ত খানাই পৃথক পৃথক ভাবে খায় তবে কারো কারো হয় তো পেট ভরে যাবে বরং এমনও হতে পারে যে দু'চার লোকমা অবশিষ্টও থেকে যেতে পারে। যা কারো উপকারে আসবে না। আবার কেউ হয়তো বা ক্ষুধার্থও থেকে যেতে পারে। কারণ প্রত্যেকের খোরাক ও অবস্থা এক রকম নয়। এটা হলো খায়ের বরকতের বস্তুগত দিক। আর রূহানী ফায়দার তো কোন পরিসীমাই নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ الطَّعَامِ مَا كَثُرَتِ الْاَيْدِىْ

"উত্তম খানা হল যার মধ্যে অধিক হাত (বেশী লোক) শরীক হয়।"

উপুড় হয়ে শুয়ে খেয়োনা

হযরত সালেম যুহরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন,

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّاكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلٰى وَجْهِهٖ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে নিষেধ করেছেন যে, কেউ যেন উপুড় হয়ে শুয়ে না খায়।"

বাহ্যতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত বাণীর সঙ্গে দ্বীনী আকিদা, ইসলামী নীতিমালা এবং ধর্মীয় বিষয়ের কোন সম্পর্ক নাই বরং এটা

একটা খালেস চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যাপার এবং শারিরীক সুস্থতার খাতিরে উক্ত নির্দেশ মেনে চলা নেহায়েত জরুরী। উপুড় হয়ে শুয়ে খাওয়া শুধু স্বাস্থ্যগত ও ভদ্রতার পরিপন্থী নয় বরং এটা পশুর স্বভাবও বটে। তাছাড়া এটা হজমশক্তি ও পরিপাক প্রক্রিয়ার জন্য অশেষ ক্ষতিকর। আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহানী ও শারীরিক তালীমের পরিপন্থী তো বটেই, কারন চিকিৎসা শাস্ত্রও তাঁর তালীমের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলাম শুধু মাত্র কতিপয় আকীদা বিশ্বাসের নাম নয় এবং ইসলামী শিক্ষা শুধু কিছু মাযহাবী ইবাদত ও প্রকাশ্য রীতিনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। বরং ইসলামী শিক্ষা পুরা মানবীয় যিন্দেগীর অন্তর্ভুক্ত। আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিন্দেগীর প্রতিটি ক্ষেত্রেই পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অসভ্য, বর্বর এবং মুর্খ জাতির মধ্যে প্রেরিত হন এবং নিজেও উম্মি (অক্ষর জ্ঞান শূন্য) ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর তা'আলার ওহীর মাধ্যমে তিনি দুনিয়াবী ইলম ও কৌশল ইত্যাদি এ পরিমাণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন যা বড় বড় পন্ডিত বুদ্ধিমান ও দার্শনিকগণ অর্জন করতে সক্ষম হয় নাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পদাংক অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন।

রুটি দ্বারা আঙ্গুল পরিষ্কার করা

রিযিক আল্লাহ তা'আলার এক বড় নিয়ামত। আর নিয়ামত যত বড় হয় তার আদব-সম্মান করাও ততবেশী আবশ্যক হয়ে পড়ে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইরশাদ করেন ঃ

اَكْرِمُوا الْخُبْزَ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْزَلَهُ مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْخُبْزِ

"রুটির আদব ও সম্মান কর। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা এটাকে বরকতের আকাশ হতে পাঠিয়েছেন এবং তোমরা রুটি দ্বারা স্বীয় হাত পরিষ্কার করো না।" স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়ার পর তিনবার আঙ্গুল চাটতেন।" –মুসতাদরাক

হযরত আনাস (রাযি) এ বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য এক ইরশাদ বর্ণনা করেন ঃ

لَا يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتّٰى يَلْعِقَ اَصَابِعَهُ فَاِنَّهُ لَا يَدْرِىْ فِىْ اَىِّ طَعَامِ الْبَرَكَةُ

" কোন ব্যক্তি তার আঙ্গুল চেটে পরিষ্কার না করা পর্যন্ত রুমাল দ্বারা স্বীয় হাত ছাফ করবে না। কারণ কোন্ খানার মধ্যে কি বরকত আছে তার জানা নাই।"

এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحُ اَصَابِعَهُ حَتّٰى يَلْعِقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا

"তোমাদের মধ্যে কেউ খানা খেলে ঐ সময় পর্যন্ত তার আঙ্গুল মুছবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে তা চেটে না নেয় অথবা কারো দ্বারা চাটায়।"

– বুখারী, মুসলিম

উক্ত হাদীসসমূহে যে বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা হল– খানার সম্মান, বিশেষ করে রুটির সম্মান করা। মূলতঃ রিযিক আল্লাহ তা'য়ালার নিয়ামতসমূহের একটা বড় নিয়ামত। তাই এর ইজ্জত-সম্মান করা সর্ব বিবেচনায়ই ওয়াজিব। রুটি দ্বারা হাত-মুছা (পরিষ্কার করা) রুটিকে অবজ্ঞা করার শামিল। কারণ রুটি তো খাওয়ার জন্য, হাত পরিষ্কার করার জন্য নয়।

আঙ্গুল চাটা

(١) عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْعَقُ اَصَابِعَهُ ثَلٰثًا

১। "কাব ইব্‌নে মালেক (রাযিঃ) এর ছেলে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার আঙ্গুল চাটতেন।"

(٢) عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَكَلَ طَعَامًا لَعَقَ اَصَابِعَهُ الثَّلٰثَ

২। "হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা শেষ করে তিনটি আঙ্গুল চাটতেন।"

৩। "কা'ব ইব্‌নে মালেক (রাযিঃ) এর ছেলে তার পিতা থেকে এভাবেও বর্ণনা করেন যে, "হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তিন আঙ্গুল দ্বারা খানা খেতেন এবং খানা খাওয়ার পর আঙ্গুলগুলি চাটিয়ে নিতেন।"

(এই হাদীস তিনটি শামায়েলে তিরমিযী থেকে নেয়া হয়েছে।)

উপরোক্ত হাদীস সমূহের মাধ্যমে আমরা দুটি বিষয় শিক্ষা লাভ করতে পারি ঃ

(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন আঙ্গুল দ্বারা খানা খেতেন। সম্পূর্ণ হাতে তরকারী লাগাতেন না। কেননা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল। (২) খাওয়ার পর কাপড়

দ্বারা হাত পরিষ্কার করা এবং পানি দ্বারা হাত ধৌত করার পূর্বে তাঁর আঙ্গুল মোবারক চেটে নিতেন। আঙ্গুল চাটা মানুষের জন্মগত অভ্যাস। তাই প্রত্যেক শিশুই প্রকৃতিগতভাবে তাদের আঙ্গুল চেটে থাকে। ডাক্তারী মতে এ কাজটি পরিপাকের জন্য অত্যন্ত জরুরী। দুর্ভাগ্য যে, আধুনিক সভ্যতার দৃষ্টিতে আঙ্গুল চাটা এমনকি হাত দ্বারা খাওয়া পর্যন্ত নীচুতা অভদ্রতা মনে করা হয়। কিন্তু আমাদের এত কি দায় পড়ল যে, নিজেদের সুন্দর পদ্ধতি ও উত্তম আদর্শ ছেড়ে দিয়ে অন্যের অন্ধ অনুসরণ করতে হবে?

পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় খানা

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعِيْبُ مَا كُوْلًا كَانَ اِذَا اَعْجَبَهُ اَكَلَهُ وَاِلَّا تَرَكَهُ

হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন যে, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানার দোষ বের করতেন না। খানা পছন্দ হলে খেয়ে নিতেন অন্যথায় চুপ থাকতেন।"

প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট সব জিনিস একই রকম প্রিয় নয়। কোন এক ব্যক্তির যে প্রকার খানা পছন্দ অন্যের তা পছন্দ নয়, এটা একটা স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। তবে এ কথাটি স্মরণ রাখা উচিত যে, রিযিক আল্লাহর একটা নিয়ামত। এতে দোষ-ক্রুটি বের করা রিযিকের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের নামান্তর। সর্বোপরি এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের বিরোধিতা ও আল্লাহপাকের নাশুকরিয়া করা হয়। তাই আদৌ আমাদের এরূপ করা উচিত নয়।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই কোন খানায় দোষ ধরেন নাই। মনে চাইলে খেতেন আর মনে না চাইলে রেখে দিতেন। –বুখারী, মুসলিম

এ সম্পর্কে এক বুযুর্গের ঘটনা পাঠ করুন, তাহলো এক বুযুর্গের ইন্তিকালের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছেন? তিনি জবাবে বললেন, হিসাব নিকাশের সমস্যা সহজেই মিটে গেছে। প্রশ্নকারী (আবার) বললেন, কোন্ নেক কাজটি কাজে এসেছে? বুযুর্গ জবাবে বললেন, আমার স্ত্রী একদিন খিচুড়ী পাকাতে গিয়ে ভুলে অতিরিক্ত লবন দিয়ে ফেলে। আমি খিচুড়ীর লোকমা মুখে দিতেই মনে হল মুখে যেন বিষ পুরে দিয়েছি। তখন অনিচ্ছায় মুখ থেকে ফেলে দিতে ইচ্ছা করল। কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হলো এটা তো আল্লাহর

নিয়ামত। বিবির সামনে অসন্তোষের একটা শব্দও উচ্চারণ না করে উক্ত খিচুড়ি পেট ভরে খেয়ে নেই। এই আমলটি আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দ হয়ে যায় এবং ক্ষমার নির্দেশ মিলে।

দুই বা ততোধিক খানার মধ্যে বাছাই

দোজাহানের সর্দার আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্রতা ও অনাহারে জীবন যাপন করেছেন তা সকলেই অবগত। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী তাঁর পবিত্র হায়াতে এমন সুযোগ কখনো আসে নাই যে, সপ্তাহের সাতদিন চুলা জ্বলেছে। এ কথা স্পষ্ট যে, এমতাবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দস্তর খানায় খুব কমই একাধিক খানা এসে থাকবে। আমরা নালায়েক উম্মত একমাত্র তাঁর উসিলাতেই আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত ভোগ করছি। অথচ শুকরিয়ার শব্দটিও মুখে উচ্চারণ করি না।

দস্তরখানায় একাধিক খাদ্য আসলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পদ্ধতি অবলম্বন করতেন তা তাঁর জীবন সঙ্গিনী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর ভাষায় শুনন।

তিনি বলেন,

مَاخَيَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ شَيْئَيْنِ اِلَّا اِخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا

নবী করীমসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখস্থ খানার মধ্যে পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারে এই নীতি ছিল যে, খানার মধ্যে যা অধিক সহজ ও সাধারণ হত সেটাই বেঁচে নিতেন।" –বুখারী ও মুসলিম শরীফ

এটা শুধু খানার ক্ষেত্রেই নয় বরং সকল ক্ষেত্রেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহজ সরল পদ্ধতি পছন্দ করতেন, কঠিন বিষয় কখনও গ্রহণ করতেন না। একটা প্রশস্ত দস্তরখানার উপর অনেক খানা থাকা অবস্থায় আমাদের কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত এ ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ হল ঃ

كُلْ مِمَّا يَلِيْكَ

"তোমাদের নিকট থেকে খানা খাও।" লম্বা লম্বা হাত মারা এবং অন্যের সম্মুখ থেকে উঠিয়ে খাওয়া ইসলামী আদব ও শিষ্টাচারের খেলাপ। সর্বদাই নিজের সম্মুখস্থ বর্তন থেকে খাওয়া উচিত।

খানা বন্টনের পদ্ধতি

اَلاَيْمَنُ فَالاَيْمَنُ

"যে ব্যক্তি ডান দিকে রয়েছে তার হক বেশী।"

একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণের এমন একটি মজলিসে তাশরিফ রাখেন যে মজলিসে সাহাবীগণের বসার তরতীব ছিল এরূপ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাম দিকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি)-এবং তাঁর ডান দিকে একজন গ্রাম্য ব্যক্তি ছিল এবং তার সঙ্গে হয়রত ওমর ফারুক (রাযিঃ) বসে ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে দুধ পাঠালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু পান করে স্বীয় অভ্যাসানুযায়ী মজলিসের সাহাবীদের পালাক্রমে দিতে ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাযিঃ) আরয করলেন, প্রথমে আবূ বকর (রাযিঃ)কে দিন। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান দিকে বসা গ্রাম্য লোকটিকে দিলেন (যার সঙ্গে হযরত ওমর (রাযিঃ) উপবিষ্ট ছিলেন।

এবং ইরশাদ ফরলেন اَلاَيْمَنُ فَالاَيْمَنُ

"যে ব্যক্তি ডান দিকে আছে, তার হক (অধিকার) বেশী।"

হযরত সাহল ইবনে সাআদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু পানীয় নিয়ে এলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু পান করলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান দিকে একটা ছেলে এবং বাম দিকে এক বৃদ্ধ বসা ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি কি এই বৃদ্ধকে আগে পান করাবার অনুমতি দিবে? ছেলেটি জবাবে বলল, কখনও নয়। যে অংশটুকু আপনার থেকে আমি লাভ করতে যাচ্ছি তাতে কাউকেই প্রাধান্য দিব না। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়ালাটি ছেলেটির হাতের উপর রেখে দিলেন।" – বুখারী, মুসলিম

এ বর্ণনা থেকেই সম্মিলিত ইসলামী পানাহারের এ পদ্ধতি নির্ধারিত হয় যে, খানা-পিনা অথবা অন্য কোন জিনিস বন্টন করতে হলে ডান দিক থেকে বন্টন শুরু করবে। আর সর্বসম্মত অভিমত হলো ডান দিকে ছোট বা বড় যেমন লোকই থাকুক না কেন সকল অবস্থাতেই এই একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

অপরকে খাওয়ানো

(মেহ্নমানদারী করা)

خَيْرُكُمْ مَنْ اَطْعَمَ الطَّعَامَ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে অপরকে খানা খাওয়ায়।" –মুসতাদরাকে হাকেম

এর বিপরীত যে ব্যক্তি গরীব মিসকিনদের খানার ব্যবস্থা করেনা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালামে তাকে কিয়ামত দিবসের প্রতি মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করা হয়েছে।'

এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ এবং উৎসাহ ও প্রেরণামূলক হাদীস এত অধিক রয়েছে যে, যা একত্রিত করলে আলাদা এক গ্রন্থ তৈরী হয়ে যাবে। আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কথা পর্যন্ত বলেছেন যে, প্রতিবেশী ক্ষুধার্থ হয়ে শুয়ে আছে এ কথা জেনেও যে ব্যক্তি উদরপূর্ণ করে খায়, তার এই খানা সম্পূর্ণ জায়েয ও হালাল উপার্জনের মাধ্যমে অর্জিত হলেও সে যেন জেনে রাখে যে, সে হারাম খাদ্য দ্বারা পেট পূর্ণ করল। (আল্লাহ্ এই অবস্থা থেকে আমাদের পানাহ্ দান করুন।)

খানার মধ্যে নিজের সঙ্গে অন্যকে শরীক করায় কতটুকু বরকত তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস দ্বারা অনুধাবন করুন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

مَنْ اَطْعَمَ اَخَاهُ حَتّٰى يَشْبِعَهُ وَسَقَاهُ حَتّٰى يَرْوِيَهُ بَعْدَهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ لِسَبْعِ خَنَادِقٍ مَا بَيْنَ كُلِّ خَنْدَقَيْنِ مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِأَةِ عَامٍ

"যে ব্যক্তি তার কোন ভাইকে এই পরিমাণ খানা খাওয়াল যাতে তার পেট পূর্ণ হয়ে যায় এবং এইপরিমাণ পান করাল যাতে সে তৃপ্ত হয়ে গেল। (তার জন্যে এ সুসংবাদ যে) আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে এই পরিমাণ দূরে রাখবেন যতটুকু সাত খন্দকের দূরত্ব রয়েছে। প্রত্যেক খন্দকের মাঝে পাঁচশত বছরের দূরত্ব বিদ্যমান।"

আলোচিত হাদীসের প্রথম শব্দ তার ভাই -এর উপর দৃষ্টি ফেলুন। এখানে অভাবী ও ক্ষুধার্থকে ভাই বলা হয়েছে। চাই সে নিজের ভাই হোক বা অন্য গোত্রের কেউ হোক না কেন।

মেহমানের পছন্দীয় খানা

ইসলামী সমাজে মেহমানদের আদর আপ্যায়ন উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ পরম মেহমান নাওয়ায ছিলেন। তাদের নিকট একজন মেহমান রহমতের ফিরশতার চেয়ে কম ছিল না। মেহমানের খাতিরে তাঁরা স্বীয় আরাম আয়েশ কুরবানী করে দিতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীতো মেহমানদারীতে বিরল দৃষ্টান্তই স্থাপন করে গেছেন। ঘটনা এই যে, একদিন সেই সাহাবীর ঘরে এতটুকু খানা ছিল যাতে কোন রকমে একজনের চলে। এমতাবস্থায় রাত্রি বেলায় এক মেহমান এল। স্বামী স্ত্রী পরামর্শ করে নিলেন। খানা দস্তর খানায় রেখে (বাহানা করে) স্ত্রী বাতি নিভিয়ে দিলেন। আর স্বামী (বর্তনে) খালি হাত বুলাতে লাগলেন এবং খানা খাওয়ার শব্দের মত চপচপ করতে লাগলেন। উদ্দেশ্য মেহমান যেন মনে করে যে, তিনিও মেহমানের সঙ্গে যথারীতি খানায় শরীক আছেন। এভাবে মেহমান তৃপ্তি সহকারে খানা খেয়ে নিল। সুবহানাল্লাহ! ভেবে দেখুন। তাদের মধ্যে আত্মত্যাগের কতই না জযবা ছিল।

মূলতঃ এগুলি সবই ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও আমলী আদর্শের ফসল। হযরত জাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ঃ

مَــنْ لَذَّذَ اَخَــاهُ بِمَا يَشْتَهِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ اَلْفَ اَلْفَ حَسَنَةٍ وَمُحِىَ عَنْهُ اَلْفَ اَلْفَ سَيِّئَةٍ .....

"যে ব্যক্তি তার ভাইকে স্বীয় প্রিয় বস্তু দ্বারা পরিতৃপ্ত করবে, আল্লাহ তাঁর আমল নামায় হাজার হাজার নেকী লিখে দিবেন। এবং তার হাজার হাজার গোনাহ মাফ করে দিবেন এবং তাঁর মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন। আর তাকে তিনটি জান্নাত তথা জান্নাতুল ফেরদৌস, জান্নাতুল আদন এবং জান্নাতুল খুলদ থেকে খানা খাওয়াবেন।"

তাকাল্লুফ বা লৌকিকতার নিষেধাজ্ঞা

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نُهِيْنَا عَنِ التَّكَلُّفِ

"হযরত ওমর ফারুক (রাযিঃ)-এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের লৌকিকতা দেখাতে নিষেধ করেছেন। –শামায়েলে তিরমিযী

হাদীস বিশারদগন তাকাল্লুফ বা লৌকিকতার সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেনঃ "কষ্টের সঙ্গে এমন কোন বিষয় বা এমন কোন কাজ করা যার মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত নাই এবং যাতে কোন উপকারও হয় না।"

আল্লাহ্ ঐ সকল বুযুর্গদের উত্তম বদলা দান করুন যারা আরবের সর্বাপেক্ষা বড় ভাষাবিদ এবং আল্লাহর সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অলৌকিক বর্ণনাকৃত বাণীর ব্যাখ্যাও এমন সুন্দরভাবে দিয়েছেন যা তাঁর শানের যথোপযুক্ত ছিল। তাকাল্লুফের উল্লেখিত ব্যাখ্যার ব্যাপারে একটু ভেবে দেখুন। তা কতই না অর্থবহ হয়েছে।

প্রতিটি এমন বিষয় যাতে কোন উপকার নাই এবং প্রত্যেক এমন কাজ যার কোন অর্থই হয় না, তা যদি বিশেষ কষ্ট স্বীকার করে সম্পন্ন করা হয় তবে সেটা তাকাল্লুফের মধ্যে গণ্য হবে। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক হাদীসে ইরশাদ করেন ঃ

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيهِ

"কোন ব্যক্তির জন্য ইসলামের সৌন্দর্য্য হল অযথা বা অনর্থক বিষয় ত্যাগ করার মধ্যে।" – মুয়াত্তা ইমাম মালেক (রহঃ)

আসুন! এখন এবার একটু আমাদের নিজের জীবনের কর্ম এবং বন্ধু বান্ধবদের সাথে মিলা মেশা ও নিজের সামাজিক যিন্দেগীর দিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখি, এতে উপকারী অনুপকারী বিষয় কি পরিমাণ প্রবেশ করেছে। আমার তো ধারণা আমাদের জীবনের সব কিছুতেই আমরা লৌকিকতার খোলস পড়ে আছি। আর ভেতরে সবই অন্তঃসার শূন্য–ফাঁকা।

খানায় তাকাল্লুফ

সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ঃ

اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لَّا نَتَكَلَّفَ لِلضَّيْفِ مَا لَيْسَ عِنْدَنَا وَاَنْ نَتَقَدَّمَ اِلَيْهِ مَا حَضَرَنَا

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমাদের নিকট যা নাই মেহমানদের খাতিরে তা যোগাড় করতে গিয়ে কষ্ট উঠাবে না। বরং যা কিছু উপস্থিত আছে তাদের সামনে তাই দিবে।"

তাবরানী নামক হাদীস গ্রন্থে এ বিষয়টি দু একটি শব্দের পরিবর্তন সাপেক্ষে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَتَكَلَّفَ لِلضَّيْفِ مَا لَيْسَ عِنْدَنَا

"আমাদের নিকট যা নাই মেহমানদের খাতিরে তা নিয়ে কষ্ট উঠাতে আমাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।"

অনেক সময় আমরা এ ধরনের তাকাল্লুফের শিকার হয়ে থাকি। যার ফলে একদিকে মেহমান এক প্রকার লজ্জায় পড়ে যায় এবং আমরা পেরেশান হই। আর এ কারণে রহমতের ফিরিশতাকে অর্থাৎ মেহমানকে আমরা বিপদের মূল মনে কর।

উম্মী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাব ভাল করেই জানতেন, উপলব্ধি করতেন। তাই তিনি মেহমানদের ব্যাপারে তাকাল্লুফ করতে নিষেধ করার সঙ্গে সঙ্গে এর হেকমতও বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, فَتَبْغَضُوْهُ অর্থাৎ এ ভাবে তোমরা মেহমানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করবে। আর যে ব্যক্তি মেহমানের প্রতি বিদ্বেষ রাখে সে যেন আল্লাহর প্রতি বিদ্বেষ রাখে এবং যে আল্লাহর সঙ্গে বিদ্বেষ রাখবে আল্লাহও তাকে ঘৃণা করবেন। চিন্তা করে দেখুন! তাকাল্লুফের ধারাবাহিকতা কোথায় গিয়ে শেষ হয়।

পেট কিভাবে পূর্ণ হবে?

عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَنَا نَأْكُلُ وَلاَ نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُوْنَ؟ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيْهِ ـ

আজকাল অধিকাংশ লোকেই বে-বরকতের অভিযোগ করে থাকে। প্রতিটি লোকেই অনুভব করে যে, জিনিসের মধ্যে বরকত নাই। বিশেষ করে খানার মধ্যে বরকত একেবারে নাই বললেই চলে। মানুষ খুব খায়, পেটও ভরে। কিন্তু 'পরিতৃপ্তি' বলতে যা বুঝায় তা লাভ হয় না। খেতে খেতেই আবার ক্ষুধা লাগে।

এমনটি কেন হয়? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত ওয়াহশী (রাযিঃ)-এর বর্ণিত নিম্নোল্লিখিত হাদীসে উক্ত প্রশ্নের জবাব রয়েছে।

তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণ একদা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খানা খাই, কিন্তু আমাদের তৃপ্তি মিটে না। নবী করীম (সাঃ) বললেন, "সম্ভবত তোমরা পৃথক পৃথক ভাবে খানা খাও? সাহাবীগণ আরয করলেন, হ্যাঁ, (আমরা পৃথক

পৃথক ভাবে খাই)। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) বললেন, তোমরা একত্রে খানা খাবে এবং আল্লাহর নাম নিয়ে খানা খাবে; মেহেরবান আল্লাহ্ এতে তোমাদের খানায় বরকত দান করবেন। –সূনানে আবূ দাউদ

একত্রে খানা খাওয়ায় শুধুমাত্র দু'জনের খানা তিনজনের এবং তিন জনের খানা চারজনের জন্যে যথেষ্ট হওয়ার বরকত লাভ হয় না বরং উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, একত্রে খানা খাওয়ায় প্রত্যেক ব্যক্তির পরিতৃপ্তিও অর্জিত হয়। আর সেই সঙ্গে আল্লাহর নামে খানা শুরু করলেতো نُورٌ عَلٰى نُور অর্থাৎ তাতে খুব বেশী বরকত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদও সত্য। অতএব খানার মধ্যে কষ্টে পড়া প্রকৃত পক্ষে নিজেদেরই কর্মফল বৈ আর কিছুই নয়।

খাওয়ার পর

খাওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনটি সুন্নত বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যকঃ

১। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়ার পর হাত মুখ ধৌত করাকে খানায় বরকত হওয়ার কারণ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

–সুনানে আবূ দাউদ, তিরযিমী

হযরত আনাস (রাযিঃ) এর বর্ণনা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি চায় যে, আল্লাহ তায়ালা তার ঘরের বরকত বৃদ্ধি করে দেন, তার উচিত যখন খানা সামনে আসে তখন এবং দস্তর খানা যখন উঠিয়ে নেওয়া হয় (অর্থাৎ খানা শেষ হয়ে যায়) তখন হাত মুখ ধৌত করা।"

–কাযবীনী

২। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করার পর কুল্লি করতেন।

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَقَالَ اِنَّ لَهٗ دَسَمًا

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করলেন অতঃপর পানি চাইলেন ও কুল্লি করলেন, আর বললেন এতে তৈলাক্ত পদার্থ থাকে।

৩। পানাহারের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

৪। কারও বাড়ীতে দাওয়াত খেলে বাড়ীওয়ালার রিযিকের মধ্যে প্রশস্ততা ও বরকতের জন্য এই দুআ করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ

৫। কখনও কখনও এ দুআও করতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَهُ وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا

খানা খাওয়ার পর দুআ

আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাওয়ার পর নিম্নের শব্দগুলি দ্বারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় ও দুআ করার শিক্ষা দিয়েছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"সমস্ত প্রশংসা এবং শুকরিয়া আল্লাহর যিনি আমাকে আহার করিয়েছেন। পান করিয়েছেন এবং আমাকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ তিনি আমাদের শরীর ও দেহের জন্য যেমন অনুগ্রহ করে খাদ্য দান করেছেন, তেমনি আমাদের আখেরাতের মুক্তির জন্য ইসলামের মত দৌলত দান করেছেন।"

সমস্ত দিনরাত আল্লাহ তা'আলা যে অসংখ্য নিয়ামত দান করছেন তার পরিবর্তে শুকরিয়া হিসাবে এ কয়েকটি শব্দ উচ্চারণের কি যথার্থতা (হাকীকত) থাকতে পারে। মূলতঃ আসল উদ্দেশ্য হল মানুষের মধ্যে শুকরিয়া এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জযবা ও মানসিকতা সৃষ্টি করা।

হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে থেকে দস্তরখানা উঠানো হলে তিনি নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُسْتَغْنِىً عَنْهُ رَبَّنَا

খানার দাওয়াতকারীর জন্য দুআর শব্দগুলি হল ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ فَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ

"হে আল্লাহ! দাওয়াতদাতাদের রিযিকের মধ্যে বরকত দান করুন। তাদের মাফ করে দিন এবং তাদের উপর রহমত করুন। হে আল্লাহ! যিনি আমাকে খানা খাওয়ালেন তাকে আপনার করুণা ও দয়ায় খানার মধ্যে প্রাচুর্য ও বরকত দান করুন। আর যিনি আমাকে পান করালেন তাকে গায়েব হতে পান করান।

অধ্যায় ঃ ৭

পানি পান করার আদব এবং উপদেশ

শিরোনাম দ্বারাই বুঝা যায় যে, আমি এ অধ্যায়ে আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পান করা সম্পর্কিত হাদীসগুলি একত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছি। আর এ ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যেন কোন হাদীস বাদ না পড়ে যায়। তবে আমি কখনো এই দাবী করছি না যে, এই বিষয়ের সবগুলি হাদীসই আমি একত্রিত করেছি। কোন হাদীস তো এ জন্যও রয়ে গেছে যে, আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে বিষয়বস্তুর সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক নাই মনে করে উল্লেখ করি নাই।

বসে বসে পানি পান করা, ডান হাত দ্বারা বর্তন ধরা, অল্প অল্প করে কমপক্ষে তিন চুমুকে পানিপান করা, পানি পান করার পূর্বে–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এবং পান করার পর الحمد لله বলা। স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার না করা। পানির পাত্র খোলা না রাখা। পানির পাত্রে ফুঁক না দেওয়া এগুলি সব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসেরই অংশ বিশেষ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দনীয় পানীয়

عَنْ عَائِشَةَ صِدِّيْقَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ اَحَبَّ الشُّرْبِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلْوُ الْبَارِدُ

"হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাপেক্ষা পছন্দীয় পানীয় ছিল ঠান্ডা মিষ্টি পানীয়।"

–মুসতাদরাকে হাকেম

হযরত সুহাইব (রাযিঃ) স্বীয় দাদার ভাষায় বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, স্মরণ রেখো, দুনিয়া এবং আখেরাতের মধ্যে পানি হল পানীয় জিনিসের সর্দার। –মুসতাদরাক

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী দ্বারাও পানির গুরুত্ব আরো বেশী উপলব্ধি করা যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে বান্দার নিকট থেকে সর্বপ্রথম যে হিসাব গ্রহণ

করা হবে তা হলো আল্লাহ তা'আলা তার সুস্থতা ও ঠান্ডা পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।" –মুসতাদরাক

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত ইরশাদ হতে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অবগত হইঃ–

(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানীয় জিনিসের মধ্যে ঠান্ডা এবং মিষ্টি পানীয় পছন্দ করতেন। বাস্তবেও ঠান্ডা পানি পান করায় অন্তরে আনন্দ আসে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মুখে আলহামদুলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর শুকরিয়া এসে যায়।

(২) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠাণ্ডা পানিকে আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত মনে করতেন এবং ঠান্ডা পানি পছন্দ করতেন।

(৩) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পানি উভয় জাহানের পানীয় জিনিসের সর্দার। আর তা দু'টি নিয়ামতের একটা যার সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবে। সুতরাং আমাদেরকে পানির প্রত্যেকটি ফোঁটার যত্ন নেওয়া ও কদর করা আবশ্যক।

পানি পান করার আদব

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَمُصَّ الْمَاءَ مَصًّا وَلَا يَعُبُّ عَبًّا فَإِنَّهُ مِنَ الْكُبَادِ

"তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পানি পান করতে চায়, সে যেন চুমুক দিয়ে দিয়ে পান করে এবং পশুর মত পানিতে মুখ লাগিয়ে পান না করে কারণ এতে কলিজা বেদনা হয়।" –বায়হাকী, যাদুল মাআদ

প্রচন্ড গরম পড়লে পিপাসায় অস্থির হয়ে অনেকে এক নিঃশ্বাসেই ঘোট ঘোট করে সমস্ত পানি শেষ করে ফেলতে চায়; এতে কখনও পিপাসা নিবারণ হয় না বরং গলায় পানি আটকে যাওয়ার ভয় থাকে এবং এতে পেট নিঃসন্দেহে ভারী হয়ে যায়। অপরদিকে অল্প অল্প করে চুমুক দিয়ে দিয়ে পান করলে সামান্য পানিতেই পিপাসা মিটে যায় এবং কোন সমস্যায়ও পড়তে হয় না।

তাছাড়া পানিতে মুখ ডুবিয়ে পান করা পশুর স্বভাব। এতে নাক মুখের দুষিত নিঃশ্বাস টাটকা পানিকে নষ্ট করে ফেলে। দাড়ি মোচের চুল এবং ময়লা পরিষ্কার পানিকে নোংরা করে দেয়।

পানি পান করার নিয়ম

لَا تَشْرَبُوْا نَفَسًا وَّاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيْرِ وَلٰكِنْ اِشْرَبُوْا مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَسَمُّوْا اِذَا اَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُوْا اِذَا اَنْتُمْ فَرَغْتُمْ ـ

"উটের মত এক দমে গট্‌গট, করে পান করো না বরং দু'তিন দমে পান কর। পান করার সময় আল্লাহর তা'আলার নাম লও অর্থাৎ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বল এবং পান করার পর আল্লাহর প্রশংসা কর। আর প্রশংসার সর্বাপেক্ষা উত্তম বাক্য হল-আলহামদুলিল্লাহ।"

উপরোল্লেখিত হাদীসে তিনটি উপদেশ রয়েছে ঃ

(১) প্রথমতঃ পানি এক দমে গট্‌গট্ করে উটের মত পান না করে অল্প অল্প করে পান করা উচিত। অধৈর্য্য হয়ে ব্যস্ততার সঙ্গে পানি পান করা উটের স্বভাব, আর এতে কয়েক প্রকার অসুবিধাও রয়েছে। এভাবে পান করায় পানি হলকুমে আটকে যেতে পারে। এতে হৃদযন্ত্রের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পিপাসা আরও তীব্র হয়। পরিতৃপ্তি আসে না।

(২) দ্বিতীয়তঃ শুরুতে আল্লাহর নাম নিয়ে পান করা উচিত। এতে হাজারও বরকত রয়েছে। মানুষ স্বভাবতঃই বিসমিল্লাহ বলে কোন হারাম জিনিস মুখে নিতে পারে না বা কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে পারে না। তাছাড়া আল্লাহকে স্মরণ করলে যে প্রশান্তি হাসিল হয় অন্য কোনভাবে তা সম্ভব নয়।

(৩) তৃতীয় উপদেশ হল ঃ আল্লাহর নিয়ামত দ্বারা পরিতৃপ্ত হওয়ার পর তাঁর শুকরিয়া আদায় কর। অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

তিন ঢোক

আপনারা আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস পাঠ করেছেন যাতে পানি পান সম্পর্কে তিনটি উপদেশ রয়েছে। এখন এ সম্পর্কে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ও আমল কি ছিল তা লক্ষ্য করুন।

নিম্নের হাদীস বর্ণণাকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ عَلَى الْاِنَاءِ ثَلَاثَةَ اَنْفَاسٍ يَحْمَدُ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ نَفَسٍ وَيَشْكُرُهٗ عِنْدَ اٰخِرِهِنَّ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কিছু পান করতেন তখন তিন ঢোকে পান করতেন, প্রত্যেক ঢোকে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতেন এবং সর্বশেষে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন।"

অল্প অল্প করে পানি পান করার ফযীলত ও উপকারিতা অনেক। এই সবগুলি ফযীলতই মানুষের নিজের সাথে সম্পৃক্ত। আধ্যাত্মিকতা বা আচার ব্যবহারের সঙ্গে এর কোন সংযোগ নাই। কিন্তু ইসলাম শুধু মাত্র আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক শিক্ষার মাযহাব নয় রবং এটা মানুষের সার্বিক উন্নতির আহ্বানকারী এবং সর্বপ্রকার পরিপূর্ণতার জিম্মাদার। সুতরাং ইসলাম যিন্দেগীর সর্বপর্যায়ে পথ প্রদর্শন করে। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাস্তব জীবনে আমল করে সবকিছু দেখিয়েছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমরা যেন তাঁর কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে নিজেদের জন্য বরকত লাভে সক্ষম হই।

বসে পানি পান করা

খানা-পিনার আদবের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। সেগুলি নিজ নিজ অভ্যাসে পরিণত করা জরুরী। নিম্নের হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রাযি) বলেন ঃ

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যেন দাঁড়িয়ে কিছু পান না করে।"

আজকাল আমাদের ছোট বড় কেউই ইসলামের এ আদবটির প্রতি দৃষ্টি দেয় না বরং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানাহার করাটাকে একটা ফ্যাশন মনে করে।

এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর এক সাহাবী হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ দাঁড়িয়ে পানি পান করবে না; ভুল ক্রমে পান করে ফেললে বমি করে দিবে।" – মুসলিম শরীফ

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানাহার করা ফ্যাশন তো ঠিকই তবে ভাল ফ্যাশন নয়। দোজাহানের বাদশাহ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতে যা উত্তম সেটাই ভাল ফ্যাশন। কারণ তাঁর কোন নির্দেশ ও কাজই হেকমত থেকে খালি নয়।

যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমযমের পানি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেন পান করতেন, এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, যেহেতু যমযমের পানির নিকট লোকজনের খুবই ভীড় ও জনসমাবেশ হয় তাই মানুষের কষ্ট কিছুটা কমানোর জন্য এভাবে পান করতেন। সেহেতু এখন যমযমের পানি কিবালা মুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান করা উম্মতের জন্য সুন্নত। এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের একটা নগন্য উদাহরণ। তবে এ ধরনের ছোট ছোট বিষয়ও জীবনের মোড় পরিবর্তন করে ফেলে এবং একটি সুন্দর সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে।

পানিতে নিঃশ্বাস ফেলো না

আমি পানি পান করার আদব সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করেছি এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নোক্ত বাণী সমূহ চিহ্নিত করছি।

* বিসমিল্লাহ বলে পানি পান করবে।

* এক শ্বাসে পানি পান করবে না বরং তিন শ্বাসে অল্প অল্প করে পান করবে।

* পানি পান করে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করবে, যার সুন্নতি শব্দগুলি হল 'আলহামদুল্লিাহ'।

* নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এ পদ্ধতিতে পানি পান করতেন, এমনকি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি ঢোকেই 'আল হামদুল্লিাহ' বলতেন এবং পরিশেষে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন।

* পানি পান করার ৪র্থ আদব হল দাঁড়িয়ে পান না করা। পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশে আজ বুফে সিস্টেম (Buffet) আধুনিক সভ্যতার এক বিশেষ নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে।

* শুধুমাত্র যম্যমের পানি দাঁড়িয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে পান করা সুন্নত। এভাবে পান করার হেকমত সুস্পষ্ট।

প্রথমতঃ যম্যম্ কূপের নিকট হিজায ও অন্যান্য স্থান থেকে আগত লোকদের ভীড়; দ্বিতীয়তঃ কূপের সম্মান ও পবিত্রতা।

* এখন পানি পান করার আদব সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো একটি হাদীস পেশ করছি ঃ

হযরত ইকরামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ঃ

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّتَنَفَّسَ فِى الْاِنَاءِ اَوْ يَنْفَخَ فِيْهِ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানির মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন।" –মুসতাদরাক

পানির পাত্রের মধ্যে হুক্কার মত গড় গড় করা, পানি পান করার বর্তনের মধ্যে ফুঁক মারা স্বাস্থ্য নীতিরও পরিপন্থি। বিশেষতঃ যদি এ সকল পাত্রে অন্য কেউ পান করে তাহলে তো কথাই নাই। চিন্তার বিষয় হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীগুলির হিকমত ও দর্শন কতইনা মূল্যবান। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ স্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক যে সকল তত্ত্ব আজ প্রমাণ করছেন তা শত শত বৎসর পূর্বেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযি)-এর নিম্নোক্ত বর্ণনা বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "তোমাদের কেউ কোন পাত্রে পানি পান করার সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলো না।"

وَلٰكِنْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّتَنَفَّسَ فَلْيُؤَخِّرْهُ عَنْهُ ثُمَّ يَتَنَفَّسُ

"যদি শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন হয় তবে পাত্র সরিয়ে শ্বাস নাও।" –মুসতাদরাক গ্রন্থে এ সম্পর্কে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অন্য এক রেওয়ায়াতে তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِى الْاِنَاءِ

"তোমাদের কেউ কিছু পান করার সময় পাত্রের মধ্যে ফুঁক দিবে না।" বস্তুতঃ এটাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের আমল ছিল। যার আলোচনা ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে।

পানি পান করার পর দুআ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করার পর যে দুআ পাঠ করতেন এ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হল। এই দুআর বর্ণনাকারী হযরত আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী (রাযিঃ) বলেন,

كَانَ يَقُولُ بَعْدَ الشُّرْبِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ الْمَاءَ عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا

"কিছু পান করার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি স্বীয় রহমতে পানিকে মিষ্টি ও সুস্বাদু বানিয়েছেন এবং আমাদের অপরাধ সত্ত্বেও এটাকে লবণাক্ত ও খারযুক্ত করেন নাই।" –তাবরানী

আল্লাহ! আল্লাহ!! মানব কূলের শিরোমণি, বিশ্বজাহানের সর্দার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর দরবারে কতই না কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। মূলতঃ পানি মিষ্টি ও সুস্বাদু হওয়া একমাত্র সেই মহান সত্তা আল্লাহ তা'আলারই রহমত। আল্লাহর কোন বান্দা এমন আছেন যিনি এ নিয়ামতকে তার নেক কাজের প্রতিফল হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারেন ? আমাদের নেকের পাল্লা এমন কী ভারী হয়ে গেছে যার ফলে আমরা আল্লাহর এই নিয়ামতের হকদার হয়ে গেছি?

দুআর দ্বিতীয় অংশে রহমতের আধার বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মত গোনাহগার উম্মতদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, বিপর্যয় যে ধরনেরই হোক না কেন তা বান্দার নিজেরই কর্মের প্রতিফল। তা না হয় পরম করুণাময় মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর পিতা-মাতার চেয়েও বহুগুণে স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র।

রূপার পাত্র

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রা স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلَّذِىْ يَشْرَبُ فِىْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهٖ نَارَ جَهَنَّمَ

"যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে (যেন) নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভরে।"– বুখারী, মুসলি ম শরীফ

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে সরলতা, অনাড়ম্বরতা শিক্ষা দেয় এবং সরলতা প্রিয় করে। ইসলামী শিক্ষা শুধু মাত্র ওয়াজ ও বক্তৃতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং আমলী যিন্দিগীর মধ্যে সচেতনভাবে এগুলির বাস্তবায়নও একান্ত জরুরী। যার একটা দৃষ্টান্ত হল স্বর্ণ, রূপা, রেশম ও সিল্কের পোশাক ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামী হুকুম সংক্রান্ত আমল।

প্রথমতঃ ইসলাম যাকাতের সম্পদ বন্টনের মাধ্যমে স্বর্ণ-রূপা সঞ্চয়ের সুযোগ কমিয়ে দিয়েছে এবং সামর্থশীলদের সঞ্চয়ের মধ্যে গরীব নিঃস্বদের অংশীদার করেছে। স্বর্ণ-রূপা ব্যবহার মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। পুরুষের জন্য এগুলির ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

উপরোল্লেখিত হাদীস অনুযায়ী স্বর্ণ রূপার বর্তন নারী পুরুষ সকলের জন্যই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কারণ এতে ধনীদের ঘরে সম্পদ জমা হত এবং তাদের ইমারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হত। আর অন্যদিকে দরিদ্রদের মন ছোট হয়ে যেত। এভাবে ইসলামের স্বাভাবিক সহজ সরলতা একেবারেই খতম হয়ে যেত।

স্বর্ণ রৌপ্যের বর্তন

রূপার পাত্রে পানি ইত্যাদি পান করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করেছি। এখানে শুধু খানা পিনা সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো কয়েকটি ইরশাদ পাঠ করুন।

(১) হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে রেশম ও সিল্কের পোষাক পরিধান করতে এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের বর্তন ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন যে,

هُنَّ لَهُمْ فِى الدُّنيَا وَهِىَ لَكُمْ فِى الاٰخِرَةِ

"এই জিনিসগুলি কাফেরদের জন্য দুনিয়ায় এবং তোমাদের জন্য আখেরাতে রয়েছে।" –বুখারী, মুসলিম

(২) নবী করীম সসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সাহাবী থেকেই অন্য এক রেওয়ায়াত হল 'আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, রেশম ও সিল্কের কাপড় পরিধান করো না এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করো না এবং স্বর্ণ রৌপ্যের বাটিতে খেয়ো না।" –বুখারী ও মুসলিম শরীফ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী সমূহের উপর সাহাবায়ে কেরামগণ কিভাবে আমল করেছেন সে সম্পর্কে মিশকাত শরীফের একটি বর্ণনা লক্ষ্য করুন। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আনাস ইবনে সিরীন বলেনঃ

আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) -এর সঙ্গে অগ্নি পূজকদের একটা জামাআতের নিকট ছিলাম। এক ব্যক্তি স্বর্ণের পাত্রে এক প্রকার হালুয়া নিয়ে এল। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) খেলেন না। হালুয়া নিয়ে আসা

লোকটিকে বলা হল এটা পাল্টিয়ে আন। হালুয়ার পাত্র পরিবর্তন করে আনা হলে তিনি তা খেলেন। – বায়হাকী

পানিতে ফুঁক দেওয়া

বর্তমান যুগে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার উপর খুবই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সরকারগুলি এ জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করছে। করপোরেশন ও পৌরসভাগুলিতে যথারীতি স্বাস্থ্য বিভাগ খোলা হচ্ছে। জনসাধারণ ধারণা করছে এগুলি সবই পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল। পক্ষান্তরে ইসলাম স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার উপর যতটুকু গুরুত্বারোপ করেছে অন্য কোন শিক্ষা এতটুকু গুরুত্ব দেয় নাই। বরং ইসলাম তো পরিচ্ছন্নতা অপেক্ষা পবিত্রতার আবশ্যকতায় আরো এক ধাপ অগ্রসর। কারণ অন্যদের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আছে বটে কিন্তু পাক পবিত্রতা বলতে কিছুই নাই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি) বলেন ,

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفُخُ فِيْ طَعَامٍ وَّلَا شَرَابٍ وَّلَا يَنْفُسُ فِي الْاِنَاءِ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা এবং পানীয়ের মধ্যে ফুঁক দিতেন না এবং বর্তনের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতেন না।" সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই যখন এটা করতেন না তখন অপরকে এমনটি করার অনুমতি দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী হযরত ইকরামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্তনে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন।" – আবূ দাউদ, তিরমিযী

"হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিতঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানিতে ফুঁক দিতে নিষেধ করলে এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি গ্লাসে ক্ষতিকর কিছু দেখি তবুও কি ফুঁক দেব না? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এটা ফেলে দিও।"

মশকীযা বা কলস থেকে পানি পান করা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ اَوِ الْقِرْبَةِ -

"হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশক বা মশকীযায় মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।"
–রিয়াযুস সালেহীন

হাদীসে উল্লেখিত ছিকা এবং "কিরবাহ" উভয় শব্দ মশক -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে উভয়ের আকৃতি ও পুরুত্বের মধ্যে কম বেশী পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। শাব্দিক অর্থের পেছনে না পড়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ কি? তাই দেখা উচিত। আর তা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নিষেধাজ্ঞার হেকমত খুব সহজেই বুঝে আসে। প্রথমতঃ ভরা মশকে মুখ লাগালে পানির মধ্যে এর প্রভাব পড়বে। আর যদি আল্লাহ না করুন পানকারীর দাঁতে অসুখ থাকে বা মুখে অন্য কোন সমস্যা থাকে তবে এর প্রতিক্রিয়া সমস্ত পানিতে ছড়িয়ে পড়বে। আর এটা স্বাস্থ্য রক্ষা নীতির পরিপন্থী হবে।

দ্বিতীয়তঃ ভরা মশক থেকে পানি পান করায় কিছু পানি অবশ্যই পড়ে নষ্ট হবে। আর কোন কিছুই নষ্ট করা কখনও বৈধ হতে পারে না। অধিকন্তু পানি আল্লাহর নিয়ামত সমূহের একটা বড় নিয়ামত।

এতদ্ব্যতীত এটা একটা কুদরতী বিষয় যে, ভরা মশক থেকে নিশ্চিন্ত মনে শান্তির সঙ্গে পান করা মুশকিল। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত হল ধীরে ধীরে কম পক্ষে তিন ঢোকে পান করা। স্বাস্থ্য বিধিমতে এটা একটা জরুরী বিষয়।

এই নিষেধাজ্ঞার চতুর্থ হিকমত হল, মশক থেকে পানি পান করায় কিছু পানি পতিত হয়ে ছিটে কাপড়ে লাগার খুবই সম্ভাবনা থাকে যা পবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

ভাঙ্গা পাত্রে পানি পান করা

"আবূ দাউদ শরীফের রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের ভাঙ্গা অংশের দিক থেকে পানি পান করতে এবং পানীয়ের মধ্যে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন।" –জাদুল মাআদ ঃ খন্ড ঃ ৩

রিয়াযুস সালেহীন এবং মিশকাত শরীফেও হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ)-এর নিম্নোক্ত রেওয়ায়াত বিদ্যমান রয়েছে ঃ

قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اِخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ يَعْنِىْ اَنْ تَكْسِرَ اَفْوَاهِهَا وَ يَشْرَبُ مِنْهَا

তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকীযা "একতেনাস"করতে অর্থাৎ মশকীযার মুখ ভেঙ্গে সেই মুখ থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।"

উপরোক্ত দুইটি রেওয়ায়াত মিলিয়ে পাঠ করলে তা থেকে তিনটি বিষয় জানা যায় ঃ

১। পাত্রের ভাঙ্গা অংশ থেকে পানি পান না করা।

২। পানীয়ের মধ্যে ফুঁক না দেওয়া।

৩। মশকিযার মুখ ভেঙ্গে তথায় মুখ লাগিয়ে পানি পান না করা।

"বর্তনের ভাঙ্গা অংশ থেকে পান করা যাবে না", নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই হুবকের প্রথম হুকুমের মধ্যে অনেকগুলি হেকমত রয়েছে। কারণ এতে শুধু মাত্র ভাঙ্গা অংশের মাধ্যমে ঠোঁট কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। বরং এ ধরনের ভাঙ্গা বর্তন পরিষ্কার করার সময় ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি বর্তনে থেকে যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকে। অথবা পূর্বের ব্যবহৃত দ্রব্যের কিছু লেগে থাকে। অথবা ক্ষতিকর লালা বা থুথু ইত্যাদি বর্তনে আটকে থাকে এবং ঐ দিক থেকে পানি পান করায় উক্ত ক্ষতিকর পদার্থ পেটের মধ্যে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।

আমাদের ঘরে ব্যবহৃত মেটে এবং চিনা বর্তনের ক্ষেত্রে এ অবস্থাটি খুবই লক্ষ্য করা যায়। কারণ চিনা বর্তন, রেকাবী এবং অন্যান্য বর্তনের ভাঙ্গা অংশের মধ্যে নিঃসন্দেহে ময়লা ইত্যাদি জমে থাকে। পরিষ্কার করা সত্ত্বেও ভাঙ্গা অংশ থেকে এগুলি দূর হয় না।

আল্লাহ! আল্লাহ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি বাণী কতই না মঙ্গলজনক ।

পাত্র ঢেকে রাখবে

عَطُّو الْإِنَاءَ وَاَوْكُو السِّقَاءَ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বর্তন ঢেকে রাখবে এবং মশক (চামড়ার থলি যাতে করে পানি বহন করা হয়। আমাদের দেশে এর বিকল্প হিসাবে কলস ব্যবহৃত হয়ে থাকে) এর মুখ বন্ধ করে রাখবে।"

– বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র ইরশাদ করেন,

اَلْاخَمِّرْهُ وَلَوْتَعْرِضُ عَلَيْهِ عُوْدًا

"কাঠের ঢাকনা দিয়ে হলেও দুধের বর্তন ঢেকে রেখো।"

চিকিৎসা শাস্ত্র মতে খানা-পিনা জাতীয় বস্তু খুবই সাবধানে রাখা উচিত। কেননা মাছি এগুলির উপর পাগলের মত ছুটে এসে বসে যায় এবং অসংখ্য রোগ জীবাণু সঙ্গে নিয়ে আসে। মাছির আক্রমণ ও উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়ার একটাই মাত্র উপায় আছে, তা হল খানা-পিনা ঢেকে রাখা।

পাত্র খোলা রাখার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ক্ষতিকর দিক হলো, পাত্রে এমন কিছু পড়তে পারে যা স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর এবং এতে রোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সাধারণত প্রতি বাড়ীতেই টিক্‌টিকি বাস করে। এগুলির দেহাবয়ব শুধু বিশ্রী নয় বরং এর শরীর বিষাক্তও বটে। তাই কোন কিছু বিষাক্ত হওয়ার জন্য এর মধ্যে টিক্‌টিকি পতিত হওয়াই যথেষ্ট। সুতরাং এ বিষয়টির প্রতি পূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই।

একটু চিন্তা করে দেখুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা কতটুকু হেকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ছিল এবং তিনি কেমন উপকারী পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে গেছেন। শতশত বছর পরে ব্যাপক গবেষণা করে মানুষ আজ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, উম্মি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সময়ই (১৪শত বৎসর পূর্বেই) তা বলে গেছেন। বস্তুতঃ সে ব্যক্তিই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করেছে যে তাঁর শিক্ষাকে কাজে লাগিয়েছে।

অধ্যায় ঃ ৮

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদ্য এবং পছন্দনীয় খানা

হাদীস এবং ইতিহাস গ্রন্থ থেকে এমন অনেক খাদ্য সম্পর্কে জানা যায়, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খুবই পছন্দনীয় ছিল। যে সকল খাদ্য সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত সূক্ষ্মদর্শী প্রাজ্ঞ ও পবিত্রতাপ্রিয় ব্যক্তিত্ব প্রশংসা করতেন সে সকল খাদ্যের উপকারিতা নিয়ে আর কিইবা বলার থাকতে পারে। একজন প্রকৃত প্রেমিকের জন্যে তো এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে তার প্রেমাস্পদের নিকট কি পছন্দনীয় ছিল। আজ গবেষকদের কাজ হল চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে এগুলির বিস্ময়কর উপকারিতা ও ফলাফল বের করা।

বক্ষমান গ্রন্থের এই অধ্যায়টি পাঠকদের মনোযোগের বিশেষ কেন্দ্র বিন্দু হতে চায়। বিশেষতঃ যে পৃষ্ঠাগুলিতে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদ্যের আলোচনা রয়েছে। এতে জাতির নিঃস্ব ও দরিদ্র লোকদের জন্য যেমন সান্ত্বনা ও ধৈর্য্যের উপকরণ রয়েছে। তেমনি জাতির সম্পদশালী ও বিত্তবানদের জন্য রয়েছে ত্যাগ ও অল্পে তুষ্টির ছবক।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদ্য

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদ্য সম্পর্কে আমরা হাফেয ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ)-এর ভাষায়, তাঁর "তিব্বে নববী" নামক কিতাব থেকে উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত খাদ্য সমূহ কখনও একত্রে খেতেন না।

(১) لَمْ يَجْمَعْ قَطُّ بَيْنَ لَبَنٍ وَسَمَكٍ দুধ ও মাছ কখনও এক সঙ্গে খেতেন না।

(২) وَلَا بَيْنَ لَبَنٍ وَحَامِضٍ দুধ ও টক জিনিস কখনও একত্রে খেতেন না।

وَلَا بَيْنَ غِذَائَيْنِ حَارَّيْنِ وَلَا بَارِدَيْنِ وَلَا لُزْجَيْنِ وَلَا قَابِضَيْنِ وَلَا مُسْهِلَيْنِ وَلَا غَلِيظَيْنِ وَلَا مُرْخِيَيْنِ وَلَا مُسْتَحِيلَيْنِ اِلَى خِلْطٍ وَّاحِدٍ

(৩) দু'টি গরম খাদ্য, দু'টি ঠান্ডা খাদ্য, দু'টি চর্বিযুক্ত খাদ্য, দু'টি আঠালো খাদ্য, দু'টি নরম খাদ্য, দু'টি শক্ত খাদ্য একত্রে খেতেন না, এমন দু'টি জিনিস একত্রে খেতেন না যা একই স্বভাবে পরিণত হবে।

وَلَا بَيْنَ مُخْتَلِفَيْنِ كَقَابِضٍ وَّ مُسْهِلٍ وَسَرِيْعُ الْهَضْمِ وَبَطِيْئِهِ

(৪) বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী কোন জিনিসও একত্রে খেতেন না। যেমন, একটা আঠাল খাদ্য এবং একটা নরম খাদ্য, একটা দ্রুত হজম সম্পন্ন এবং অপরটা বিলম্বে হজম হওয়া খাদ্য এক সঙ্গে খেতেন না।

وَلَا بَيْنَ شَوِى وَّ هَبِيْخٍ وَّلَا بَيْنَ طَرِى وَّتَدِيْدٍ

(৫) ভুনা এবং রান্না খাদ্য, টাটকা এবং বাসী খাদ্য একত্রে খেতেন না।
–যাদুল মাআদঃ খণ্ডঃ ২

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিত্যাজ্য খাদ্য সমূহ

আল্লামা হাফেয ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ)-এর ''যাদুল মাআদ' নামক সুপ্রসিদ্ধ কিতাব থেকে আমি পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদ্য দ্রব্য সর্ম্পকে কিছু বর্ণনা দিয়েছি। এখন তাঁর এই সুবিখ্যাত কিতাব থেকেই সেই সকল খাদ্য সম্পর্কে আলোচনা করছি, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেতেন না।

وَلَم يَكُنْ يَاْ كُلُ طَعَامًا فِىْ وَقْتِ شِدَّةِ حَرَارَتِه

(১) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যাধিক গরম জিনিস খেতেন না।

وَلَا طَبِيْخًا بَائِتًا يَسْخُنُ لَهُ لِغَدٍ

(২) রাত্রের রান্না (বাসী) খাদ্য পরের দিন খেতেন না

وَلَا شَيْئًا مِّنَ الْاَطْعَمَةِ الْعَفِنَةِ وَالْمَالِحَةِ كَالْكَوَامِخِ

(৩) অনুরূপভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য পছন্দ করতেন না এবং চটপটি জাতীয় খাদ্য যেমন, চাটনি ইত্যাদিও পছন্দ করতেন না।

অত্যধিক গরম খাদ্য না খাওয়ার হেকমত এবং এর ক্ষতি কারো অজানা নয়। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি নীতি ভুলে গিয়ে অনেক সুস্বাদু স্বাস্থ্যকর খাদ্য থেকেও উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। বাসী এবং দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্যের ক্ষতির প্রতিক্রিয়া কি তা কারো

অজানা নাই। চটপটি এবং চাটনি জাতীয় খাদ্য গ্রহণে গলা ও পাকস্থলীর যে রোগ সৃষ্টি হয় তা সকলেই অবগত। এতদসত্ত্বেও এ সকল খাদ্য থেকে যদি আমরা বিরত থাকতে না পারি তবে তা দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যেতে পারে?

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অপছন্দনীয় খাদ্য

'হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ঃ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ আইয়্যুব আনসারী (রাযিঃ)-এর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। হযরত আবূ আইয়্যূব (রাযিঃ) যখনই খানা খেতেন তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য খাদ্যের কিছু অংশ পাঠিয়ে দিতেন। এ নিয়মে একদিন তিনি কিছু খানা পাঠালেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খানা খেলেন না। তখন আবূ আইয়্যূব (রাযিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে খানা না খাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর মধ্যে পেঁয়াজ মিশ্রিত রয়েছে। তখন তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পেঁয়াজ কি হারাম? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি উত্তরে বললেন,

وَلٰكِنِّىْ اَكْرَهُهٗ مِنْ اَجْلِ رِيْحِهٖ

"হারাম নয় বটে, তবে দুগর্ন্ধের কারণে আমি এটা পছন্দ করি না।"
–তিরমিযী

তিনি যে শুধু পেঁয়াজ খাওয়া থেকেই বিরত থাকতেন তা নয় বরং দুর্গন্ধযুক্ত এমন কোন জিনিসই তিনি খেতেন না যদ্দ্বারা অন্যের কষ্ট হয়। নিম্ন বর্ণিত হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়।

"হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে আবী ইয়াযিদ থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমাকে উম্মে আইয়্যুব (রাযিঃ) বলেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাড়ীতে তাশরীফ নিয়ে যান। তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য খাদ্য তৈরী করলেন। যার মধ্যে কিছু শাক-সব্জিও ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত খাদ্য পছন্দ করলেন না। তিনি সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা খেয়ে নাও। আমি তোমাদের মত নই; আমার ভয় হয় যে, (এই খানায়) আমার সাথীদের তথা ফেরেশতাদের কষ্ট হবে।"
–তিরমিযী

ক্ষতিকর খাদ্যের প্রতিক্রিয়া দূরকরণ

যাদুল মাআদ নামক গ্রন্থ হতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে অত্যন্ত উপকারী কিছু বিষয় পূর্বে বর্ণনা করেছি। খাদ্য সংক্রান্ত অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে আল্লামা হাফেয ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা বিষয়– হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষতিকর খাদ্যের প্রতিক্রিয়া কি করে দূর করতেন তা বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন ঃ

كَانَ يَصْلِحُ ضَرَرَ بَعْضِ الْاَغْذِيَةِ بِبَعْضٍ اِذَا وَجَدَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً فَيَكْسِرُ حَرَارَةَ هٰذَا بِبَرْدَةِ هٰذَا وَيَبُوْسَةِ هٰذَا بِرُطُوْبَةِ هٰذَا

"যদি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ক্ষতিকর খাদ্য খেতেই হত তখন তিনি অন্য কোন ভাল খাদ্যের দ্বারা উক্ত খাদ্যের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দূর করে নিতেন। অর্থাৎ ঐ জিনিসের গরম প্রতিক্রিয়াকে অন্য ঠান্ডা জিনিস দ্বারা এবং শুকনা জিনিসের প্রতিক্রিয়াকে আদ্র কোন জিনিস দ্বারা দূর করে নিতেন।"

অতঃপর আল্লামা হাফেয ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) কাঁকড়ী ও তাজা খেজুরের উদাহরণ দেন, যা একটা অন্যটার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দূরে করে থাকে। এভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুকনা খেজুরকে ঘি এবং মাখন-এর সঙ্গে মিশিয়ে খেতেন, যাতে ঘিয়ের মাধ্যমে এর শুষ্কতা দূর হয়ে যায়।

– যাদূল মাআদ ঃ খণ্ড ঃ ২

আবূ দাঊদ ও তিরমিযী শরীফে এরূপ একটি রেওয়ায়াতও বিদ্যমান রয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাজা খেজুরের সাথে খরবুজা খেতেন এবং বলতেন যে, খরবুজা খেজুরের গরম দূর করে দেয়।

–যাদুল মাআদ ঃ খন্ডঃ২

গাভীর দুধ এবং ঘি

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عنه يرفعه عليكم بِلَبَنِ الْبَقَرِ فَاِنَّهَا شِفَاءٌ وَسَمْنُهَا دَوَاءٌ وَلَحْمُهَا دَاءٌ

হযরত সুহাইব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা অবশ্যই গাভীর দুধ পান করবে। কেননা এর

মধ্যে শেফা রয়েছে এবং এর ঘির মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। আর এর গোশতের মধ্যে রোগ রয়েছে। – যাদুল মাআদ ঃ খন্ড ঃ ২

মুসদাতরাক গ্রন্থের "তিব্ব" অধ্যায়ের প্রথম হাদীস হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে এমন কোন রোগ-ব্যাধি পাঠান নাই যার ঔষধ প্রেরণ করেন নাই। আর গাভীর দুধের মধ্যে প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধক রয়েছে।"

এই অধ্যায়েরই তৃতীয় হাদীসে শেফার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, فَاِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ شَجَرٍ "কেননা গাভী সব ধরনের গাছের পাতা খেয়ে থাকে।" –মুসতাদরাকে হাকেম

হাকীকত হল, উট, মহিষ, ভেড়া, বকরী এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর তুলনায় গাভীর দুধ উত্তম। সকল প্রকার ক্ষতি থেকে মুক্ত এবং কতিপয় রোগের শেফা। এতদ্ব্যতীত গাভীর ঘি, এবং মাখনও বহু রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে। চিকিৎসকগণ এটাকে ঔষধ হিসাবে ব্যবস্থা করে থাকেন।

তবে গরুর গোশত যেহেতু গরম, তাই এর গরম প্রতিক্রিয়া কিছুটা সমস্যাও সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু আমাদের কখনও একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, গরুর গোশত হালাল। আর হালাল কোন কিছুকেই নিজের জন্য হারাম মনে করার অনুমতি শরীয়ত কখনও দেয় নাই। তবে ডাক্তারী মতে গরুর গোশত খাওয়া না খাওয়া ভিন্ন কথা।

খেজুর এবং কাঁকড়ী

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ رض قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাজা খেজুর এবং কাঁকড়ী একত্রে খেতে দেখেছি।" – বুখারী, মুসলিম, মিশকাত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাওয়ার এই পদ্ধতিটি কতই না চিকিৎসা সম্মত ছিল। رُطَبْ পাকা তরু তাজা খেজুরকে বলে। কাঁচা হোক বা শুকনা হোক খেজুর তাঁর নিজস্ব সর্বপ্রকার উপকারের সঙ্গে সঙ্গে গরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। খেজুরের প্রতিক্রিয়া এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিকিৎসা বিষয়ক 'আজওয়া খেজুর' শিরোনামে চতুর্থ অধ্যয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

কাঁকড়ীকে আরবীতে কিস্সা বলা হয়। মূলতঃ কাঁকড়ী ভিজা পানসা হয়ে থাকে। এর স্বভাব প্রতিক্রিয়াও ঠাণ্ডা। ধনী দরিদ্র নির্বেশেষে সকলের জন্যেই এটা ফল এবং সব্জি দুইটিই। এটা পিপাসা, গরম, জ্বালা-যন্ত্রণা এবং রক্তের চাপ ইত্যাদি কমিয়ে দেয়। অতি দ্রুত হজম হয়। –হায়াতে জিন্দিগী ঃ পৃঃ ১১৪

কাঁকড়ী অন্তরে শান্তি আনে। পেশাব সৃষ্টি করে। প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা দূর করে। মূত্রদ্বার দিয়ে পূঁজ, রক্ত ইত্যাদি নির্গত হওয়া বন্ধ করে। মূত্রাশয়ের পাথর এবং মূত্র থলীর জন্য বিশেষ উপকারী।

–কিতাবুল মুফরাদাতঃ খাওয়াস্সুল আদবিয়া ঃ পৃঃ ২৭৮

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা কাঁকড়ীর মধ্যে শতকরা ৭৫.৬ ভাগ প্রাকৃতিক পানি, জমা করে দিয়েছেন। ১/২ ভাগ মাংস, ২/৩ ভাগ শ্বেতসার বা মাড় রয়েছে। তাছাড়া এতে তৈলাক্ত পদার্থ, খনিজ লবণ, পটাশিয়াম, লাইম, ফসফরাস, সালফার ইত্যাদিও বিদ্যমান রয়েছে।

–সিহহাত আওর তন্দুরস্তীঃ পৃঃ ২০

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর এবং কাঁকড়ী এক সঙ্গে খেতেন।

তরমুজ এবং খেজুর

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ يَقُوْلُ يَدْفَعُ حَرَّ هٰذَا بَرْدُ هٰذَا

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি তরমুজ ও খেজুর একত্রে খেতেন আর বলতেন তরমুজ খেজুরের গরম দূর করে দেয়। আর তাজা খেজুর তরমুজের ঠান্ডা দূর করে। –আবূ দাউদ, তিরমিযী

رُطَبٌ বা তাজা খেজুর সম্পর্কে আমরা একটু আগেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এখানে بِطِّيْخٌ বা তরমুজ সম্পর্কে চিকিৎসকগণের গবেষণালব্ধ ফলাফলের সার নির্যাস তুলে ধরা হলঃ

তরমুজের স্বভাব প্রতিক্রিয়া ঠাণ্ডা, পিপাসা নিবারণকারী, (অধিক) পেশাব সৃষ্টিকারী ও কুষ্ঠ কাঠিণ্য দূরকারী। পিত্তজ্বর, দাহজ্বর, মূত্র জ্বালা, মূত্রাশয়ের পাথর, ক্ষত, ক্ষয়রোগ, বিরক্তি, শীর্ণতা এবং শুষ্ক কাশির জন্যও এর ব্যবহার বিশেষ ফলাদায়ক –কিতাবুল মুফরাদাত, খাওয়াছছুল আদবীয়াহ ঃ পৃঃ ১৩৭

তরমুজ গরমী, শুষ্কতা, পিত্ত, পিপাসা এবং রক্তের জোস সমভাবে দূর করে থাকে। এত উপকারী হওয়া সত্ত্বেও এটা বিলম্বে হজম হয়, মর্দামী শক্তি কমিয়ে দেয়। উত্তেজনা সৃষ্টি করে। (সিহ্হত ও যিন্দিগী ঃ পৃঃ ১১৩)

তরমুজ সম্পর্কে আলোচিত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবুন এবং একটু চিন্তা করে দেখুন, খেজুরের সঙ্গে তরমুজের ব্যবহার কতটুকু উপকারী এবং সর্বপ্রকার ক্ষতিকর দিক থেকে কিভাবে বেঁচে থাকা যায়।

খেজুর এবং মাখন

عَنْ اِبْنَیْ بُسْرِ السُّلَمِیَّیْنِ قَالاَ دَخَلَ عَلَیْنَا رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْـہِ وَسَلَّمَ فَقَدَّمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا وَکَانَ یُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ۔

বুসর সুলামী (রাযিঃ)-এর দুই পুত্র (আতিয়া এবং আবদুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ঃ তাঁরা বলেন, আমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাশরীফ আনলেন। আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তাজা খেজুর এবং মাখন রাখলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাখন এবং তাজা খেজুর পছন্দ করতেন।

—মিশকাত শরীফ, যাদুল মাআদ ঃ খন্ডঃ ৩

আরবে বিভিন্ন প্রকার খেজুর জন্মে থাকে। বিশেষ করে মদীনা মুনাওয়ারায় হরেক রমক খেজুর পাওয়া যায়।

তন্মধ্যে আজওয়া, সালবী, জ্বলি ইত্যাদি খেজুরের বৈশিষ্ট্য হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। আম্বর খেজুর সম্ভবতঃ আকারে সবচেয়ে বড়, সুস্বাদু ও দামী খেজুর। সুবাখখাল খেজুর শুষ্ক ও উগ্র স্বভাবের হয়ে থাকে। এটাকে বীচি হীন বাজে ফল মনে করা হয়। আমাদের দেশের অশিক্ষিত লোকেরা এ ধরনের বীচি হীন খেজুরকেই আজওয়া মনে করে থাকে।

উপরোল্লিখিত হাদীসে "তামার"কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দনীয় খেজুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'তামার' শুকনা খেজুরকে বলা হয়। সুবহানাল্লাহ! প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মভূমির তাজা খেজুর সর্ম্পকে কি আর বলব। সে খেজুর কতইনা সুস্বাদু ও মিষ্টি হয়। সবচেয়ে বড় কথা হল, এটা নবী করীম (সঃ)-এর খুব পছন্দনীয় এবং তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিল।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় খাদ্য গোশত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দনীয় খাদ্যের মধ্যে গোশত সর্বদা তালিকার শীর্ষস্থান লাভ করেছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোশত খুবই পছন্দ করতেন এবং খুবই প্রশংসা করতেন। এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর ইরশাদ লক্ষ্যণীয় ঃ

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ طَعَامِ اَهْلِ الدُّنْيَا وَاَهْلِ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, দুনিয়া এবং জান্নাতবাসীদের প্রধান খাদ্য গোশত। –ইবনে মাজাহ, যাদুল মাআদ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্য এক সাহাবী হযরত বুরাইদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

خَيْرُ الْاِدَامِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اللَّحْمُ

"দুনিয়া এবং আখেরাতের সর্বাপেক্ষা উত্তম সালুন হল গোশত।"

–যাদুল মাআদ

এ সকল বর্ণনাসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তিগতভাবেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গোশত পছন্দনীয় খাদ্য ছিল। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দনীয় খাদ্যের উপকারিতা সূর্যের মত স্পষ্ট। পৃথিবীর সকল হেকিম ও চিকিৎকগণ এ ব্যাপারে একমত যে গোশতের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ জীবনীশক্তি রয়েছে। অন্য কোন বস্তুর মধ্যে সম্ভবত গোশতের মত এত শক্তিবর্ধক ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মজবুতকারী শক্তি নাই। সবচেয়ে বড় কথা হল, যে জিনিস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীগণ করতেন, আমাদের এত কিছু তাহকীকেরও প্রয়োজন নাই। তবে যদি সে বিষয়ে তাহকীক করতে হয় তবে সেটা মনের এতমিনান ও ঈমান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হতে হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দনীয় গোশত

গোশতের মধ্যে বাজু এবং গর্দানের গোশত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব পছন্দনীয় ছিল। সুবহানাল্লাহ! হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্বাচন কতই না ত্রুটিমুক্ত ও যুক্তিযুক্ত ছিল।

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে কিছু গোশত নিয়ে আসা হল এবং তার মধ্য হতে বাজুর গোশত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে এগিয়ে দেওয়া হল। তিনি বাজুর গোশত পছন্দ করতেন। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গোশত দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খেলেন।" – তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

একটি প্রসিদ্ধ ঘটনার মধ্যে এ শব্দ সমূহ এসেছে ঃ

أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَ تُعْجِبُهُ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গোশত আনা হল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বাজুর গোশত পছন্দনীয় ছিল তাই উত্তম গোশতের মধ্যে হতে বাজুর গোশত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া হল।"

–যাদুল মাআদ ঃ খন্ডঃ ২, বুখারী ও মুসলিম শরীফের বরাতে

গর্দানের গোশতের ব্যাপারে হযরত যুবায়াহ বিনতে যুবাইর (রাযিঃ)-এর বর্ণনা লক্ষ্য করুন। তিনি বলেন, আমরা একবার আমাদের বাড়ীতে বকরী জবাই করলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর পাঠালেন যে, আমার অংশ পাঠিয়ে দিন। আমি বললাম, শুধু মাত্র গর্দানের গোশত অবশিষ্ট আছে এবং এটা পাঠাতে আমার লজ্জা হচ্ছে। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাল্টা বলে পাঠালেন, এটাই পাঠিয়ে দিন। গর্দানের গোশত বকরীর উত্তম অংশ। গর্দানের গোশত ভালর নিটকতর এবং ক্ষতি থেকে দূরতর।

–যাদুল মাআদ ঃ খন্ডঃ ২

এ সকল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গোশত খুব প্রিয় ছিল, বিশেষ করে বাজু এবং গর্দানের গোশত আরও অধিক প্রিয় ছিল।

প্রিয় গোশত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন গোশত প্রিয় ছিল? এই প্রশ্নের জবাবে সাহাবায়ে কিরামদের (রাযিঃ) নিম্নোল্লিখিত বর্ণনা সমূহও পাঠ করুন। সবগুলি হাদীসই শামায়েলে তিরমিযী হতে লওয়া হয়েছে।

(১) হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে,

اَنَّهَا قَرَّبَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا مَّشْوِيًّا فَاَكَلَ مِنْهُ

"তিনি (হযরত উম্মে সালমা রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ভুনা রান নিয়ে গেলে তিনি তা খেলেন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اَكَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِوَاءً

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারেস (রাযিঃ) বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ভুনা গোশত খেয়েছি।"

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ

(৩) "হযরত ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁধের গোশত পছন্দ করতেন।"

عَـنْ عَـائِشَـةَ قَـالَتْ كَـانَتِ الذِّرَاعُ اَحَبَّ اللَّحْمِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى ا للّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁধের গোশত সর্বাপেক্ষ বেশী পছন্দ করতেন।"

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اَطْيَبَ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই পিঠের গোশত সর্বোত্তম।"

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ...... ثُمَّ رَاٰهُ اَكَلَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ

(৫) হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ঃ .... অতপর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বকরীর কাঁধের মাংস খেতে দেখলাম।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ জানোয়ারের কোন্ অংশের গোশত পছন্দ করতেন তা যাতে এক নযরে জানা যায় সে উদ্দেশ্যে উপরোল্লিখিত বর্ণনাগুলির সার সংক্ষেপ তুলে ধরলাম। তা হল-

সামনের উরুর গোশত, ঘাড়, রান, কাঁধ, পিঠ, বিশেষ করে ভুনা গোশত।

ভুনা গোশত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গোশত খুবই প্রিয় ছিল এটা আপনারা লক্ষ্য করেছেন। তবে সামনের রান ও ঘাড়ের গোশত বেশী পছন্দনীয় ছিল। এ সম্পর্কে অন্য একজন সাহাবীর (রাযিঃ) বর্ণনা দেখুন ঃ

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضِفْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ ثُمَّ اَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَهُ يَحُزُّ لِيْ بِهَا مِنْهُ ....

"হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, একদা রাত্রে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে (কোন স্থানে) মেহমান ছিলাম। আপ্যায়নকারী একটা বকরী জবাই করল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের রান ভুনা করতে বললেন। অতঃপর একটা ছুরি নিলেন এবং আমার জন্য উক্ত রান থেকে ছুরি দিয়ে কাটতে লাগলেন।

–তিরমিযী, মিশকাত

এ হাদীসের দু'টি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। প্রথমতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুনা গোশত পছন্দ করতেন। তাই শুধু শুষ্ক রুটি খাওয়াই সুন্নত নয় রবং স্বচ্ছলতা থাকলে সুস্বাদু এবং উত্তম খানা খাওয়াও সুন্নতের খেলাফ নয় বরং এটাও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত সুন্নত।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় উভয় অবস্থার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো ছুরি দিয়ে কর্তন করা এবং টুকরা করা সুন্নত পরিপন্থি নয়। অবশ্য কাটা চামচের ব্যবহার একেবারেই পাশ্চাত্য ফ্যাশন। এখন রসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আমাদের মহব্বত এবং সম্পর্কই প্রমাণ করবে যে, আমরা কোন পদ্ধতি ও সভ্যতা গ্রহণ করব। একজন প্রকৃত প্রেমিক স্বীয় প্রেমাস্পদের পছন্দনীয় কাজের উপর জীবন উৎসর্গ করাকেই জীবনের স্বার্থকতা মনে করবে। বাহ্যতঃ তা যতই নগণ্য মনে হোক না কেন।

পাখির গোশত

(১) হযরত যাহদাম জারমী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ঃ হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ) বলেন ঃ

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُلُ لَحْمَ دجَاجٍ

"আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মোরগের গোশত খেতে দেখেছি।"

(২) হযরত ইব্রাহীম ইবনে ওমর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তার দাদা সাফিনা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন,

اَكَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حبَارىٰ

"আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে "হুবারার'গোশত খেয়েছি।"

উক্ত হাদীসদ্বয় শামায়েলে তিরমিযী থেকে নেওয়া হয়েছে।

"দুজাজ" মোরগকে বলা হয়। আর হুবারা ছাই রংগের এক প্রকার পাখি যার গর্দান এবং ঠোঁট লম্বা হয়ে থাকে। ফার্সীতে এটাকে 'তাগদীরা' এবং 'চারয' বলা হয়। কোন কোন পন্ডিত ব্যক্তি এটাকে সুরখাবও বলে থাকেন।

(৩) হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমরা "মাররা যাহরান" নামক স্থানে গর্ত থেকে একটা খরগোশ বের করলাম। লোকেরা এটার পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্ত হয়ে গেল। তবে আমি শেষ পর্যন্ত এটা ধরেই ফেললাম এবং আবূ তালহার (রাযিঃ) নিকট নিয়ে এলাম। তিনি এটা জবাই করে এর পাখা অথবা রান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠিয়ে দিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে তিনি এটা থেকে কিছু খেয়ে ছিলেন।" – বুখারী শরীফঃ কিতাবুল হেবাহ

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোরগ, হুবারা (তাগদীর সুরখাব) এবং খরগোশের গোশত আহার করেছেন। যদিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোশত খাওয়ার সুযোগ কম হয়েছে তথাপি গোশত খুবই পছন্দ করতেন। বিশেষ করে গর্দান, সামনের দিকের বাজুঁর গোশত এবং রানের গোশত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুবই প্রিয় ছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে বলেন, "তাঁরা উড়ন্ত পাখীর গোশত ভক্ষণ করবে, যে পাখীর মাংস তাদের দিলে চায়।"

–সূরা ওয়াক্বেয়াহ ঃ আয়াত ঃ ২১

ইউনানী, এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক নির্বিশেষে সকল পদ্ধতির চিকিৎসকগণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে একথার উপর একমত যে, মানসিক রোগের ক্ষেত্রে মোরগ এবং পাখীর গোশত অন্য সকল প্রকার গোশতের চেয়ে বেশী উপকারী। প্যারালাইসিসগ্রস্ত রোগীকে জংলী কবুতরের গোশত ঔষধ হিসাবে খাওয়ান হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় খাদ্য সরীদ

'সরীদ' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা বিশেষ প্রিয় খাদ্য ছিল। এ সম্পর্কে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিটকতম সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) -এর বর্ণনা নকল করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি –

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَحَبُّ الطَّعَامِ اِلَى الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلثَّرِيْدُ مِنَ الْخُبْزِ وَالثَّرِيْدُ مِنَ الْحَيْسِ

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তম খাদ্য ছিল "সরীদ"। সরীদ রুটি থেকে তৈরী হয় এবং 'হাইস' থেকেও তৈরী হয়।

– আবূ দাঊদ, মিশকাত শরীফ

এই রেওয়ায়েতে সরীদের দুইটি অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

(১) রুটি থেকে সরীদ অর্থাৎ রুটির টুকরা তরকারীর সুরবা বা পাতলা ডালের মধ্যে এমনভাবে ভিজিয়ে রাখা যেন রুটি খুব ভাল করে ভিজে যায় এবং তা চর্বনের প্রয়োজন না হয়। এই খানা নরম হয় এবং দ্রুত হজম হয়ে যায়।

(২) হাইস থেকে সরীদ অর্থাৎ ছাতুর মধ্যে খেজুর, পনির, ঘি, মিশ্রিত করে সালিদার মত যা তৈরী করা হয়। এ প্রকারে খাদ্য তৈরীর উদ্দেশ্যে হল খানা নরম হওয়া এবং চিবানোর প্রয়োজন না হওয়া আর হজম করতে কষ্ট না হওয়া।

প্রথমত ঃ ছাতু দ্রুত হজম হওয়া ছাড়াও রোগ নিরাময়ের কাজ করে। তাছাড়া এ পদ্ধতিতে তৈরী করায় অন্য উপকারও রয়েছে। এই প্রকার সরীদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় "হালুয়া" ছিল।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা প্রিয় খাদ্য লাউ

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ خَيَّاطًا دَعَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَ فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّبَ خُبْزًا شَعِيْرًا وَمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيْدٌ فَرَأَيْتُ االنَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالِى الْقَصْعَةِ فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ

"হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ঃ একদা এক দর্জি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খানা খাওয়ার দাওয়াত দেয়। আমিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যাই। (আমন্ত্রণকারী) জবের রুটি এবং সুরবা পরিবেশন করল যার মধ্যে লাউ ও শুকনা গোশত ছিল। আমি দেখলাম আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের কিনার থেকে লাউয়ের টুকরা খুঁজে বের করছেন। সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত লাউ সর্বদাই আমার প্রিয় খাদ্য।" –বুখারী, মুসলিম

লাউ কয়েক প্রকার। আমাদের দেশে লাউকি, ঘিয়া লাউ গোল লাউ বা পিলকদু এবং লাল ফুল কদু সচরাচর পাওয়া যায়। প্রথম দুই প্রকার কম বেশী প্রায় একই বৈশিষ্ট্যের। কিন্তু তৃতীয় প্রকার একেবারেই ভিন্ন ধরনের, শুধু নামে মিল রয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাউকী পছন্দ করতেন। যাকে সাদা ফুলের কদু এবং ঘিয়া কদুও বলা হয়। এটা এক উত্তম তরকারী। খেতে খুবই সুস্বাদু এবং কার্যকারিতাও স্বাস্থ্য সম্মত, এবং স্বভাব খুবই ঠান্ডা এবং খুবই দ্রুত হজমকারী, পাকাতেও সুবিধা। এ দিকে চুলার উপর হাড়ি রাখা হল তো ওদিকে পাক হয়ে গেল। লাউয়ের তরকারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুবই প্রিয় ছিল। –ইবনে মাজা

হালুয়া এবং মধু

আমাদের দেশে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত খাদ্য সমূহের মধ্য হতে বিশেষভাবে খেজুর, মধু, হালুয়া এবং ছাতু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। রোযাদারের জন্য খেজুর দ্বারা ইফতার করা সুন্নত।

ছাতু পান করা এবং খানার সময় দস্তরখানার উপর হালুয়ার ব্যবস্থা থাকা একটা পছন্দনীয় সুন্নত। অবশ্য ছাতু শুধুমাত্র গ্রাম অঞ্চলের পানীয় হিসেবে সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে মধু সর্বত্রই এবং সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হালুয়া (মিষ্টি) আমাদের খাদ্যের সঙ্গে, বিশেষ করে কোন মাহফিলের পরে অত্যাবশ্যক একটা অংশ।

এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) এর ইরশাদ লক্ষ্য করুন– তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালুয়া -মিষ্টি এবং মধু পছন্দ করতেন।" – মিশকাত শরীফ

আমরা সস্তা সুন্নত অন্বেষণকারী এবং সহজ সুন্নতের উপর আমলকারীরা এ বিষয়টা একেবারে ভুলে যাই যে, আরবী পরিভাষায় হালুয়া দ্বারা সকল প্রকার মিষ্টান্ন জাতীয় দ্রব্য বুঝায়। এমন কি কখনও কখনও মিষ্টি ফলকেও হালুয়ার মধ্যে শামিল করা হয়। (দ্রষ্টব্য মিশকাতের শরাহ্ মিরক্বাত)

আমরা উন্নত মানের সুজি এবং দেশী ঘি-এর সঙ্গে ছোট এলাচ, বাদাম, পেস্তা মিলিয়ে যে, সুস্বাদু "সুন্নত" হালুয়া তৈরী করে থাকি খয়রুল কুরুন অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী দুই যুগের লোকেরা সম্ভবত এ ধরনের খাদ্যের কথা চিন্তাও করতে পারেন নাই।

বিশ্বের শান্তির দূত হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক প্রকার হালুয়ার পরিচয় আপনারা সরীদের অধ্যায়ে লক্ষ্য করে থাকবেন। যে হালুয়ার উপাদান ছিল ছাতু, খেজুর এবং পনির অথবা দুধ। অন্য এক ধরনের প্রিয় হালুয়া তৈরী হত না-ছানা আটার মধ্যে খেজুরের রস মিশিয়ে।

পীলুর কাল ফল

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْاَسْوَدِ مِنْهُ فَاِنَّهُ اَطْيَبُ فَقِيْلَ اَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ فَقَالَ نَعَمْ ـ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا رَعَاهَا ـ

হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে থেকে "মার্‌রে যাহ্‌রান" এ মধ্যে

"কাবাছ" (পিলুর ফল) টুকাইতেছিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কালো কালো ফল বেছে নাও। কারণ এগুলি খুব ভাল হয়ে থাকে। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রশ্ন করা হল, আপনি কি বকরী চরিয়েছেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হ্যাঁ, এমন কোন নবী নাই যিনি বকরী চরান নাই।" –বুখারী, মুসলিম

হযরত জাবের (রাযিঃ)-এর বর্ণনায় উপরে যে "মার্‌রে যাহ্‌রান" সম্পর্কে বলা হয়েছে তা হলো মক্কার নিকটবর্তী একটা উপত্যকা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্থান দিয়ে সাহাবীগণের একটা জামাআত নিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় সাহাবাগণ যখন কিবাস বা পিলু ফল সংগ্রহ করছিলেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন কালো কালো ফল সংগ্রহ কর। কারণ এগুলি উত্তম।

পিলু গাছ আমাদের দেশেও পাওয়া যায়। যা ঘন ছায়া বিশিষ্ট এবং পাতাগুলি পাতলা পাতলা হয়ে থাকে। গরমের মৌসুমে এগুলির ছায়া একটা নিয়ামত বিশেষ। মূলতঃ আমাদের দেশের পিলু ফল সাধারণত লালাভ হলুদ হয়ে থাকে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো দানাকে উত্তম বলে অভিহিত করেছেন।

যায়তুন এবং এর তৈল

عَنْ اَبِىْ اُسَيْدِ الْاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهٖ فَاِنَّهٗ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ -

"হযরত আবূ উসাইদ আনসারী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা যায়তুনের ফল খাও এবং এর তৈল ব্যবহার কর। কারণ এটা একটা বরকতপূর্ণ বৃক্ষ। –মিশকাত, দারেমী, তিরমিযী

যায়তুন একটা ফলদার গাছের নাম এবং ঐ গাছের ফলকেও যায়তুন বলা হয়। ইংরেজীতে এটাকে ওয়ালিভ (OLIVE) বলা হয়। যায়তুনের তেলকে "যাইত" বলা হয়। শামদেশ এবং এর আশপাশে এই গাছ প্রচুর জন্মে থাকে। কোন কোন শীত প্রধান দেশেও এ গাছটি পাওয়া যায়। এর বরকত এবং উপকারিতা এ কারণেও হতে পারে যে আল্লাহ তা'আলা তার সর্বশেষ গ্রন্থের চার স্থানে যায়তুন শব্দটি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামে যায়তুন এর কসম খেয়েছেন। যথা –

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ

যায়তুনের ফল এবং তৈল দু'টিই একান্ত উপকারী এবং ফায়দা দায়ক। হৃৎপিন্ড, মস্তিষ্ক এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জন্যে শক্তি বর্ধক। মৃদু গরম তাসীর বিশিষ্ট। শরীরে শক্তি জোগায়। এর ফল ও তেল খাদ্য এবং ঔষধ দুটিই। আরব দেশে যায়তুনের তৈল ঘি -এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। দস্তরখানার সৌন্দর্য ও জাঁকজমক মনে করা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়তুনের তেল এবং ফল উভয়ই ব্যবহার করতে বলতেন। আর এ দুটিকে বরকতময় বলেও আখ্যায়িত করেছেন। যায়তুনের তৈল নাশপতি এবং খাঁটি ঘি অপেক্ষা উত্তম।

সিরকা টক ও ঝালযুক্ত একটি উত্তম সালুন

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ اَهْلَهُ الْاَدَامَ فَقَالُوْا مَا عِنْدَنَا اِلَّا خَلٌّ فَدَعَابِهٖ فَجَعَلَ يَاكُلُ بِهٖ وَيَقُوْلُ نِعْمَ الْاِدْمُ الْخَلُّ نِعْمَ الْاِدْمُ الْخَلُّ ـ

"হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আহলে বাইত (ঘরওয়ালাদের) নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, ঘরে কি কোন সালুন বা তরকারী (মাছ, গোশত বা সব্জীর ব্যঞ্জন) আছে? ঘরের লোকেরা বললেন, ঘরে সিরকা ব্যতীত অন্য কিছু নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা চেয়ে নিলেন এবং তা দ্বারা খানা খাওয়া শুরু করলেন। তিনি খানা খেতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, সিরকা কতইনা ভাল তরকারী; সিরকা কতইনা উত্তম তরকারী।" – মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ

লক্ষ্য করার বিষয়, তিনি সর্বোত্তম মানুষ হয়েও কেমন সরল সহজ ছিলেন যে, ঘরে যা কিছু উপস্থিত ছিল কোন লৌকিকতা না করে তা দিয়েই আহার করে ফেললেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিন্দিগীর মধ্যে কতইনা অল্পে তুষ্টি (কানায়াত) এবং ধৈর্য্য ও শুকরিয়া ছিল যে, ভাল খারাপ যা কিছু মিলত তাতেই রাযী ও সন্তুষ্ট থাকতেন। আজ এমন কোন নেতা আছেন যিনি এমন একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে স্বচ্ছল লোকদের ঘরে কোন্ জিনিসের অভাব ছিল? মক্কা ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল। সমস্ত দেশের ব্যবসায়ের পণ্য এবং দূর ও নিকটের সকল ধরনের নিয়ামত সেখানে সহজ লভ্য ছিল। তথাপি তিনি সিরকাকে তরকারীর মত ব্যবহার করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একথা বলে প্রশংসাও করতেন যে, "সিরকা উত্তম তরকারী, "সিরকা উত্তম তরকারী।"

সিরকা মূলতঃ এত উপকারী যা বর্ণনা করে শেষ করার নয়। পেটের হাজারো সমস্যার উত্তম ঔষধ। পাকস্থলীর এবং হজম শক্তির সীমাহীন সহায়ক। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে এক উপাদেয় জিনিস। তবে এটা খানার অতিরিক্ত একটা আইটেম, তরকারী নয়। তথাপি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে তরকারী হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

রাতের খানা

আল্লামা হাফেয ইবনে কায়্যিম (রাযিঃ) দোজাহানের বাদশাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খানা সম্পর্কিত আলোচনার শেষ পর্যায়ে একটা বিশেষ দরকারী এবং উপকারী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সে বিষয়টি তাঁর ভাষায়ই উল্লেখ করা হল।

ইবনে কায়্যিম (রহঃ) বলেন ঃ

وَكَانَ يَأْمُرُ بِالْعَشَاءِ وَلَوْ بِكَفٍّ مِّنْ تَمْرَةٍ وَيَقُولُ تَرْكُ الْعَشَاءِ يُهْرِمُهُ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে খানা খাওয়ার নির্দেশ দিতেন যদিও এক মুষ্টি অথবা তার কম পরিমাণ খেজুর দিয়ে হোক না কেন, এবং তিনি বলতেন রাত্রের খানা ত্যাগ করা বার্ধক্য আনে।"

–যাদুল মাআদঃ খন্ডঃ ২

আজকাল অনেক লোকই অজ্ঞতার কারণে অভ্যাসগত ভাবে রাত্রে খানা খায় না। এবং তারা ধারণা করে এতে বদহজমী থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তাদের স্বীয় অভ্যাস পরিবর্তন করে ফেলা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অথবা কোন সমস্যার কারণে এমন করতে হলে ভিন্ন কথা। তা না হলে রাত্রের খানা যৎসামান্য হলেও খাওয়া চাই।

রাত্রের খানার ব্যাপারে এ বিষয়টিও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রের খানা খেয়েই তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়া অথবা ঘুমিয়ে যাওয়াকে নিষেধ করেছেন। সে মতে চল্লিশ কদম হাটা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। অর্থাৎ রাত্রের খানা খাওয়ার পর চল্লিশ কদম হাটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল।

আর এর বিপরীত দুপুরে খানার পর কায়লুলা করা অর্থাৎ কিছু সময়ের জন্যে শুয়ে আরাম করা সুন্নতে নববী। রাত্রের চল্লিশ কদম হাটা এবং দুপুরের কায়লুলার উপকারিতা প্রত্যেকের নিকট স্বীকৃত।

জবের রুটি

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদ্য বিষয়ে আমি আল্লামা হাফেয ইবনে কায়্যিম (রহঃ)-এর বর্ণনা বিস্তারিতভাবে নকল করেছি। এতে যেন কারো এই ধারণা না হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধরনের খানায়ই অভ্যস্থ ছিলেন এবং প্রতিদিনই আল্লাহর নিয়ামত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দস্তর খানায় থাকত। মোটেই নয়। বরং এর একেবারে বিপরীত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদ্য সাদাসিধা বরং অধিকাংশ সময়ই তাকে অনাহারে কাটাতে হত। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমার মনে পড়ে না যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় লাগাতার এক সপ্তাহ আমাদের ঘরে চুলা জ্বলেছে।

হযরত ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ছালাম (রাযিঃ)-এর নিম্নের রেওয়ায়াতটি লক্ষ্য করুন ঃ

قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ كَسْرَةً مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً فَقَالَ هٰذِهِ اِدَامُ هٰذِهِ

"তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম এর তরকারী।"

"হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ পর্যায় ক্রমে কয়েক রাত অনাহারে কাটিয়ে দিতেন। রাত্রের খানার জন্য কোন ব্যবস্থা হত না এবং অধিকাংশ সময় রুটি জবের হত।"

সাদামাটা খাদ্য

আপনারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় খাদ্য সম্পর্কে জেনেছেন। এখন দোজাহানের বাদশাহ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (দৈনন্দিন) প্রকৃত খাদ্য সম্পর্কে জানুন। তাহলে বুঝতে পারবেন, দোজাহানের বাদশাহ কেমন কষ্টে যিন্দেগী যাপন করতেন এবং পৃথিবীতে ধৈর্য্য, শুকরিয়া অল্পেতুষ্টি ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর কেমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

এ ব্যাপারে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ খাদেম হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর বর্ণনা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الثُّفَلُ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁড়ির খুরচন অর্থাৎ হাঁড়ির তলায় লেগে থাকা অংশ পছন্দ করতেন।" – তিরমিযী, বায়হাকী, মিশকাত

হযরত ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ নামক অন্য এক সাহাবী বর্ণনা করেন ঃ

رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ فَوَضَعَ عَلَيْهِ تَمْرَةً فَقَالَ هٰذِهِ اِدَامُ هٰذِهِ

"আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তিনি জবের তৈরী একটা রুটি নিলেন এবং এর উপর খেজুর রেখে বললেন, এটা হল তরকারী, এটা হল তরকারী।"

যে নবীর গুণাবলী বর্ণনা করে শেষ করা যায়না। সেই সর্বোত্তম মানুষটির অবস্থা দেখলেন? হাঁড়ির অবশিষ্ট অংশ (তলানী) আগ্রহ সহকারে খেতেন এবং জবের রুটি ছিল তার দৈনন্দিন খাদ্য। আর জবের রুটির সঙ্গে খেজুরের দানা তরকারী হিসেবে ব্যবহার করতেন এবং বড় সন্তুষ্ট চিত্তে বলতেন "এটা হল সালুন। এট হল সালুন।"

দুই বেলা গোশত রুটি

হযরত মাসরুক্ব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন,আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর নিকট গমন করলে তিনি আমার জন্য খানা আনলেন আর তিনি বলতে লাগলেন, আমি যখনি তৃপ্তি সহকারে খানা খাই তখনি আমার কান্না এসে যায় সুতরাং আমি কাঁদতে থাকি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আরয করলাম কেন?

তিনি বললেন,আমার ঐ সময়ের কথা মনে পড়ে যায় যখন আল্লাহর নবী পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন,

وَاللهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ

"আমি কছম খেয়ে বলছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দিনই দুই বেলা রুটি এবং গোশত তৃপ্তি সহকারে খান নাই।"

–শামায়েলে তিরমিযী

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযিঃ) যার লকব হল "সিদ্দীকা" বা সত্যবাদিনী তাঁর এ বর্ণনার চেয়ে আর কার বর্ণনা সত্য হতে পারে? যিনি ছিলেন

সত্যবাদী পিতা সিদ্দীকে আকবর-এর সত্যবাদিনী মেয়ে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন সঙ্গিনী, অন্তরঙ্গ বন্ধু, নির্জনতা ও লোকালয়ের গোপন তথ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি এবং তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

পক্ষান্তরে তাঁর উম্মতগণের অবস্থা হল, গোশত ছাড়া এক লোকমাও চলে না; সব্জীর মধ্যে গোশত, ডালে গোশত, চাউলে গোশত, সকালেও গোশত এবং সন্ধ্যায়ও গোশত চাই । আর দোজাহানের বাদশাহ এমন জীবন যাপন করেছেন যে, কোন এক দিনও দুই বেলা তৃপ্তি সহকারে গোশত রুটি আহার করেন নাই। তাই তো পরবর্তী খোশহাল যামানায় উম্মুল মুমিনীনের দুই চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত।

দস্তর খানায় গোশত রুটি

عَنْ مَالِكِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ مَا شَبِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ اِلَّا عَلٰى ضَفَفٍ

"হযরত মালেক ইবনে দিনার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'যফাফ" ব্যতীত না রুটি তৃপ্তি সহকারে খেয়েছেন না গোশত পেটভরে খেয়েছেন।"

হাদীসের বর্ণনাকারী মালেক (রযিঃ) বলেন, "আমি এক বদরী সাহাবীর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম 'যফাফ' অর্থ কি? তিনি বললেন, মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে খাওয়া। –শামায়েলে তিরমিযী

তরকারীর মধ্যে গোশত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক পছন্দনীয় ছিল। আর গোশতের মধ্যে দস্ত, রান, মাছএবং গর্দানের গোশত তিনি পছন্দ করতেন। কিন্তু দোজাহানের বাদশাহ সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ট ব্যক্তিত্বের তৃপ্তি সহকারে গোশত খাওয়ার সুযোগ হত কই ? উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, গোশত হোক অথবা রুটি হোক যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও তৃপ্তি সহকারে খেয়ে থাকেন তবে তা সম্মিলিত খানা তথা সাহাবীগণের মজলিসে বা কোন দাওয়াতের অনুষ্ঠানে খেয়েছেন।

এর দুটি কারণ হতে পারে। প্রথমতঃ তিনি তাঁর পবিত্র যিন্দেগীর অধিকাংশ সময় নেহায়েত দারিদ্র্য ও দুঃখ কষ্টের সঙ্গে কাটিয়েছেন, অনাহারে দিনাতিপাত করেছেন। আল্লাহ যখনই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অতিরিক্ত

কিছু দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি মানুষের মধ্যে তা বন্টন করে দিয়েছেন। নিজের জন্য পছন্দ করে কিছুই রাখেন নাই। দ্বিতীয়তঃ তিনি কখনই একাকী খাওয়া পছন্দ করতেন না, সর্বদাই অন্যকে খানায় শামিল করতেন এবং সাহাবীদেরকে সর্বদাই এই ত্যাগ ও কুরবানীর শিক্ষা দিতেন।

না চালা আটা

আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোরাক সম্পর্কে হযরত সাহল ইবনে সাআদ (রাযিঃ) থেকে একটা দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে। উক্ত হাদীসে তিনি একটা প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন। তাঁর নিকট কেউ প্রশ্ন করল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তোমাদের নিকট চালুনি ছিল কি? তিনি জবাবে বললেন আমাদের নিকট চালুনি ছিল না। অতঃপর প্রশ্ন করা হল তোমরা জবের আটা কি করতে? তিনি জবাবে বললেন,

كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ ثُمَّ نُثَرِّيهِ نَعْجِنُهُ

"আমরা তাতে ফুঁক দিতাম যা কিছু ভূসি ইত্যাদি উড়ার থাকত উড়ে যেত, অতঃপর আমরা তাতে পানি ছিটিয়ে গুলে নিতাম।"

–শামায়েলে তিরমিযী, বুখারী

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈনন্দিন খাদ্য সম্পর্কে একটু চিন্তা করা উচিত। যিনি উভয় জাহানের বাদশাহ, বিশ্বে শান্তির অগ্রদূত এবং সর্বশেষ নবী ছিলেন তাঁর খাদ্য কি ছিল? মোটা রুটি, সাদাসিধা তরকারী, জবের আটার রুটি, আর সাথে যদি দু'চারটা শুকনা খেজুর অথবা সামান্য কিছু সিরকা মিলত তবে খুবই আনন্দ চিত্তে খেয়ে শুকরিয়া আদায় করতেন।

হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর নিম্নোল্লেখিত হাদীসটি উপরোক্ত হাদীসটিকে আরো মজবুত করেঃ

مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا مُرَقَّقًا وَلَا شَاةً سَمُوطَةً حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শেষ সময় (ওয়াফাত) পর্যন্ত কখনও পাতলা রুটি এবং ভুনা বকরী আহার করেন নাই।" –বুখারী শরীফ

পানি আর খেজুর খেয়ে জীবন যাপন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্রা স্ত্রী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি হযরত ওরওয়া (রাযিঃ)কে বলেন, হে আমার ভাতিজা! নিশ্চয়ই আমি প্রথম তারিখের চাঁদ এবং এভাবে দু'মাসে তিনটি চাঁদ দেখতাম (অর্থাৎ পূর্ণ দু'মাস অতিবাহিত হয়ে যেত) কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে আগুন জ্বলত না (অর্থাৎ রান্না হত না)।"

আমি (ওরওয়া) বললাম "হে আমার খালা! আপনারা কিভাবে জীবন কাটাতেন?" তিনি (হযরত আয়েশা) জবাবে বললেন, শুধু মাত্র দু'টি কালো জিনিসের মাধ্যমে অর্থাৎ খেজুর এবং পানির সাহায্যে। তবে অন্য আরও একটি উপায় ছিল, তা হল কিছু আনসার ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশী ছিলেন, যাদের কিছু দুধওয়ালা পশু ছিল, তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ঐ জানোয়ারগুলির দুধ পাঠাতেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তা পান করতে দিতেন।" –বুখারী, মুসলিম

"হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) -এর পূর্বের বর্ণনায় আপনারা জেনেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথীগণ না চালা জবের আটার রুটি খেতেন, তবে পরপর দুদিন একটানা জবের রুটি মিলত না এবং একদিন দুবেলা গোশতও জুটত না। এখন আপনারা এই হাদীস শুনলেন যে, দুই মাস ধরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে চুলা জ্বলে নাই। তাদের দিনগুলি শুধু এক ঢোক পানি এবং খেজুরের দানা অথবা কখনও প্রতিবেশী আনসারদের পাঠান দুধে কেটেছে।

আল্লাহ! আল্লাহ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর ঘরওয়ালাদের মধ্যে কেমন ধৈর্য্য ছিল! মালে গনীমত এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অংশের ব্যাপারে সমালোচকদের চক্ষু খোলার জন্য এটা একটা বিরাট উপদেশ।

কম খাওয়া ঈমানদারের লক্ষণ

এক পেটুককে দেখে হযরত ওমর ফারুক (রাযিঃ)-এর ছেলে হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বললেন ঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ اِنَّ الْكَافِرَ يَاكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কাফেরগণ সাত অন্ত্র-নাড়ি দিয়ে খায় (অর্থাৎ অধিক খায়।" –তিরমিযী

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ)-এর নিম্নোক্ত বর্ণনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি (হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক কাফের মেহমান হল। তাকে একটা বরকীর দুধ দেওয়া হলে সে তা পান করে নিল। অতঃপর আর একটা বকরীর দুধ দেওয়া হলে এটাও পান করে ফেলল। এভাবে তিন, চার এমন কি সাতটি বকরীর দুধ শেষ করে দিল। পরের দিন সে ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে এক বকরীর পর দ্বিতীয় বকরীর দুধ দেওয়া হলে সে সবটুকু পান করতে পারল না। এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرِبُ فِيْ امْعى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرِبُ فِيْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ

"মু'মিন শুধু মাত্র এক নাড়ি দিয়ে পান করে আর কাফির সাত নাড়ি দিয়ে পান করে (অর্থাৎ মুমিনের তুলনায় কাফির সাতগুণ বেশী পান করে।" –মুয়াত্তা, তিরমিযী, বুখারী

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্প খাওয়া মুমিন ও মুসলমানদের আলামত বলে বর্ণণা করেছেন। পক্ষান্তরে পেটুক ও বেশী খাওয়াকে কাফেরের লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছেন। জন্মগতভাবে কারো খোরাক বেশী কারো কম হতে পারে কিন্তু সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের খোরাক কম হওয়া চাই। এতে শারিরীক সুস্থতা, অন্তরের পবিত্রতা এবং ঈমানী দৃঢ়তা হাসিল হয়। অধিক খাওয়ার কি ক্ষতি? তার ব্যাখ্যা অন্য পৃষ্ঠায় দেখুন।

অন্তরের রোগ-ব্যাধি এবং খানা

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اِنَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ـ اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ

"হযরত নোমান ইবনে বাশীর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ইরশাদ করেন, মনে রেখো, শরীরের মধ্যে (এমন) একটি মাংসপিন্ড আছে যতক্ষণ তা ঠিক থাকে সমস্ত শরীর ঠিক থাকে আর যখন তা খারাপ হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীর নষ্ট হয়ে যায়। খুব মনে রেখো! এটা হল অন্তর। –বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ

অন্তর বা ক্বলব যেমন সকল নেক ও বদ কাজের উৎস এবং এর ইচ্ছা প্রতিটি ভাল ও মন্দের প্রেরণা যোগায়। অনুরূপভাবে রক্তপিন্ডওয়ালা মাংসুল দিলের উপর মানুষের সুস্থতা ও অসুস্থতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। এর মধ্যে গন্ডগোল সৃষ্টি হলে মানুষের স্বাস্থ্যের মধ্যেও গন্ডগোল দেখা দেয়। আর সামান্য সময় যদি এর স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় তবে যিন্দিগির সম্পূর্ণ কার্যপ্রণালী উলট পালট হয়ে যায়। কারণ সমস্ত শরীরে রক্ত সরবরাহ এবং শিরা উপশিরার মাধ্যমে শরীরের সকল অংশে খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করা উক্ত মাংস পিন্ডের (ক্বলবের) কাজ। রূহানী রোগের চিকিৎসক বিশ্বজাহানের সর্দার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত উপদেশাবলীর মধ্যে ক্বলবের যাবতীয় রোগ-ব্যাধি হতে বেঁচে থাকার দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

(১) ক্ষুধার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল এবং কম খাদ্য খাওয়া।

(২) দুপুরের খানার পর সামান্য সময় আরাম করা, যাকে কায়লুলাহ বলা হয়। এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস রয়েছে।

(৩) হারাম খাদ্য খাওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। কেননা এতে রূহানী এবং শারীরিক রোগ ব্যতীত আর কিছুই নাই।

সর্বশেষ কথা হল ঃ

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

"জেনে রেখো! আল্লাহর স্মরণে (যিকিরে) অন্তরের প্রশান্তি হাসিল হয়।"

উঠা বসা ও চলাফেরার মৌলনীতি

এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে হাদীসগ্রন্থ সমূহ থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করছি এবং তাঁর বাস্তব জীবনের সর্বোত্তম আদর্শ হতেও কতিপয় নমুনা পেশ করছি।

এ বিষয়ে অনেক কিছুই লিখার ছিল এবং লিখার প্রয়োজনও আছে বটে। কিন্তু গ্রন্থের কলেবর দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার ভয়ে মনের ইচ্ছাকে মনেই দাবিয়ে রাখতে হল। অবশ্য হাদীস গ্রন্থসমূহে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উঠা বসা ও চলাফেরা শিরোনামে আলাদা অধ্যায় বিদ্যমান রয়েছে, যা পাঠ করা সকলের জন্যই অত্যাবশ্যকীয়।

আল্লাহ তা'আলাই সকল তৌফিকের মালিক।

কুঞ্চিত হয়ে বসা

عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِلُ الْقُرْفُصَاءِ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَخَشِّعَ فِي الْجِلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ

"হযরত ক্বাইলা বিনতে মাখরামা (রাযিঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুই হাটু উঁচু করে তাতে পবিত্র দুই হস্তদ্বারা পেছিয়ে ধরা অবস্থায় বসে থাকতে দেখিছি। তাঁকে এই বিনীত ভঙ্গীর বসা অবস্থায় দেখে আমি ভয়ে কেঁপে উঠি।"

–আবূ দাঊদ, শামায়েলে তিরমিযী

এই পবিত্র হাদীসে এমন কয়টি দিক রয়েছে, যা আমাদেরকে বিশেষ ভাবে চিন্তা করার আহবান জানাচ্ছে। প্রথমতঃ হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বসা কত সাদাসিধা ছিল। তিনি হাঁটুদ্বয় খাড়া করে দুই হাত তাতে জড়িয়ে ধরে কুঞ্চিত অবস্থায় বসেছেন। বসার এই ভঙ্গিটি যেমন সহজ ও সাদাসিধা তেমনি আরামদায়কও বটে। দ্বিতীয়তঃ এই ভঙ্গিতে বসার মধ্যে একজন বান্দার বিনয় ও দাসত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। এই বসার মধ্যে গর্ব ও অহংকারের কোন সন্দেহও প্রকাশ পায় না। বরং দর্শকের উপর এই ভঙ্গিতে বসার একটা গভীর প্রভাব পড়ে। তৃতীয়তঃ এই সরল ও বিনয়ী বসার ভঙ্গি বর্ণনাকারীণী সহাবিয়্যার উপর এমন প্রচন্ড প্রভাব ফেলেছিল যে, তিনি ভয়ে কেঁপে উঠেন। সুতরাং আমাদের এরূপ চিন্তা কত ভুল যে, সহজ সরলতার মধ্যে গাম্ভীর্য ও প্রভাব থাকে না এবং সহজ-সরলতার দ্বারা অন্যেরা প্রভাবিত হয় না।

অভিশপ্ত লোকদের বসার ভঙ্গি

عَنِ الشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّبِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا جَالِسٌ هٰكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيُسْرٰى خَلْفَ ظَهْرِيْ وَاتَّكَاتُ عَلٰى اِلْيَةِ يَدِيْ - قَالَ اَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ -

সারীদ ইবনে সুওয়াইদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট দিয়ে গমন করেন। তখন আমি এমন অবস্থায় বসা ছিলাম যে, আমার বাম হাত আমার পিঠের উপর ছিল এবং আমার বৃদ্ধাঙ্গুলীর নীচের গোশতের উপর টেক দিয়ে বসা ছিলাম। হুযুর পাক

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি এমনভাবে বসেছ যেভাবে সে সব লোক বসত, যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে?"

পূর্বে আপনারা রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদাসিধা কিন্তু গাম্ভীর্যপূর্ণ বসার ভঙ্গি কি ছিল তা পাঠ করেছেন। এবং এই সহজ সরল ও বিনয়ী বসার ভঙ্গি দর্শকদের উপর কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করত তাও দেখেছেন। এবারে বসার অপর দিকটির প্রতি লক্ষ্য করুন, যাকে রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশপ্ত লোকদের বসার ভঙ্গি বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাহ্যতঃ বসার এই ভঙ্গিতে গর্ব, সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ পায়। কিন্তু পরিণামে মানুষ আল্লাহর অভিসম্পাতের শিকার হয়। সুতরাং বসার জন্য আমাদের এমন ভঙ্গি .অবলম্বন করা উচিত যার মধ্যে সরলতা ও গাম্ভীর্য রয়েছে। আর এমন ভঙ্গির বসা থেকে আমাদের দূরে থাকা কর্তব্য যদ্দ্বারা বাহ্যতঃ অহংকার ও মর্যাদার প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু এই বসার দ্বারা মানুষ আল্লাহর গযবের উপযুক্ত হয়ে যায়।

চিত হয়ে শোয়া

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَأَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِى الْمَسْجِدِ وَاضِعًا اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে নববীতে এমন অবস্থায় চিত হয়ে শোয়ে থাকতে দেখেছেন যে, তখন তাঁর একটি পা অপর পায়ের উপর রাখা ছিল।" –বুখারী, মুসলিম।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুয়ার সাধারণ নিয়ম ছিল এই যে, তিনি ডান কাতে শুয়ে আরাম করতেন। সাধারণভাবে তাঁর ডান হাত মাথা মুবারকের নীচে থাকত এবং চেহারা আনওয়ার কেবলামুখী থাকত।

উপরোল্লেখিত হাদীসের বর্ণনাকারী একবার মাত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে চিত হয়ে শুইতে দেখেছেন। এটা ছিল একটা অসাধারণ ব্যাপার। হয়ত কাত পরিবর্তন করার জন্য তিনি এমন করে থাকবেন। এই মতের স্বপক্ষে যুক্তি হল এই যে, স্বয়ং বর্ণনাকারীই বলছেন যে, তখন তাঁর একটি পা মুবারক অন্যটির উপর রাখা ছিল। আর যদি এভাবেই তিনি শুয়ে থাকেন তবুও একপা অপর পায়ের উপর রাখার দ্বারা এ বিষয়ে তাঁর পূর্ণ সতর্কতার বিষয়টিই

পরিস্ফুট হয়ে উঠে। এভাবে পায়ের উপর পা রাখার কারণে শরীরের কাপড় এদিক সেদিক হতে পারে না। কারণ, ঘুম তো ঘুমই। গভীর নিদ্রায় অবচেতন হয়ে যাওয়া একটি অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। এমতাবস্থায় শরীরের কাপড় এদিক সেদিক হয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছুই নয়।

একথা ঠিক যে, প্রত্যেক ব্যক্তির অভ্যাস ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু পরম সৌভাগ্যশীল সেই ব্যক্তি, যে তার অভ্যাস রাসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাললামের মহান আদর্শ মোতাবেক গঠন করে দুনিয়া ও আখেরাতের অফুরন্ত কল্যাণ ও সফলতার অধিকারী হয়।

উপুড় হয়ে শোয়া

عَنْ يَعِيْشَ بْنِ طِخْفَةَ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ اَبِىْ بَيْنَمَا اَنَا مُضْطَجِعٌ فِى الْمَسْجِدِ عَلٰى بَطْنِىْ اِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِىْ بِرِجْلِهٖ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا ضَجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللّٰهُ ـ قَالَ فَنَظَرْتُ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"হযরত ইয়াঈশ ইবনে তিখফা (রাযিঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমি মসজিদে উপুড় হয়ে শোয়া ছিলাম। হঠাৎ আমি অনুভব করলাম যে, কেউ আমাকে তার পা দিয়ে নাড়া দিচ্ছে। অতঃপর বলছে যে, এভাবে উপুড় হয়ে শোয়াকে আল্লাহ অপছন্দ করেন। আমার পিতা বলেন, অতঃপর আমি চোখ খুলে দেখলাম (এ ব্যক্তি আর কেউ নন) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম"

আপনি ভেবে দেখেছেন! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপুড় হয়ে শোয়াকে কত বড় ভুল ও ক্ষতিকর হিসাবে উল্লেখ করেছেন! মহান আল্লাহ এভাবে শোয়াকে ঘৃণা করেন।

উপুড় হয়ে শোয়ার দ্বারা মানুষের পাকস্থলী, হজমশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্যের উপর অত্যন্ত খারাপ প্রভাব পড়ে। হৃদয়ের স্পন্দন ও শ্বাস প্রশ্বাসে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। যে কাজটির মধ্যে এত খারাবী আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা পছন্দ করবেন কেন? যারা মানুষের মঙ্গল আর কল্যাণ চান তারা মানুষের জন্য মন্দ ও ক্ষতিকর কোন বিষয়কে কিভাবে মেনে নিতে পারেন?

ডান কাতে শোয়া

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ رَكْعَتَى الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلٰى يَمِيْنِهِ

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের কেউ যখন ফজরের দু'রাকআত সুন্নত পড়ে ফেলবে, সে যেন ডান কাতে শোয়ে জামাআত শুরু হওয়ার পূর্বে কিছু সময় আরাম করে নেয়।

—আবূ দাউদ, তিরমিযী, রিয়াযুস সালেহীন

এ বিষয়ে স্বয়ং রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস কি ছিল? এই প্রশ্নের জওয়াব হুযূরের সম্মানিতা স্ত্রী উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর ভাষায় শুননঃ

قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اِضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ

"তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুরাকআত সুন্নত নামায পড়ার পর ডান কাতে শুয়ে কিছু সময় আরাম করতেন।"

উল্লেখিত দু'টি হাদীসে যদিও ফজরের সুন্নতের পর কিছু সময় আরাম করার বিষয়ে হুযূরের মূল্যবান বাণী ও উসওয়ায়ে হাসানা উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব সময়ের নিয়মও এরূপই ছিল। তিনি সর্বদাই ডান কাতে শোতেন। ডান হাত মাথার নীচে তাকিয়া হিসাবে থাকত এবং তাঁর রুখ হত কেবলামুখী। আমরা একটু পরেই এ সম্পর্কিত অন্যান্য হাদীসের মাধ্যমে বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে তুলব। বস্তুতঃ আমাদের জন্যও এভাবে শুয়ার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত রয়েছে।

মানুষের হৃদযন্ত্র তার বুকের বামপাশে রয়েছে। আজ সকল ডাক্তারগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ঐক্যমত পোষণ করেন যে, হৃদযন্ত্রের উপর কোন প্রকার ভার চাপানো স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই মানুষ যদি বাম দিকে কাত হয়ে শয়ন করে তাহলে অবশ্যই তার হৃদযন্ত্রের উপর চাপ পড়বে। চিন্তা করে দেখুন! আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে যখন বর্তমান এই চিকিৎসা শাস্ত্রের নতুন নতুন গবেষণা ও বিস্ময়কর আবিষ্কারের কোন নাম নিশানাও ছিল না তখন একজন উম্মী

নবী কত প্রজ্ঞা ও হিকমতপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছেন। এবং কত সর্বাঙ্গ সুন্দর, সর্বোত্তম একটি আদর্শ জীবন যাপন করে গেছেন।

শুয়ার সঠিক নিয়ম

পূর্ব আলোচনায় আমরা দুটি হাদীস উদ্ধৃত করেছি। যেগুলোর বিষয়বস্তু হল এই যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু' রাকআত সুন্নত নামায পড়ার পর ডান কাতে শুয়ে একটু আরাম করতে বলেছেন। তিনি নিজেও এই আমল করেছেন। এ পর্যায়ে আমরা হুযূরের সাধারণ ও ব্যাপক হুকুম উদ্ধৃত করছি। এই হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন হযরত সায়ীদ ইবনে আবূ উবাইদা (রাযিঃ)। তিনি বলেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ

অর্থাৎ "তোমারা যখন শুয়ার জন্য বিছানায় যাবে তখন প্রথমে অযু করবে, যেমন নামাযের জন্য অযু কর। অতঃপর ডান কাতে শুয়ে পড়বে।"

–বুখারী শরীফ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত ইয়াঈশ (রাযিঃ) তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি মসজিদে উপুড় হয়ে শুয়া ছিলাম। হঠাৎ কেউ যেন আমাকে তার পা দিয়ে নাড়া দিল এবং বলল যে, এভাবে শুয়া আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। অতঃপর আমি যখন চোখ তুলে তাকালাম তখন দেখতে পেলাম যে, এই ব্যক্তি হলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান কাতে শুতেন এবং তাঁর ডান হাত মাথার নীচে দিয়ে ঘুমাতেন। এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে,

إِنَّهُ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى تَحْتَ خَدِّهِ

"হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমাতেন তখন তাঁর ডান হাত নিজের গাল মুবারকের নীচে রাখতেন।" ঘুমানোর সময়ও তাঁর রুখ কেবলার দিকে থাকত। এতে বাইতুল্লাহ শরীফের প্রতি হুযূরের পূর্ণ মনোযোগ নিবন্ধ থাকার পরিচয় পাওয়া যায়। সৌভাগ্য সেই ব্যক্তির যে তার প্রতিটি কাজে সরওয়ারের কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুরসণ করে। নিজের

চলাফেরা, নিদ্রা ও জাগরণও হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাসের ছাঁচে গড়ে তোলে। কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণের মধ্যেই সার্বিক সফলতা, কল্যাণ ও সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে।

ঘুমানোর সময়

ঘুমানোর ব্যাপারে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি ইশার নামাযের পর খুব তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তেন। কিছু সময় আরাম করার পর খুব তাড়াতাড়িই তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্য জেগে যেতেন। তাই আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন আজো ইশার নামাযের পর জেগে থাকা এবং গল্পগুজব করাকে পছন্দ করেন না। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ঃ

كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا

"হযরত রাসূল মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযের আগে ঘুমানো এবং ইশার পর গল্পগুজব করাকে অপছন্দ করতেন।"

এবার ঘুমানো সম্পর্কে হুযূরের বাণী পাঠ করুন।

তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلصُّبْحَةُ تَمْنَعُ الرِّزْقَ

(১) সকালের ঘুম রিযিকের প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়। দিন হল কাজের জন্য আর রাত হল ঘুম ও আরামের জন্য। যদি সারা রাত আরাম করার পরও কেউ নতুন উদ্যমে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তৎপর হয়ে উঠার পরিবর্তে ঘুমিয়ে থাকে তাহলে তার রিযিকের দরওয়াজা সে নিজেই বন্ধ করে দেয়।

اِسْتَعِيْنُوْا عَلٰى قِيَامِ اللَّيْلِ بِقَيْلُوْلَةِ النَّهَارِ

(২) রাতের একাকিত্বে আল্লাহর স্মরণে নামায পড়ার সুবিধার্থে দিনের বেলা কিছু সময় কায়লুলা (আরাম) করবে। দুপুরে খাওয়ার পর কিছু সময় বিশ্রাম করাকে কায়লুলা বলে। কায়লুলা শুধু স্বাস্থ্যের জন্যই উপকারী নয় বরং রাতের বেলা আল্লাহর স্মরণে জাগ্রত থাকার ঘুমের ঘাটতি পুরণ করতেও সহায়ক হয়।

(৩) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

مَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَاخْتُلِسَ عَقْلُهُ فَلَا يَلُومَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ

"যে ব্যক্তি আসরের পর নিদ্রা গেল সে তার আকল বুদ্ধি ভোঁতা করে ফেলল। সে যেন তার আকল বুদ্ধি ভোঁতা হওয়ার জন্য নিজেকে ব্যতীত আর কাউকে দায়ী না করে।" –জামে সগীর

ঘুমানোর দু'আ

হযরত সায়ীদ ইবনে আবূ উবাইদা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস খানির প্রথম অংশে আপনারা একটু আগেই পড়েছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানায় যাওয়ার পূর্বে নামাযের ন্যায় অযু করতে এবং ডান কাতে শুতে বলেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন যে, ঘুমানোর আগে তোমারা নিম্নের দু'আটি পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّ رَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجٰى مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি আমার জীবন আপনার নিকট হাওয়ালা করছি এবং আমার যাবতীয় বিষয় আপনাকে সোর্পদ করছি। আপনার প্রতি আশা ও ভীতির সাথে আমি আপনারই আশ্রয় গ্রহণ করছি। আপনি ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল ও ঠিকানা নাই।"

হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) ও হযরত আবূ যর গিফারী (রাযিঃ) তাঁরা দু'জনেই রেওয়ায়াত করেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমানোর জন্য তাঁর বিছানায় যেতেন তখন এই দুআ পড়তেনঃ

بِسْمِكَ اللّٰهُمَّ اَحْيَا وَ اَمُوْتُ

উপরোক্ত দুআগুলি হল ঘুমানোর পূর্বে পাঠ করার জন্য। এবার ঘুম থেকে জেগে উঠে যে দু'আ পড়তে হবে সেগুলি লক্ষ্য করুন। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমারা যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে তখন এই দুআ পাঠ করবেঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ عَلَىَّ رُوْحِىْ وَعَافَانِىْ فِىْ جَسَدِىْ وَاَذِنَ لِىْ بِذِكْرِهِ

"সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমার আত্মা আমার দেহে ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমার দেহকে আরাম দিয়েছেন এবং আমাকে স্বীয় যিকিরের তওফীক দিয়েছেন।" নাসায়ী

হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) ও হযরত আবূ যর গিফারী (রাযিঃ) কর্তৃক উপরোল্লেখিত রেওয়ায়াতের শেষ অংশে আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন তখন এই দুআ পাঠ করতেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।"

উপরোক্ত দুআসমূহ মুখস্ত করে নিন। সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত আর কে হবে যে ঘুমানোর আগে নিজেই নিজকে খালেক ও মালেকের নিকট সোর্পদ করে দেয়, যিনি চিরন্তন ও চিরঞ্জীব। যার না নিদ্রা আসে আর না তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হন।

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهٖ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهٗ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَاِنَّهٗ لَا يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهٗ

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে তখন সে যেন তার হাত তিন বার ধৌত করার আগে পানির পাত্রে না ডুবায়। কেননা, সে জানে না ঘুমানোর পর তার হাত শরীরের কোন কোন স্থানে গিয়েছে।" –শামায়েলে তিরমিযী

ভেবে দেখেছেন! পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও পাক-পবিত্রতার প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কত তীক্ষ্ন নযর ছিল! স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি কি পরিমাণ মনোযোগ ছিল! সর্বোপরি মানব জীবনের কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি তাঁর কত সতর্ক দৃষ্টি ছিল। সত্যিই তিনি যদি দিক নির্দেশনা না দিতেন তাহলে মানব জাতি আর কোথায় এবং কার নিকট থেকে দিকে নির্দেশনা পেত! তাই তো ইরশাদ হচ্ছে, ঘুম থেকে জেগে উঠার পর হাত না ধুয়ে কোন পাত্রে হাত দেবে না। অবচেতন ঘুমন্ত অবস্থায় তোমার হাত কোন কোন জায়গায় গিয়েছে, আর তা পাক রয়েছে না নাপাক হয়ে গেছে তা তো তোমার জানা নাই।

ঘুমানোর আগে ও পরের দুআ সমূহ

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় তশরীফ নিয়ে যেতেন তখন প্রথমে ডান কাতে শুইতেন অতঃপর এই দুআ পাঠ করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجَىٰ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ

“আয় আল্লাহ্! আমি নিজেকে আপনার নিকট সোপর্দ করলাম এবং আমার রুখ আপনার দিকে করলাম। এবং আমার সব কিছু আপনার হাওয়ালা করলাম। আমার যাবতীয় আশা-আকাংখা আপনারই নিকট। আপনার নিকটই আশা করি এবং আপনাকেই ভয় করি। আপনি ব্যতীত কোন আশ্রয় নাই। আপনি ছাড়া মুক্তিও নাই। আমি আপনার প্রেরিত কিতাব ও রাসুল-এর প্রতি ঈমান আনলাম।” –বুখারী শরীফ

হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) বর্ণণা করেন,

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে শুইতেন তখন তিনি তাঁর হাত স্বীয় গাল মুবারকের নীচে রাখতেন এবং এই দুআ পড়তেনঃ

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَ اَحْيَا

“আয় আল্লাহ্! আমি আপনার নামেই মৃত্যুবরণ করছি (ঘুমাচ্ছি) এবং আপনার নামেই জীবিত হব।”

এবং তিনি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন তখন এই দুআ পাঠ করতেনঃ

وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

“সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি মৃত্যুর পর আমাকে জীবন দান করেছেন এবং তাঁর নিকটই আমাদের প্রত্যার্বন করতে হবে।”

অধ্যায় ঃ ১০

রুগ্নের সেবা শুশ্রূষা ও রোগী দেখার আদব

রুগ্নকে দেখতে যাওয়া খেদমতে খালক তথা সৃষ্টির সেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। তাই রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, তার সেবা-শুশ্রূষা করা ইসলামের চারিত্রিক ও নৈতিক বিধানে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কাজ। আপনারা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা নীতির এই অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত তাঁর মহামূল্যবান বাণী পাঠ করবেন যাতে কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়াকে আল্লাহকে দেখতে যাওয়া ও তাঁর শুশ্রূষা করার নামান্তর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ তা'আলার মহান সত্তা যাবতীয় বস্তুগত বিষয়াদি থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

আমরা এই অধ্যায়ে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে সব বাণী সন্নিবেশিত করার প্রয়াস পাব যেগুলি এই বিষয়ে কোন না কোনভাবে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। যেমন, রোগী দেখার আহকাম, রোগী-দেখার প্রতিদান, রোগী দেখার আদব, রোগী দেখার দুআ এবং এই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হাদীসে নববী।

রোগী দেখতে যাওয়ার হুকুম

এ পর্যায়ে রোগীকে দেখতে যাওয়া এবং তার সেবা শুশ্রূষা সর্ম্পকে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা হল।

(১) হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেনঃ

أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়াও এবং রুগ্নের সেবা-শুশ্রূষা কর।" –বুখরী শরীফ

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ ......

(২) "প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে।

(এর মধ্যে দুটি হল) সালামের জওয়াব দেওয়া ও রুগ্নকে দেখতে যাওয়া ও তার সেবা শুশ্রূষা করা। –বুখারী ও মুসলিম শরীফ

(৩) হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) বর্ণনা করেনঃ

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ ....

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে রুগ্নকে দেখতে যাওয়ার হুকুম দিয়েছেন।" –বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ

(৪) হযরত ছাওবান (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا عَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ

"যখন কোন মুসলমান ভাই তার কোন মুসলমান রুগ্ন ভাইকে দেখতে যায়, সে যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে না আসে ততক্ষণ সে বেহেস্তের বাগানে থাকে।"

–মুসলিম শরীফ ও মিশকাত শরীফ

রোগী দেখতে যাওয়ার প্রতিদান

রুগ্নকে দেখতে যাওয়ার হুকুম এবং এর সওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকার পরিণাম কি তা আপনারা পড়েছেন। এবার রোগী দেখতে যাওয়ার সওয়াব ও প্রতিদান কি তা পাঠ করুন।

হযরত আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিতঃ রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَامِنْ رَجُلٍ يَعُوْدُ مَرِيْضًا مُمْسِيًا اِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَّسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ

وَمَنْ اَتَاهُ مُصْبِحًا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَّسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ حَتّٰى يُمْسِىَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় কোন রুগ্নকে দেখতে যায় সত্তর হাজার ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাতের দুআ করতে থাকে এবং তার জন্য বেহেশতে একটি বাগান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি সকালে কোন রোগী দেখতে যায় সত্তর হাজার ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাতের দুআ করতে থাকে এবং তার জন্য বেহেশতে একটি বাগান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।"

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হতে বর্ণিতঃ

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا

"যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করল এবং মুসলমান রুগ্ন ভাইকে দেখতে গেল তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর ফরসখের সমান রাস্তা দূরে সরিয়ে নেওয়া হল। —আবূ দাউদ

বান্দার শুশ্রূষা আল্লাহর শুশ্রূষা

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন,

يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ـ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِىْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْعُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِىْ عِنْدَهُ ......

"হে আদম সন্তান! আমি রুগ্ন ছিলাম। তুমি আমাকে দেখতে আস নাই। বান্দা আরয করবে, হে আমার রব্ব! আপনি তো বিশ্বজাহানের প্রভু! আমি আপনাকে কিভাবে দেখতে যাব? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি জানতে যে আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল। কিন্তু তুমি তাকে দেখতে যাও নাই। তুমি যদি সেই বান্দাকে দেখতে যেতে তাহলে তুমি সেখানে আমাকে পেতে।"—মুসলিম শরীফ

ভেবে দেখুন! খিদমতে খালকের এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ রুগ্নকে দেখতে যাওয়ার মর্যাদা কত বড়। আল্লাহ তা'আলা রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়াকে স্বয়ং তাঁকে দেখতে যাওয়ার সমান মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছেন। অথচ তাঁর মহান সত্তা এ সব মানবীয় বিষয়াদি হতে পাক ও পূত পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করার জন্যই তাঁর প্রিয় হাবীবের মাধ্যমে এই ঘোষণা প্রদান করেছেন।

রোগী দেখার ব্যাপারে এ বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, রোগী আপন কি পর তার কোন শর্ত নাই। রোগী সে যে কেউ হোক ধনী-গরীব, আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত অপরিচিত যে কারো রোগ শয্যায় তার পাশে যাওয়ায় সওয়াব রয়েছে।

রোগী দেখার নিয়ম পদ্ধতি

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض. تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ اَنْ يَّضَعَ اَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلٰى جَبْهَتِهِ اَوْ عَلٰى يَدِهِ وَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ؟

"হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রোগী দেখার উত্তম নিয়ম হল এই যে, তুমি রোগীর কপালে বা তার হাতে তোমার হাত রাখবে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, আপনি কেমন আছেন?" –তিরমিযী শরীফ

রোগী দেখার ব্যাপারে প্রায় অনুরূপ একটি রেওয়ায়াত হযরত ইবনুস সুন্নী (রহঃ) হতেও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

تَمَامُ الْعِيَادَةِ اَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْمَرِيْضِ وَتَقُوْلُ كَيْفَ اَصْبَحْتَ وَكَيْفَ اَمْسَيْتَ؟

"রোগী দেখার নিয়ম হল এই যে, তুমি রোগীর শরীরে তোমার হাত রাখবে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, আপনার সকাল কেমন কাটল? আপনার সন্ধ্যা কেমন কাটল? (অর্থাৎ আপনি সকালে কেমন ছিলেন এবং সন্ধ্যায় কেমন আছেন?)

উল্লেখিত দুটি হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রোগী দেখার দ্বারা শুধু তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করা উদ্দেশ্য নয়। বরং আসল বিষয় হল রোগীকে সান্ত্বনা ও শান্তি দেওয়া। আমরা কারো দুঃখ দরদ তো নিয়ে নিতে পারি না। তবে সুন্দর কথা ও উত্তম আচরণের দ্বারা তার হৃদয় মন অবশ্যই প্রফুল্ল করতে পারি। এভাবে তার দুঃখ কষ্ট কিছুটা হলেও হালকা করতে পারি।

রোগীর মাথায় বা তার হাতে হাত রাখার দ্বারা একদিকে যেমন তার জ্বরের প্রচন্ডতা অনুভব করা যায়। তেমনি তার প্রতি নিজের ঐকান্তিকতা এবং অকৃত্রিম সহমর্মিতার প্রকাশ ঘটে। আর এটা এমন একটি বিষয় যা একজন রোগীর জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

রোগীর মন খুশী করা

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ) হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা হুযূরের বাণী শুনুন। তিনি ইরশাদ করেছিলেন ঃ

اِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوْالَهُ فِى الْاَجَلِ فَاِنَّ ذٰلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَهُوَ يُطِيْبُ نَفْسَ الْمَرِيْضِ

"তুমি যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তির নিকট যাবে তখন তার দীর্ঘ হায়াত সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করবে। এটা অবশ্য তকদীরকে রদ করতে পারবে না। তবে এতে রোগীর মন অবশ্যই খুশী হবে।" –ইবনে মাজাহ

এ বিষয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণিত একটি হাদীসও এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগ শয্যায় শায়িত একজন গ্রাম্য ব্যক্তিকে দেখার জন্য তশরীফ নিয়ে যান। হুযূরের অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি যখন কোন রোগী দেখতে যেতেন তখন তাকে বলতেনঃ

لَا بَأْسَ طُهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ....

অর্থাৎ "চিন্তার কোন কারণ নাই, ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে।"

–বুখারী শরীফ

এ পর্যায়ে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আরো একটি মূল্যবান বাণী শ্রবণ করুন। তিনি ইরশাদ করেছেন যে,

اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا

"তোমরা যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তির নিকট যাবে তখন তার সাথে ভাল ভাল কথা বলবে।"

রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপরোক্ত তিনটি হাদীসের প্রতি একবার লক্ষ্য করুন এবং চিন্তা করে দেখুন এগুলি থেকে আপনি কি হেদায়াত লাভ করেন। প্রথমতঃ রোগীর নিকট তার দীর্ঘ জীবন লাভের আলোচনা করবে। তোমাদের কথায় আল্লাহর সিদ্ধান্ত অবশ্যই পাল্টাবেনা। কিন্তু এতে রোগীর চিত্ত অবশ্যই আন্দোলিত ও প্রফুল্ল হবে। দ্বিতীয়তঃ রোগীকে সাহস দাও যে, খোদা চাহেন তো ভয়ের কোন কারণ নাই। তৃতীয়তঃ যখনি কোন রোগীর নিকট যাবে, তার সাথে অতি উত্তম কথা বলবে।

স্বল্প সময়ে রোগী দেখা

এখানে রোগী দেখা সম্পর্কিত হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পেশ করা হচ্ছে

اَفْضَلُ الْعِيَادَةِ اَجْرًا سُرْعَةُ الْقِيَامِ عِنْدَ الْمَرِيْضِ

"সওয়াব ও প্রতিদানের দিক থেকে সর্বোত্তম রোগী দেখা হল রোগীর নিকট স্বল্প সময় অবস্থান করা।"–ফতহুল কবীর

হযরত আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুরূপ আরো একটি হাদীস পাঠ করুন ঃ

لَا يُطِيلُ الْجُلُوسَ لِأَنَّ الْإِطَالَةَ عِنْدَ الْمَرِيضِ مَكْرُوهَةٌ

"কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে তার নিকট দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করবে না। কেননা, রুগ্ন ব্যক্তির নিকট বেশীক্ষণ অবস্থান করা অপছন্দনীয়।"

মহানবীর (আমার পিতা মাতা তাঁর জন্য উৎসর্গ হোক) প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী সমূহের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করে দেখুন, এগুলির মধ্যে জ্ঞান, বুদ্ধি, হিকমত, প্রজ্ঞার কি বিশাল ভান্ডার সুপ্ত রয়েছে। এমন কোন্ দিকটি আছে যা তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই? বাস্তবিক তিনি ছিলেন খাতামুল মুরসালীন ও রাহমাতুল্লিল আ'লামীন অর্থাৎ আখেরী নবী ও সমগ্র বিশ্বজাহানের জন্য রহমত স্বরূপ।

ইয়াদত বা রোগী দেখা মানবীয় জীবনের বিশাল ও বিস্তৃত ক্ষেত্রে মানব সেবার একটি অতিক্ষুদ্র অঙ্গ। কিন্তু আমলের দিক থেকে ছোট্ট এবং সওয়াবের দিক থেকে অনেক বড় সওয়াবের এই কাজটির প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কেই তিনি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা রুগ্ন ব্যক্তিদের দেখতে যাও। কেননা, এটা একটি বড় ইবাদত। কিন্তু তার নিকট বেশী সময় অবস্থান করো না। রোগীর নিকট দর্শনার্থীর দীর্ঘসময় অবস্থান করা অপছন্দনীয় কাজ। বাস্তব ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে, রোগীর নিকট দর্শনার্থীরা অধিক সময় অবস্থান করলে রোগীর এবং রোগীর পরিজন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের খুবই পেরেশানী হয়।

তৃতীয় দিনে রোগী দেখা

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا بَعْدَ الثَّلَاثِ

"হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুগ্ন ব্যক্তিকে অসুস্থ হওয়ার তিন দিন পর দেখতে যেতেন।" সম্ভবতঃ এরূপ একটি রেওয়ায়াতও আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বর আসার তিন দিন পর জ্বরের চিকিৎসা শুরু করতেন।

হযরত আনাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতে জানা গেল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হওয়ার তিন দিন পর রোগী দেখতে যেতেন। হতে পারে এটা কোন বিশেষ রোগীর ক্ষেত্রে হয়েছে। অথবা এমনও

হতে পারে যে, এটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক ব্যস্ততাকালীন সময়ের বিশেষ কোন ঘটনা ছিল। মদীনার জীবনে তিনি দ্বীনি দাওয়াত ও তাবলীগ, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ এবং বিভিন্ন স্থান থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সাথে দেখা সাক্ষাতের কারণে অসম্ভব ব্যস্ত থাকতেন। একদিকে পর্যায়ক্রমে কাফেরদের হামলা চলছিল। অপরদিকে সৃষ্টি হচ্ছিল নতুন নতুন সমস্যা। এতদসত্ত্বেও তিনি খেদমতে খালকের স্বভাবগত অভ্যাসে অটল ছিলেন।

"বুখারী শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সম্মানিত সাহাবী হযরত আনাস (রাযিঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, "এক ইয়াহুদী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করত। সে অসুস্থ হয়ে গেলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখার জন্য তশরীফ নিয়ে যান এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। ছেলেটি ইসলাম কবূল করে।" সম্ভবতঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান উন্নত চরিত্র এবং একজন অসুস্থ খাদেমকে দেখার ও খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য তার বাড়ীতে গমন করাই তাকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

রুগ্ন ব্যক্তিকে নামাযের তালক্বীন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَاٰنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا نَائِمٌ اَشْكُوْ مِنْ وَّجْعِ بَطْنِىْ فَقَالَ لِىْ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ اَفِىْ بَطْنِكَ وَجْعٌ؟ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُمْ فَصَلِّ فَاِنَّ فِى الصَّلٰوةِ شِفَاءً۔

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একবার আমি পেটের ব্যথায় অসুস্থ ছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসেন। আমি তখন ঘুমিয়ে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে আবূ হুরাইরা! তোমার কি পেটে ব্যথা? আমি আরয করলাম, হ্যাঁ! ইয়া রাসূলাল্লাহ! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উঠঃ নামায পড়। কেননা, নামাযে শেফা (আরোগ্য) রয়েছে।" –ইবনে মাজাহ

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযকে মুমিনের মেরাজ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি নিবিষ্ট হওয়ার সর্বোত্তম মাধ্যম বলেছেন। আল্লাহর বান্দা যখন নামাযের জন্য নিয়ত বাঁধে তখন সে দুনিয়ার সব চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়। নামাযে পঠিত দুআসমূহ নামাযের ভাব-ভঙ্গি

উঠা বসা সব কিছু একথাই প্রকাশ ও প্রমাণ করে। উপরোক্ত হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একজন সার্বক্ষণিক মর্যাদাবান সাহাবী হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) কে নামাযের আরো একটি ফায়দার কথা বলেছেন যে, যে কোন ব্যথা বেদনা ও দুঃখ কষ্ট যাই হোক, নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তা দূরীভূত করে দেবেন। কেননা, নামাযে শেফা ও আরোগ্য রয়েছে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখে পানি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ)-এর ভাষায় রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোগী দেখতে যাওয়ার একটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, একবার হযরত সাআদ ইবনে উবাদা (রাযিঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখার জন্য তশরীফ নিয়ে যান। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিঃ), হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াককাস (রাযিঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) তাঁর সাথে ছিলেন। অতঃপরঃ

فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِيْ غَشِيَتِهِ فَقَالَ لَقَدْ قَضٰى؟ قَالُوْا لَا - يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ - فَبَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত সাআদ ইবনে উবাদা (রাযিঃ)-এর নিকট গিয়ে পৌঁছলেন তখন তাঁকে নির্জিব অবস্থায় দেখতে পেলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন সে কি মারা গেছে? লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! না এখনো মারা যায় নাই। এ কথা শুনার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদতে থাকেন।

হাদীসের বর্ণনাকারী আরো বলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কাঁদতে দেখে উপস্থিত অন্যান্য লোকেরাও কাঁদতে আরম্ভ করে। অতঃপর হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমরা কি জাননা যে, আল্লাহ তা'আলা চোখের পানি ও অন্তরের কষ্টের উপর কোন শাস্তি দেন না? (অতঃপর তিনি জিহবার দিকে ইশারা করে বললেন) তবে এটার কারণে আযাব বা রহম করেন। −বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের এই ঘটনা হতে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরব কান্নায় চোখে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া এবং হৃদয় ব্যথাতুর ও চিন্তাক্লিষ্ট হওয়াকে প্রকৃতিগত একটি বৈধ বিষয় বলে অভিহিত করেছেন। উক্ত ঘটনায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও ব্যথাতুর হয়েছেন এবং চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত করেছেন। স্বীয় উম্মতকেও এই দুঃখ প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু জিহবার দিকে ইশারা করে বলেছেন যে, ঐ ছোট্ট অঙ্গটি থেকে বের হওয়া শব্দাবলী যেমন আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যম হয় তেমনি আযাব ও শাস্তির কারণ হয়। ভাল কথা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ডেকে আনে। আর অবৈধ শোক গাঁথা, অভিযোগ ও শোকায়েতের কথা তাঁর আযাবকে উস্কে দেয়।

হিন্দু সমাজে এই প্রথা আছে যে, তারা মৃত্যুর পর মৃতের শিয়রে এবং শবযাত্রার সময় লাশের সাথে নিয়মিত মাতমকারী দল প্রেরণ করে থাকে। তারা এক বিশেষ ভঙ্গিতে শোকগাঁথা গায়। বুকে চাপড়ায়। মাথায় ও মুখে ধুলি বালি মাখে। কোন কোন এলাকায় এই কাজ ভাড়া করা লোক দিয়ে করানো হয়।

এখনো মুর্খ সমাজে মহিলাগণ গলা মিলিয়ে সমস্বরে শোকগাঁথা গায়। চোখে পানি আসুক বা না আসুক, অন্তর কাঁদুক আর নাই কাঁদুক উচ্চ আওয়াজে তারা মাতম অবশ্যই করবে। এ জন্যেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহবাকে আযাব ও দয়ার কারণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

রোগী দেখার মসনূন দু'আ

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর ভাষায় আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই দু'আটিও শ্রবণ করুন, যা তিনি রোগী দেখার সময় তাঁর পবিত্র মুখে পাঠ করতেনঃ

كَانَ اِذَا اَتٰى مَرِيْضًا اَوْ اُتِىَ بِه قَالَ اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَاشِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

"যখন তিনি কোন রোগীকে দেখতে যেতেন বা কোন রোগীকে তাঁর খেদমতে নিয়ে আসা হত তখন তিনি এই দুআ পাঠ করতেন। "হে মানুষের রব্ব! তার কষ্ট দূর করে দিন। তাকে আরোগ্য দান করুন। কেননা, আপনি আরোগ্য দানকারী। আপনি ব্যতীত আর কারো নিকট শেফা (আরোগ্য দান করার শক্তি) নাই। আপনি তাকে এমন আরোগ্য দান করুন, যার পর আর কোন রোগ অবশিস্ট থাকবে না।" –বুখারী শরীফ

রাহমাতুল্লাল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে নিজে তশরীফ নিয়ে যেতেন বা রুগ্ন ব্যক্তিকে তাঁর খেদমতে হাজির করা হত তাহলে তিনি সকল রোগের শেফাদানকারী দয়াময় আল্লাহর দরবারে উপরোক্ত দুআ করতেন। তাঁর এই দুআর দুটি বাক্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন–

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ

অর্থাৎ "হে মানুষের প্রতিপালনকারী রব্ব! আপনি তার কষ্ট দুর করে দিন।" بأس শব্দটির অর্থ– কঠিন, মুসীবত, কষ্ট, দারিদ্র ও যুদ্ধ। (মুফরাদাতুল কুরআন, রাগেব) যেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দুআ করতেন যে, আয় পরওয়ারদিগার! এই রুগ্ন ব্যক্তির সব ধরনের কাঠিণ্য, দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসীবত দূর করে দিন।

اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ

অর্থাৎ হে দয়াময় মাওলা! আরোগ্য আপনারই হাতে। আপনি স্বীয় কুদরতে এই রুগ্ন ব্যক্তিকে আরোগ্য দান করুন। এমন আরোগ্য দান করুন যার পর আর কোন প্রকার রোগ-ব্যাধি অবশিষ্ট না থাকে। আরবী ভাষায় সর্বপ্রকার দৈহিক রোগ-ব্যাধিকেই "সাকাম" বলা হয়। –মুফারাদাতুল কুরআন, রাগেব

রোগী দেখার আরেকটি দুআ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا فَقَالَ اَسْأَلُ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيْكَ (سَبْعًا عُوفِىَ اِنْ لَّمْ يَكُنْ حَضَرَ اَجَلُهُ)

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে রেওয়ায়াত করেন যে, যে ব্যক্তি কোন রুগ্নকে দেখতে যাবে সে যেন সাতবার এই দুআটি পাঠ করে–

اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

অর্থাৎ "আমি সুউচ্চ আরশের সুমহান অধিপতি (রব্ব)-এর নিকট আপনার রোগমুক্তি কামনা করছি। তিনি যেন আপনাকে পূর্ণ আরোগ্য দান করেন।" যদি তার মৃত্যুর সময় এসে না গিয়ে থাকে তবে সে (এই দুআর বরকতে) আরোগ্য লাভ করবে। –মুসতাদরাকে হাকেম, আবূ দাউদ ও নাসায়ী শরীফ

দু'আটি একবার পাঠ করে নিন। এটা এমন কোন লম্বা দুআ নয় যা মুখস্ত করে নেওয়া খুব কঠিন হবে। তাই আপনিও এটি মুখস্ত করে নিন। মনে রাখবেন! দুআর অর্থ উপায় উপকরণ অবলম্বন না করা এবং ওষুধ পত্র ও চিকিৎসা থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়ার নাম নয়। বরং দুআর অর্থ হল—একমাত্র আরোগ্য দানকারী মহান পরওয়ারদিগারের দরবারে রোগীর রোগ মুক্তির জন্য একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে বিনীত প্রার্থনা করা। এ জন্যেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআটি সাত বার পড়তে বলেছেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন যে, যদি তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে না এসে থাকে তাহলে রুগ্ন ব্যক্তি অবশ্যই আরোগ্য লাভ করবে। তার শেষ মুহূর্ত এসে গেছে কিনা তা যেহেতু কারো জানা নাই সুতরাং তার রোগ মুক্তি কামনা করতে থাকাই উচিত।

রুগ্নকে দেখতে গিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুআ

عَادَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا مَرِيْضٌ فَقَالَ لِىْ يَا سَلْمَانُ شَفَى اللّٰهُ سَقَمَكَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَعَافَاكَ فِىْ دِيْنِكَ وَجِسْمِكَ اِلٰى مُدَّةِ اَجَلِكَ

হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) তাঁর ব্যক্তিগত ঘটনা বর্ণনা করে বলেন,

"আমি রুগ্ন অবস্থায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখার জন্য তশরীফ নিয়ে আসেন এবং এই দুআ করেন, আল্লাহ তোমার রোগ ভাল করে দিন, তোমার গোনাহ মাফ করে দিন এবং তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার দ্বীন ও দেহকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন।"

চিন্তা করে দেখুন! কত ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ দুআ। কেন হবে না। এটা যে আল্লাহর নবীর পবিত্র মুখ নিসৃত দুআ। তাই তো এতে দুনিয়া ও আখেরাত, বর্তমান ও ভবিষ্যত, দেহ ও আত্মা সবকিছুর জন্যই কল্যাণের দুআ সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে রয়েছেঃ

(এক) মহান মুক্তিদাতা আল্লাহ তোমার রোগ ভাল করে দিন এবং তোমাকে সুস্থতা দান করুন।

(দুই) ক্ষমাশীল আল্লাহ তোমার গোনাহ ক্ষমা করে দিন। তিনি যদি মেহেরবানী করে ক্ষমা না করেন তাহলে দুনিয়াতে অপদস্থতা এবং আখেরাতে লাঞ্ছণা ছাড়া আর কি পাব?

(তিন) আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রুগ্ন ব্যক্তিকে আত্মিক এবং দৈহিক উভয় দিক থেকেই শান্তি দান করুন। আর যতদিন হায়াত থাকবে ততদিন সুস্থ আরামদায়ক ও নিরাপদ জীবন দান করুন।

রুগ্ন ব্যক্তির নিকট দু'আ কামনা

হযরত আনাস (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

عُوْدُوا الْمَرْضٰى وَمُرُوْهُمْ فَلْيَدْعُوا اللّٰهَ لَكُمْ فَاِنَّ دَعْوَةَ الْمَرِيْضِ مُسْتَجَابَةٌ وَذَنْبُهٗ مَغْفُوْرٌ ـ

"তোমরা রুগ্ন ব্যক্তিদের দেখতে যাবে এবং তাদের নিকট দুআর আবেদন করবে। তারা যেন তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করে। কেননা, রুগ্ন ব্যক্তির দুআ অবশ্যই কবূল হয়ে থাকে এবং তাদের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। –আত-তারগীব ওয়াত তারহীব

এ সম্পর্কে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূক (রাযিঃ)-এর বরাতেও একটি হাদীস শ্রবণ করুন।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلْتَ عَلٰى مَرِيْضٍ فَمُرْهُ يَدْعُوْكَ فَاِنَّ دُعَاءَهٗ كَدُعَاءِ الْمَلٰئِكَةِ ـ

"হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল মকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তির নিকট যাবে তখন তার নিকট আবদার করে বলবে সে যেন তোমাদের জন্য দুআ করে। কেননা, তার দুআ ফেরেশতাদের দুআর মত (মকবূল) হয়ে থাকে।" –ইবনে মাজাহ, মিশকাত শরীফ

আল্লাহ আকবার! কোথায় কল্পনাপূজারীদের এই ধারনা যে রোগ-ব্যধি হওয়া একটি আযাব ও গুনাহের শাস্তি। আর কোথায় সত্যবাদী মহান নবীর এই শিক্ষা যে, রুগ্ন ব্যক্তির উপর আল্লাহর খাছ রহমত বর্ষিত হয়। তার দুআ বিশেষভাবে কবূল হয়ে থাকে। এটা কতবড় সুসংবাদ যে, রুগ্ন ব্যক্তির গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং তার দুআ মকবূল হয়। শুধু তাই নয় বরং তাদের দুআ ফেরেশতাদের দুআর সমপর্যায়ের হয়ে থাকে। সুতরাং তোমরা যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে তখন তার নিকট নিজের জন্য দুআর দরখাস্ত করবে।

এতে বুঝা যায়, অসুখে পতিত হওয়ার কারণে বান্দা যেন ফেরেশতাদের ন্যায় দুআ কবূল হওয়ার মাকাম ও মর্যাদা হাসিল করে এবং স্বীয় মাওলা পাকের অতি নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যায়।

অন্তিম মুহূর্তে তালক্বীন

যে কারো দুনিয়াতে আসার পর একদিন তাকে এখান থেকে বিদায় নিতেই হবে। মৃত্যুর স্বাদ তাকে চাকতেই হবে। দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার এই অন্তিম মুহূর্তটি কেমনে অতিক্রান্ত হবে? এ সম্পর্কে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সম্মানিত সাহাবী হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ)-এর মুখ থেকে শুনুন। তিনি বলেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

"তোমরা মৃত্যু পথযাত্রী লোকদের (তার অন্তিম মুহূর্তে) কালেমায়ে তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর তালক্বীন কর।" –মুসলিম শরীফ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অপর এক সাহাবী হযরত মুআয (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসও উপরোক্ত মুবারক ইরশাদের সমর্থন করে। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যার জীবনের শেষ কালাম হবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" –মুসতাদরাক, আবূ দাউদ

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য উৎসর্গ হোক) এই পবিত্র বাণীর আছর হল এই যে, আজ আমাদের সমাজে সুপ্রচলিত নিয়ম এই যে, কোন রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষাকারী যখন অনুভব করে যে, এখন তার শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে তখন তার মৃত্যু কষ্টের অবস্থায় তাকে কালিমায়ে তাইয়্যেবার তালক্বীন করে। তালক্বীনের অর্থ হল তাকে বলা হবে যে, কালামা তাইয়্যেবা "লা-ইলাহা ইল্লাহ" পাঠ কর। তবে এ ক্ষেত্রে সুন্নত হল এই যে, পাশে বসা লোকেরা নিজেরাই জোরে জোরে কালিমা তাইয়্যেবা পাঠ করতে থাকবে। বস্তুতঃ এর মধ্যে অনেক বড় হিকমত নিহিত রয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিকে কালিমা পড়তে বলা হয় তবে সে হয়তো পড়তে সক্ষম নাও হতে পারে। কারন এই কঠিন অবস্থায় তার জিহ্বার নড়াচড়া করার শক্তি আছে কিনা তার হুশ ও অনুভূতি ঠিক আছে কিনা তাতো জানার কোন উপায় নাই। সর্বোপরি খোদা না করুন মৃত্যু যাতনায় তার মস্তিষ্কও তো বিকৃত হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় সে হয়তো কালিমা পড়তে অস্বীকারও করে বসতে পারে। সুতরাং পাশে অবস্থানরত শুশ্রূষাকারীগণ কালিমা পাঠ করতে থাকবে। আর রোগীর নিজেরই উপলব্ধি জাগ্রত হবে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তিম মুহূর্ত

আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হাবীবের ওয়াফাতকালীন মুহূর্তগুলি কিভাবে কেটেছে? এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় তাঁর পবিত্র মুখে কি কি কথা উচ্চারিত হয়েছে?

এই প্রশ্নের জওয়াব হযরতের অন্তিম মুহূর্তে শুশ্রূষাকারীণী তাঁর পবিত্রা স্ত্রী মুসলিম জননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর ভাষায় শুনুন। তিনি বলেনঃ

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ عِنْدَهُ قَدَحٌ فِيْهِ مَاءٌ وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ

"আমি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়াফাতের সময় ঘনিয়ে এলে তাঁর পাশে রক্ষিত একটি পানির পাত্রে বার বার হাত ভিজিয়ে এনে স্বীয় চেহারা মুবারক মছেহ করতে দেখেছি। এ সময় তিনি বলছিলেন "আয় আল্লাহ! আমাকে মৃত্যুর কঠিন যাতনায় সাহায্য করুন।" –তিরমিযী শরীফ

এতদ্ব্যতীত বুখারী ও মুসলিম শরীফে উক্ত হযরত আয়েশা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত এইরূপ রেওয়ায়াত বিদ্যমান রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, অন্তিম মুহূর্তে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে ছিলেন তখন তিনি বলছিলেনঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَالْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আমাকে আমার মহান বন্ধুর সান্নিধ্যে নিয়ে যান।

–বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ

আল্লাহ! আল্লাহ! জীবনের অন্তিম মুর্হূতটি কত কঠিণ ও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে। আল্লাহর প্রিয় হাবীবের জীবনেও সেই চরম সন্ধিক্ষণটি অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময় তিনি এমন প্রচন্ড গরম অনুভব করেন, যার ফলে বারবার তিনি তাঁর হাত ঠাণ্ডা পানিতে ডুবিয়েছেন ও ভিজা হাতে চেহারা মুবারক মুছেছেন। এ কঠিন অবস্থাতেও তিনি তাঁর পবিত্র মুখে আল্লাহর মাগফিরাত ও রহমত কামনা করছেন। মহান বন্ধুর সাথে মিলনের ঐকান্তিক আকাংখা ব্যক্ত করছেন।

অধ্যায় ঃ ১১

পরিশিষ্ট

পবিত্র কুরআনে ঔষধ পত্র ও খাদ্য দ্রব্যের আলোচনা

হাদীস শরীফে উল্লেখিত রোগ-ব্যাধি

হাদীস শরীফে উল্লেখিত ঔষধাবলী

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদ্যদ্রব্য

খাদ্য ও ঔষধের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

গ্রন্থপঞ্জি

পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত ঔষধপত্র ও খাদ্যদ্রব্য

আমরা যে সব খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করি বা চিকিৎসকগণ যে সব ঔষধপত্র দাওয়া ও প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবস্থা করেন। সেই ঔষধ বনজ লতা-পাতা ও গাছ গাছড়ার হোক বা সে গুলির সম্পর্ক খনিজ পদার্থের সাথে হোক, এবং এই সব ঔষধের ব্যবহারকারী প্রাচীন যুগের চিকিৎসক হোক বা আধুনিক যুগের চিকিৎসকই হোক, আমরা এখানে বর্ণমালার ক্রমানুসারে অতি সংক্ষিপ্তভাবে সেই সব জিনিসগুলির আলোচনা উপস্থাপন করছি। যাতে এই বিষয় বস্তুর উপর যারা কাজ করতে আগ্রহী, তাদের জন্য গবেষণা ও অনুসন্ধানের একটি দ্বার উন্মুক্ত হয়।

আনার

আল্লাহর তা'আলা সূরা আর-রাহমানে স্বীয় নিআমত সমূহের বর্ণনা প্রসংগে ইরশাদ করেছেনঃ

فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ

"তথায় আছে ফলমূল খর্জুরবৃক্ষ ও আনার।"

–সূরা আর-রাহমান আয়াত ঃ ৬৮

আঞ্জীর

আরবী ভাষায় আঞ্জীরকে বলা হয় "ত্বীন"। পবিত্র কুরআনের ত্রিশতম পারার একটি সূরার নামই হয়েছে "ত্বীন"। এতে আল্লাহ তা'আলা "ত্বীন" এর কসম খেয়েছেন। অর্থাৎ একটা প্রমাণ ও দলীল হিসাবে এর উল্লেখ করেছেন।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ....

"শপথ 'ত্বীন' ও যাইতুনের।" –সূরা ত্বীনঃ আয়াত ঃ ১

আঙ্গুর

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা আবাসায় কতিপয় তরকারী ও ফলমূলের আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন ঃ

فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَّعِنَبًا .... مَتَاعًا لَّكُمْ ....

"অতঃপর আমি তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, তোমাদের এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে।" –সূরা আবাসা ঃ আয়াত ঃ ২৭-৩২

সূরা নাহল-এ আঙ্গুরকে "উত্তম রিযিক" বলা হয়েছে।

–সূরা নাহল ঃ আয়াত ঃ ১৬

সূরা বনী ইসরাঈলেও আঙ্গুরের বাগান সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। মক্কার কাফেরগণ মুজিযা ও নবুওয়াতের দলীল স্বরূপ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এগুলি দাবী করেল আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত সমূহ নাযিল করেন। –সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ঃ ৯১

এতদ্ব্যতীত কুরআন মজীদের অন্যান্য সূরাতেও আঙ্গুরের আলোচনা করা হয়েছে।

মান্না ও সালওয়া

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরাতে মান্না ও সালওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। বনী ইসরাঈলগণ 'ত্বীহ' ময়দানে দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে উদভ্রান্ত অবস্থায় চল্লিশ বছর ঘোরার সময় আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি এই মান্না ও সালওয়া নাযিল করেছিলেন।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَانزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى

"আমি তাদের প্রতি মান্না ও সালওয়া নাযিল করেছিলাম।" সূরা বাকারাঃ আয়াতঃ ৫৭, সূরা আরাফঃ আয়াতঃ ১৬০, সূরা ত্বাহা, আয়াতঃ ৮০

যাঞ্জাবীল (শুকনা আদা)

আল্লাহ তা'আলা সূরা দাহার– এ জান্নাতবাসীদেরকে যে সকল পানীয় দেওয়া হবে সেগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে যাঞ্জাবীল কে একটি অনন্য নিআমত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا

"তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে যানজাবীল মিশ্রিত পানপাত্র।"

–সূরা দাহারঃ আয়াতঃ ১৭

যাইতুন

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় যাইতুন ও এর তৈল এর উল্লেখ হয়েছে। সূরা ত্বীনে যাইতুন-এর কসম খেয়ে বলা হয়েছে–কসম ত্বীন ও যাইতুনের। সূরা আবাসায় মানুষের বিভিন্ন প্রকার খাদ্য দ্রব্যের আলোচনায় যাইতুন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ .... وَزَيْتُوْنًا وَّ نَخْلًا

"মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, আমি তাদের জন্য উৎপন্ন করেছি যাইতুন ও খর্জূর।" –সূরা আবাসাঃ আয়াতঃ ২৪-২৮

সূরা নূর-এ যাইতুন বৃক্ষকে বলা হয়েছে "শাজারাতিম মুবারাকা" বা বরকতময় বৃক্ষ। –সূরা নূরঃ আয়াতঃ ২৫

এছাড়া সূরা আবাসা, সূরা নাহল এবং সূরা আনআমেও যাইতুনের আলোচনা এসেছে।

শহদ বা মধু

সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ কুরআন মজীদে মধু এবং মধুমক্ষিকার কথাও কয়েক বার উল্লেখিত হয়েছে। বরং পবিত্র কুরআনের চৌদ্দ পারার ১৬টি রুকু সম্বলিত একটি স্বতন্ত্র সূরার নামই 'সূরা নাহল' বা মধুমক্ষিকার সূরা নামে নামকরণ করা

হয়েছে। এই সূরার ৮৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন যে, এবং আপনার প্রতিপালক মধুমক্ষিকার প্রতি এই আদেশ দিলেন যে, পর্বতগাত্রে এবং উঁচু বৃক্ষের ডালে তোমারা গৃহ তৈরী কর।" –সূরা নাহলঃ আয়াতঃ ৬৮

অতঃপর মধু সম্পর্কে ইরশাদ করেনঃ

يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

"আল্লাহ তা'আলা এই মধুমক্ষিকার পেট থেকে এমন পানীয় বের করেন যার রঙ হয় বিভিন্ন। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার।"

–সূরা নাহলঃ আয়াতঃ ৬৯

আল্লাহ তা'আলা সূরা মুহাম্মদ-এ জান্নাতে মধুর নহরের সুসংবাদ দান করেছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَاَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى

"জান্নাতে স্বচ্ছ মধুর নহর প্রবাহিত হবে।"

– সূরা মুহাম্মদ ঃ আয়াত ঃ ১৫-৪৭

কিত্‌র বা তামা

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর প্রতি স্বীয় নিআমত সমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে তামার উল্লেখ করে ইরশাদ করেছেন যে,

وَاَسَلْنَالَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ

"আমি সুলাইমানের জন্য তামার প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম।"

–সূরা সাবাঃ আয়াত ঃ ১২

হাদীদ বা লোহা

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে লোহাকেও তাঁর এক বিশেষ নিআমত এবং মানব জাতির জন্য বিপুল উপকারী বস্তু হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

কুরআনের তেইশ পারায় "সূরা হাদীদ" নামে একটি স্বতন্ত্র সূরা বিদ্যমান রয়েছে। সূরা সাবায় হযরত দাউদ (আঃ)-এর মর্যাদার আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ

"আমি তাঁর জন্য লোহা নরম করে দিয়েছিলাম।" –সূরা সাবাঃ আয়াত ১০

সূরা হাদীদে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

"আমি লোহা অবতীর্ণ করেছি, যাতে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিদ উপকার রয়েছে।"–সূরা হাদীদঃ আয়াত ঃ ২৫-৫৭

কাফুর

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদেরকে যে সকল পানীয় নিআমত হিসাবে দান করবেন সেগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, এর মধ্যে এক প্রকার পানীয় থাকবে কাফুর মিশ্রিত। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا

"নিশ্চয়ই সৎকর্মশীল বান্দাগণ জান্নাতে পান করবে কাফুর মিশ্রিত পানপাত্রে।" –সুরা দাহরঃ আয়াত ঃ ৫

দুধ

মহান পরওয়ারদিগারের আখেরী গ্রন্থে জান্নাতের যে সব নিআমতের আলোচনা করা হয়েছে এর মধ্যে একটি নিআমত হল দুধের নহর। আল্লাহ তা'আল্লা ইরশাদ করেছেনঃ

وَ اَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ

"বেহেশতে দুধের এমন নহর প্রবাহিত হবে যার স্বাদ কখনো পরিবর্তন হবে না।" সূরা মুহাম্মদঃ আয়াত ঃ ১৫

অপর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা দুধকে স্বচ্ছ নির্মল ও সুস্বাদু বস্তু হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন ঃ

لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"স্বচ্ছ নির্মল নির্ভেজাল ও খাঁটি দুধ, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও উপাদেয়।"
–সুরা নাহলঃ আয়াতঃ ৬৬

পাখির গোশত

সূরা ওয়াকেয়াতে বেহেশতবাসীদের অতি প্রিয় ও আকর্ষণীয় খাদ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে ইরশাদে খোদাওন্দী হচ্ছেঃ

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ

"সেখানে রয়েছে পাখির গোশত যা বেহেশতবাসীদের জন্য অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য।' '–সূরা ওয়াকেয়া ঃ আয়াত ঃ ২১

মাছ

আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতের-এ সমুদ্র থেকে আহরিত বিভিন্ন প্রকার নিআমতের আলোচনা করেছেন। এই হৃদয়গ্রাহী আলোচনায় নিম্নোক্ত আয়াতে ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا

"আর তোমরা প্রত্যেক সমুদ্র হতে তাজা গোশত আহার কর।"

–সূরা ফাতেরঃ আয়াতঃ ১২

একথা স্পষ্ট যে, সমুদ্র থেকে আহরিত তাজা গোশত মাছেরই হয়ে থাকে। এটাকেই আল্লাহ তা'আলা আয়াতে তাঁর বিশেষ নিআমত হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

মোতি, প্রবাল ও ইয়াকূত

পবিত্র কুরআনের সাতাশ পারায় সূরা আর-রাহমান আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন নিআমতের আলোচনায় ভরপুর।

প্রতিটি নিআমত উল্লেখ করার পর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে যে,

فَبِأَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

অর্থাৎ "অতঃপর তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ নিআমত অস্বীকার করবে?"

এই মুবারক সূরাতেই অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে মোতি, প্রবাল ও ইয়াকূতের হৃদয়গ্রাহী আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

দেখুন সূরা আর-রাহমান ঃ আয়াত ঃ ২২ ও ৫৮

খেজুর

কুরআনুল করীমের সূরা আবাসায় বারবার উল্লেখিত শাক সব্জি ফল-মূল ও বৃক্ষাদির আলোচনা এসেছে। অন্যান্য নিআমতসমূহের সাথে এখানে খেজুরের কথাও উত্থাপিত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছেঃ

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَّ عِنَبًا وَّ قَضْبًا وَّزَيْتُونًا وَّنَخْلًا

"আমি জমিনে উৎপন্ন করেছি শস্য আঙ্গুর শাক-সব্জি, যাইতুন ও খেজুর বৃক্ষ।" –সূরা আবাসাঃ আয়াতঃ ২৭

আল্লাহ্ তা'আরা সূরা নাহলে খেজুর ও আঙ্গুরের বরকতের কথা নিম্নোক্ত ভাষায় উল্লেখ করেছেনঃ

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ...."

অর্থাৎ "খেজুর ও আঙ্গুর ফল থেকে তোমরা সাকার ও উত্তম খাদ্য তৈরী কর। নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।"

–সূরা নাহলঃ আয়াতঃ ৬৭

এতদ্ব্যতীত সূরা আনআমের নিরান্নবই নম্বর এবং সূরা মরিয়মের তেইশ নম্বর আয়াতেও খেজুর এবং খেজুরের উপকারিতা আলোচনা করা হয়েছে।

কুরআন মজীদের প্রথম পারায় সে সব শাক সব্জির কথা বলা হয়েছে যেগুলি মান্না ও সালওয়ার পরিবর্তে পাওয়ার জন্য বনী ইসরাঈল আবদার করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের আকাংখা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন বটে কিন্তু নিআমতে ইলাহীর পরিবর্তে তাদের এই সব বস্তুর জন্য আবদার করাটা পছন্দ করেন নাই।

কুরআনের ভাষায় বনী ইসরাইল আবদার করেছিল ঃ

فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ....

"হে মূসা! আমাদের জন্য আপনার রব্বের নিকট বলুন, তিনি যেন আমাদেরকে এমন বস্তু সামগ্রী দান করেন যা জমিতে উৎপন্ন হয়–যেমন তরকারী, কাঁকড়ী, গম, মসুর ডাল পেঁয়াজ ইত্যাদি।"

–সূরা বাকারা ঃ আয়াত ঃ ৬১

হাদীস শরীফে উল্লেখিত রোগ-ব্যাধি

পরিশিষ্টের এই অংশে আমরা সে সব রোগ-ব্যাধির তালিকা পেশ করছি, যেগুলির আলোচনা ও চিকিৎসা বক্ষমান গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। রোগের উপসর্গ, নিদর্শন, কারণ ও চিকিৎসা ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠায় দেখুন।

হাদীস শরীফে উল্লেখিত প্রতিষেধক

এখানে আমরা সে সব ঔষধ ও প্রতিষেধকের তালিকা উপস্থাপন করছি যেগুলির বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

প্রতিষেধক	রোগ	পৃষ্ঠা
১. কুস্বা	চোখের ঔষধ	৯৫
২. মুসববর	চেহারার লাবণ্য ও কমনীয়তার জন্য	৮৮
৩. বিহি দানা	হৃদয়ের প্রশান্তি ও হার্টের শক্তির জন্য	১০৫
৪. তালবীনা (যবের দ্বারা প্রস্তুত)	পেট ব্যথায় হালকা খাদ্য	১০০
৫. যব	পেট ব্যথায় হালকা খাদ্য	১০০
৬. মেহদী	মাথা ব্যথা, ফোঁড়া দুম্বল ও কাটা ঘায়	৮১
৭. ওয়ারস	নিউমোনিয়া	১০৪
৮. যারীরাহ (চিরতা)	ফোঁড়ার জন্য	১০২
৯. ছাই	যখমের জন্য	১০৩
১০. যাইতুন	নিউমোনিয়া	১০৪
১১. সুরমা	চোখের দৃষ্টি শক্তির জন্য	৮৯
১২. সোনামুখি	যে কোন রোগের জন্য উত্তম বিরোচক	৮৫
১৩. সানুত	সকল রোগে ব্যবহারযোগ্য	৮৭
১৪. শিংগা	রক্তের আধিক্যের জন্য	৯৯
১৫. শিবরম	জুলাব	৮২
১৬. মধু	সর্বরোগের শেফাদানকারী, পেটের পীড়ায় প্রতি মাসে তিন বার সেবনে বিশেষ উপকারী।	৮৩
১৭. কুসত বা গোঠ	গলগন্ড ও নিউমোনিয়ার জন্য	৯০
১৮. আজওয়া খেজুর	হৃদরোগ ও বিষের মহৌষধ	১০৬
১৯. আগর কাঠ	গলগন্ডের প্রতিষেধক	৯০

২০. কৃষ্ণ জিরা	সর্ব রোগের ঔষধ	৯২
২১. গাভীর দুধ	সুস্বাস্থ্যের জন্য	৩০
২২. লবণ	বিষাক্ত পোকা মাকড়ের কামড়ের ঔষধ স্বরূপ	৯৭
২৩. ঠান্ডাপানি	জ্বরের জন্য	৯৪
২৪. মলম পট্টি	যখম	১০৩
২৫. বরনী খেজুর	সর্বরোগের প্রতিষেধক	১০৭
২৬. দুম্বার চাকী	গৃদ্ধ্রশী বা সাইটিকার জন্য	৯৩
২৭. চাটাই	রক্ত বন্ধের জন্য	১০৩
২৮. আনজীর	অর্শ ও ছোট সন্ধির ব্যথার প্রতিষেধক	১০৮

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদ্য তালিকা

চালাবিহীন আটা	সিরকা (তরকারী হিসাবে)
পিলো	মধু
তরমুজ	পিলো বৃক্ষের পাকাফল
সারীদ	লাউ
সাফাল	সাধারণ খেজুর
যবের রুটি	আজওয়া খেজুর
হুবারা ঃ এক প্রকার পাখি	কাঁকড়ী (বরণী)
হালুয়া	গোশত ঃ ছাগল, মুরগী, পাখি
রুটি	গর্দান, ডানা, কাঁধের অংশ, ভুনা গোশত,
দুধ	মাছ, মাখন, লবণ
যাইতুন ও যাইতুনের তৈল	ছাফারজাল বিহি দানা

গ্রন্থপঞ্জী

অধম লেখক 'তিব্বে নববী' সংকলন করতে গিয়ে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলির সাহায্য নিয়েছি। আমি এই গ্রন্থগুলির সম্মানিত লেখক, সংকলক ও প্রকাশকদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাঁদের সকলকে উত্তম বদলা দিন।

(১) মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাক্বাইকুত তাবীল ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ নসফী, মৃত্যুঃ ৭০১ হিজরী

(২) মুফরাদাতুল কুরআন ঃ আল্লামা রাগেব ইস্পহানী (রহঃ), মৃত্যু ৫০২ হিজরী

(৩) বুলূগুল মুরাম ঃ আল্লামা হাফেয ইবনে হজর আসক্বালানী (রহঃ) মৃত্যু ৮৫৩ হিজরী

(৪) তফসীরে মাজেদী ঃ মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী

(৫) বুখারী শরীফ ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ), মৃত্যু ২৫৬ হিজরী

(৬) আল জামে-উস সহীহ ঃ ইমাম মুসলিম (রহঃ), মৃত্যু ২৬১ হিজরী

(৭) মিশকাত শরীফ ঃ আবূ মুহাম্মদ হোসাইন বগভী (রহঃ), মৃত্যু ৫১৬ হিজরী

(৮) মুওয়াত্তা ইমাম মালেক (রহঃ) ঃ মৃত্যু ১৭৯হিজরী

(৯) সুনান আবূ দাঊদ (রহঃ) ঃ মৃত্যু ২৭৫ হিজরী

(১০) সূনান ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মাজাহ (রহঃ) ঃ মৃত্যু ২৭৩ হিজরী

(১১) সুনান ইমাম আহমদ নাসায়ী (রহঃ) ঃ মৃত্যু ৩০৬ হিজরী

(১২) শামায়েলে তিরমিযী ঃ ইমাম মুহাম্মদ তিরমিযী (রহঃ) মৃত্যু ৩৭৯ হিজরী

(১৩) রিয়াযুস সালেহীন ঃ ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে শরফুদ্দীন নববী (রহঃ) মৃত্যু ৬৭১ হিজরী

(১৪) মুসতাদরাক ঃ ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ হাকেম নিশাপুরী, মৃত্যু ৪০৫ হিজরী

(১৫) তালখীসুল মুসতাদরাক ঃ আল্লামা শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ, মৃত্যু ২৪৮ হিজরী

(১৬) ওয়াসাইলুল উসূল ইলা শামায়িলির রসূল ঃ মুহাম্মদ ইউসুফ ইবনে ইসমাঈল, প্রকাশকাল ১৩৮০ হিজরী, মিসর

(১৭) শামায়েলে রসূল ঃ অনুবাদ ঃ মিয়া মুহাম্মদ সিদ্দীকী, লাহোর

(১৮) তাফহীমুল কুরআন ঃ মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী

(১৯) যাদুল মাআদ ঃ আল্লামা হাফেয ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ)

(২০) জমউল ফাওয়ায়েদ মিন মাজমায়িল উসুল ওয়া মাজমায়িয যাওয়াঈদ ঃ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-ফাসী আল মাগরিবী, মৃত্যু ১০৯২ হিজরী

(২১) আল আহকামুন নববিয়্যা ফী সানাআতিত তিব্বিয়্যা ঃ আবুল হাসান আলী ইবনে আব্দুল করীম আলহামদী (মিসর)

(২২) আত্‌তিব্বুন নববী ঃ শামসুদ্দীন ইবনে আবূ বকর ইবনে কাইয়্যিম আল জাওযী (৬৯১-৭৫১ হিঃ)

(২৩) আল গেযা ওয়াদ দাওয়া ফিল কুরআনিল কারীম ঃ ডাক্তার আবদুল আযীম হানাফী সাবের, মিসর ১৯৭২

(২৪) আত্‌ তিব্বুন নববী ঃ শাখয় আবূ নুয়াইম (রহঃ)

(২৫) কিতাবুল ফাওয়ায়েদ ঃ শায়খ আবুল আববাস শারজী হানফী (রহঃ)

(২৬) আল কওলুল জামীল ঃ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ)

(২৭) শরহে মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যা ঃ ইমাম যারকানী (রহঃ)

(২৮) সীরাতুননবী ঃ আল্লামা শিবলী নোমানী (রহঃ) মৃত্যু ১৯১৪ সাল

(২৯) রাহমাতুল্লিল আলামীন ঃ কাযী মুহাম্মদ সুলাইমান মনসুরপুরী

(৩০) আখলাকুননবী ঃ শায়খ আবূ হাইয়্যান ইস্পাহানী (রহঃ) মৃত্যু ৩৮৯ হিজরী, অনুবাদ মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ, করাচী

(৩১) বিমারী আওর উনকা রূহানী এলাজ ঃ ডাক্তার মীর ওয়ালী উদ্দীন মরহুম

(৩২) তিব্বে নববী পর এক তাহকীকী মাকালা ঃ হাকীম কাযী আবদুল মুজতাবা আরশাদ

(৩৩) তিব্বে নববী ঃ হাফেয ইকরামুদ্দীন

(৩৪) মাজাল্লাহঃ সিহ্হত ও তনদুরস্তী ঃ সম্পাদনা ঃ ডাক্তার মাহবুল আলম

(৩৫) কিতাবুল মুফরাদাত

(৩৬) ইসলাম আওর তিব্বে জাদীদ (প্রবন্ধ) ঃ (প্রবন্ধ) প্রফেসর মুহাম্মদ আলমগীর খান, কওমী সিহ্হত, লাহোর